গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা

গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা

(Structural Geology)

সুবীর কুমার ঘোষ

ভূবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

West Bengal State Book Board

APRIL, 1975. 1M

Published by Shri Abani Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, Arya Mansion (Eighth floor) 6/A, Raja Subodh Mullick Square, Calcutta 700013, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi and Printed by Surajit C. Das at General Printers & Publishers Private Limited, 119, Lenin Sarani, Calcutta 700013.

মুখবন্ধ

গাঠনিক ভূবিদ্যার চর্চা বহুকাল ধরে হয়ে আসলেও ভূবিদ্যার একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে গাঠনিক ভূবিদ্যার অস্তিত্ব অপেক্ষাকৃত নতুনই বলতে হবে। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে গাঠনিক ভূবিদ্যার চর্চার ইতিহাস এক এক পথে গিয়েছে। এর ফলে এ বিজ্ঞানের বিকাশও হয়েছে বহুমুখী। গোড়ার দিকে, গাঠনিক ভূবিদ্যার বিভিন্ন ধারার মধ্যে যখন বিশেষ কোন বিচ্ছেদ ছিল না, তখন আরগাঁ-এর মতো এমন মনীষীও ছিলেন, যাঁর প্রতিভার স্বচ্ছন্দ গতি ছিল ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড থেকে সমগ্র এসিয়ার গঠন পর্যন্ত বিস্তৃত। পক্ষান্তরে, বুখার্-এর মতো মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া, আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা—ফরাসী ভূবিজ্ঞানী এলবার্জার্-এর ভাষায়—'যে যার নিজের উপত্যকায় কারারুদ্ধ'। অথবা, বিপরীত ঝোঁকে, কিছুসংখ্যক ভূবিজ্ঞানীর—বিশেষতঃ ভূপদার্থবিদ্‌গণের গবেষণার লক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ গাঠনিক বিশ্লেষণের সাথে যোগসূত্রহীন ভূস্থাপত্যের প্রকল্প রচনাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর স্থাপত্যের চর্চার সাথে এক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ গাঠনিক বিশ্লেষণের যোগসূত্র তাই আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। নিঃসন্দেহে এই দুই পদ্ধতির সমন্বয় ছাড়া সমগ্রভাবে গাঠনিক ভূবিদ্যায় কোন সংহতি আনা সম্ভব নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের গাঠনিক ভূবিদ্যা-চর্চায় অবশ্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশদ গাঠনিক বর্ণনার পদ্ধতিই বেশী মূল্যবান। বর্তমান পুস্তকের বৃহত্তর অংশ এই ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তনের গঠনের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ। শেষের সাতটি অধ্যায়ে বিশালায়তনের গঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মোটামুটিভাবে গত অর্ধ শতাব্দীর গবেষণার ফলে গাঠনিক ভূবিদ্যার চেহারা অনেকটা বদলে গিয়েছে, এবং এই আধুনিকীকরণের অধিকাংশই হয়েছে যুদ্ধোত্তর কালে। গঠনের জ্যামিতি বর্ণনায় স্যান্ডার্ প্রবর্তিত পদ্ধতির প্রচলনের ফলে গাঠনিক ভূবিদ্যার চর্চায়—স্বল্পস্থায়ী হলেও—এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে যুদ্ধোত্তর কালে গ্রেট্ ব্রিটেন্-এর স্কটিশ্ হাইল্যান্ড্-এর বলিত শিলার জ্যামিতির বিশদ বিশ্লেষণ শুরু হওয়ার সময় থেকেই গঠনের জ্যামিতিক বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতিগুলি একটা সংহত রূপ নিয়েছে। নন্‌সিলিণ্ড্রিকাল্ বা অসম্ভাব্যর

বলির বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং উপর্যুপরি বিরূপণের (superposed deformation) বিশ্লেষণের পদ্ধতিও এই সময় থেকেই প্রচলিত হয়। প্রসঙ্গতঃ এই সময়কার গাঠনিক ভূবিদ্যার পুনরুজ্জীবনের সূত্র ধরেই ভারতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম গাঠনিক ভূবিদ্যার রীতিবদ্ধ অনুশীলন এবং গবেষণা সুরু হয়েছিল।

গঠনের জ্যামিতি-বিশ্লেষণের তুলনায় গঠনের উৎপত্তি সম্পর্কে সুসংবদ্ধ গবেষণার কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। অবশ্য পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিলা-বিরূপণের (rock deformation) পরীক্ষা থেকে অধুনা অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়েছে। আবার পরীক্ষাগারে গাঠনিক মডেল্-এর বিরূপণের পরীক্ষা থেকেও শিলাগঠনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোকপাত হচ্ছে। উপরন্তু গত দশ-বারো বছরে গাঠনিক ভূবিদ্যায় বলবিদ্যার ব্যবহারের ফলে শিলাগঠন সম্পর্কে তত্ত্ব রচনায় কিছু কিছু অগ্রগতিও হয়েছে।

মাত্র কয়েক দশক আগেও পৃথিবীর মানচিত্রে সমুদ্রপ্লাবিত অংশটি অনিশ্চয়তাদ্যোতক একটানা নীলরঙে ঢাকা থাকত। মূলতঃ বিগত দুই দশকের গবেষণার ফলে পৃথিবীর এই বিশাল অংশে সমুদ্রতলদেশের মানচিত্র রচনা সম্ভব হয়েছে। জানা গিয়েছে যে প্রায় সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে পৃথিবীর দীর্ঘতম শৈলমালা আছে মহাসমুদ্রেরই তলদেশে। বিশেষ করে সমুদ্রবিজ্ঞানের এবং ভূপদার্থবিদ্যার চমকপ্রদ অগ্রগতির ফলেই বিগত দশক থেকে ভূস্থাপত্যের তত্ত্বরচনায় নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে বিতর্কের ও অনিশ্চয়তার নিষ্পত্তি হতে এখনও অনেক দেরী।

বিশেষ করে তত্ত্বরচনায় পিছিয়ে থাকার ফলেই গাঠনিক ভূবিদ্যার আধুনিকীকরণ এখনও বেশ কিছুটা অসম্পূর্ণ আছে। তবে আধুনিক কালে গাঠনিক ভূবিদ্যার বহুমুখী গবেষণা এত দ্রুতগতিতে চলেছে যে এক একটি দশকে এ বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগের আমূল রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। তবে এ আধুনিক রূপান্তর যে পথেই চলুক, গত এক শতাব্দী ধরে গঠনের জ্যামিতিক বর্ণনার যে তথ্যের স্তূপ জমে উঠেছে তার শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যতের তত্ত্ব রচনা সম্ভব। বিশেষ করে গঠনের জ্যামিতি জানা না থাকলে তার উদ্ভবের প্রক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ বোঝাও সম্ভব নয়। তাই এই প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্য-পুস্তকের বিষয়-বস্তু মূলতঃ গঠনের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ। এর স্বল্প পরিসরে গঠনের উদ্ভবের প্রক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনাই সম্ভব।

পরিশেষে, বৈজ্ঞানিক শব্দ সমূহের ভাষান্তরের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষাপঞ্জী এবং শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভূবৈজ্ঞানিক পরিভাষা' অনুসরণ করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ পরিভাষা থেকে পার্থক্যও করা হয়েছে। বিশেষ করে যে শব্দগুলির মূল অংশ ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও প্রচলিত (যথা, অরোজেনি বা জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর মতো শব্দ) সেই শব্দসমূহ বাংলাতেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে পরিভাষা সম্পর্কে বর্তমান পুস্তকে খুব ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। যেখানে ভাষান্তরের ফলে বাংলাভাষার স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে সাধারণতঃ সেই সব জায়গাতেই বাংলা পরিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় গাঠনিক ভূবিদ্যার নিয়মিত অনুশীলন সুরু হয়ে গেলে, দৈনন্দিন ব্যবহারের তাগিদে আপনা থেকেই ছাঁটাই-বাছাই হয়ে স্বচ্ছন্দ পরিভাষা সৃষ্টি হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ ১

গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য

পৃথিবীর ওপরে যে কঠিন আবরণ আছে সেই ভূত্বকের স্থাপত্যের চর্চাকে গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা (structural geology) বলে। বৃহৎ পরিমাপে এই ভূত্বক্ মহাদেশ ও মহাসাগরের তলদেশ নিয়ে গঠিত। কি ধরনের রাসায়নিক উপাদানে মহাদেশীয় বা সমুদ্রতলস্থিত ভূত্বক্ গঠিত সে-প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার অংশ নয়। বরঞ্চ কি ধরনের বল (forces) ভূত্বকে সক্রিয় এবং তার ফলে শিলার আকৃতিগত পরিবর্তন কেমন হয় সেটাই এর বিষয়বস্তু। মহাদেশের উপরিভাগে যেমন দেখা যায় সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী, পৃথিবী বেষ্টন করে মহাসমুদ্রের তলদেশে তেমনি আছে অন্তঃসাগরীয় শৈলশিরা (submarine ridges), অথবা সমুদ্রগর্ভে কোথাও আছে গভীর খাত। পৃথিবীর এই বিশালাকার গঠনগুলির চর্চা গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার অংশ হলেও সাধারণত এ-বিষয়ের বিজ্ঞানকে ভূস্থাপত্য বা জিওটেক্‌টনিক্‌স্ বলা হয়। যেগুলো নিছক ভূপৃষ্ঠের ওপরের ঘটনা, যেমন শিলার ক্ষয় হওয়া অথবা সমুদ্রের জলে বালি-কাদার থিতিয়ে পড়া, এগুলো সরাসরিভাবে গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার অন্তর্গত নয়। তবে মনে রাখা দরকার যে পালল শিলার, আগ্নেয় শিলার বা রূপান্তরিত শিলার উদ্ভবের প্রক্রিয়াসমূহ সরাসরিভাবে গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার বিষয়বস্তু না হলেও, এ-প্রক্রিয়াগুলি পরোক্ষভাবে শিলাগঠনকে প্রভাবিত করে।

পাললিক ও আগ্নেয় প্রক্রিয়ায় জন্ম-নেওয়া শিলাসমূহে ভূত্বক্ গঠিত। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ বলসমূহ এদের আদিম আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। অবশেষে ওপরের দিকে ক্ষয়ে গিয়ে শিলাগঠিত কাঠামোটি বন্ধুর বা সমতল ভূপৃষ্ঠে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা এই ক্ষয়ে-যাওয়া কাঠামোর শুধু একটা পিঠ দেখতে পাই। শিলাগঠনের চর্চার প্রাথমিক লক্ষ্য হোল ভূপৃষ্ঠের নিরীক্ষা থেকে এই কাঠামোর ঘন-রূপ (three dimensional form) নিরূপণ করা। অর্থাৎ, প্রাথমিক উদ্দেশ্য—ভূপৃষ্ঠের নিরীক্ষা থেকে ভূপৃষ্ঠের গভীরের শিলার গঠনভঙ্গী নির্ণয় করা। কোন কোন ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের ওপরের যে-অংশটি ক্ষয়ে গিয়েছে সেই অংশের গঠনকেও নিরূপণ করা প্রয়োজন হয়। গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার এই দিকটি মূলতঃ

বর্ণনাত্মক। গঠনের জ্যামিতি (geometry of structure) বলতে বোঝায় ভূবিদ্যার অন্তর্গত কোন বস্তুর আকৃতি ও ভঙ্গী (attitude)। যখন কোন গঠনকে এক নজরে দেখা যায় তখন তার জ্যামিতিও সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। কিন্তু বিশাল আয়তনের গঠনের জ্যামিতিক রূপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বস্তুতঃ, গঠনের আয়তন যত বড় হয়, তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও তত পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ হয়। তাই বিশাল আয়তনের শিলাগঠনের জ্যামিতি নির্ণয় করা অনেক সময়েই দুরূহ।

গঠনের চর্চার প্রথম ধাপ হোল তার জ্যামিতির বর্ণনা। কিন্তু পাথরের এখনকার যে গঠন আমরা দেখতে পাই সেই রূপটি বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে। তাই গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার আর একটি লক্ষ্য হোল গঠনটির ক্রমবিকাশ নির্ণয় করা।

ভূত্বকের আভ্যন্তরীণ বলসমূহ শিলার মৌলিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। কখনও আকৃতিগত পরিবর্তন না ঘটিয়ে শিলাস্তূপ স্থানান্তরিত অথবা ঘূর্ণিত হয়। তাই শিলার বিকৃতি বা বিরূপণ (deformation) নিরূপণ করা এবং শিলার স্থানপরিবর্তন বা ঘূর্ণন নির্ণয় করাও গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যার বিষয়বস্তু।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যারও চরম লক্ষ্য হোল এমন কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়া যার সাহায্যে গঠনগুলির জন্ম ও ক্রমবিকাশের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ভূত্বকের আভ্যন্তরীণ যে-বলসমূহ শিলার রূপ পরিবর্তন করে, একমাত্র অভিকর্ষ (gravity) ছাড়া সেই বলের সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও পর্যন্ত খুবই কম। তাছাড়া পীড়নের (stress) ফলে পৃথিবীর গভীরস্থিত শিলার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, অর্থাৎ শিলাগুলি কতখানি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থের মতো অথবা কতখানি নির্উটোনীয় তরল পদার্থের মতো আচরণ করে, সে সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান খুব বেশী নয়। এই ধরনের প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও আধুনিক কালে শিলাগঠনের চর্চায় বলবিদ্যার ব্যবহারের ফলে তত্ত্বরচনায় কিছু কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

গঠনের জ্যামিতি জানা না থাকলে তার জন্ম ও ক্রমবিকাশ বোঝা সম্ভব নয়। গঠনের জন্ম ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ গঠনের জ্যামিতির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ।

পরিচ্ছেদ ২

পীড়ন ও টান

(Stress and Strain)

পীড়ন

ভূত্বকের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের বলসমূহ (forces) সক্রিয়। এদের মধ্যে গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যায় তিন ধরনের বলের আলোচনা প্রাসঙ্গিক : (ক) একটি বিশেষ শিলাস্তূপের পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বলসমূহ (surface forces, অথবা পৃষ্ঠস্থিত বলসমূহ), (খ) শিলার প্রতিটি কণার ওপর সক্রিয় অভিকর্ষের বল, এবং (গ) শিলার অভ্যন্তরের যে-বলসমূহ শিলার বিরূপণকে (deformation) প্রতিরোধ করে। শিলার কণাগুলির সরণ (movement) থেকেই এই শেষোক্ত বলগুলির উৎপত্তি।

যে কোন একটি বস্তুর অভ্যন্তরে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পরিমাপের সমতল কল্পনা করা যাক্। ধরা যাক্ এই সমতলটির ক্ষেত্রফল δA। এখন এই ক্ষেত্রের এক পিঠে, ক্ষেত্রের কেন্দ্রে, যে-বিভিন্ন বলসমূহ সক্রিয় সেই বলগুলির লব্ধিকে (resultant) δT আখ্যা দেওয়া হোল। যদি δA খুব ছোট হয়, তাহলে $\delta T/\delta A$-কে পীড়ন
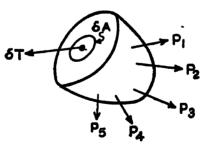
চিত্র - 1 : পীড়ন (δT) এবং পৃষ্ঠস্থিত বলসমূহ (P_1, P_2 ইত্যাদি)।

(stress) বলা হয় (চিত্র-1)। আরও নির্দিষ্টভাবে, P যদি পীড়ন হয়, তাহলে :—

$$P = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta T}{\delta A}$$

ক্ষেত্রফলের প্রতি এককে বলের যে পরিমাপ (dimension of force per unit area) পীড়নেরও সেই পরিমাপ। δA ক্ষেত্রটির ওপর বলের মান PδA। যে δA সমতলটির ওপর এই বল সক্রিয় তার এক পিঠের দিককে ধনাত্মক ধরে নিলে উল্টো পিঠের দিককে ঋণাত্মক ধরা হয়। ধনাত্মক পার্শ্বের বল ঋণাত্মক পার্শ্বের বস্তুর ওপর সক্রিয়। আবার ঋণাত্মক পার্শ্বের বল ধনাত্মক পার্শ্বের বস্তুর ওপর সক্রিয়।

একটি সমতলের ওপরের একটি বিন্দুতে সক্রিয় পীড়নকে তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব। সমতলটির অভিলম্বের সমান্তরাল উপাদানটিকে পীড়নের **আভিলম্বিক উপাদান** (normal component) বলা হয় (চিত্র ২)। সমতলীয় পৃষ্ঠটির সমান্তরাল উপাদানগুলিকে **পীড়নের ছেদক উপাদান** বা **স্পর্শিনী উপাদান** (tangential component) বলা হয় (চিত্র-২)। যে আভিলম্বিক পীড়ন (normal stress) সমতলটির
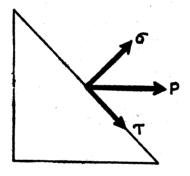
চিত্র - ২ঃ একটি বিশেষ তলের ওপর পীড়নের (P) আভিলম্বিক উপাদান (σ) ও ছেদক উপাদান (τ)

ধনাত্মক পার্শ্বের বস্তুকে ঋণাত্মক পার্শ্বের বস্তুর থেকে টেনে সরাতে চেষ্টা করে, সেই পীড়নকে **সম্প্রসারণকারী পীড়ন** (tensile stress) বলা হয়। আবার যদি কোন আভিলম্বিক পীড়ন ধনাত্মক পার্শ্বের বস্তুকে ঋণাত্মক পার্শ্বের দিকে ঠেলতে চেষ্টা করে, তাহলে পীড়নের উপাদানটিকে **সঙ্কোচনকারী পীড়ন** (compressive stress) বলা হয়। ভূবিদ্যায় সাধারণতঃ সঙ্কোচনকারী পীড়নকে ধনাত্মক এবং সম্প্রসারণকারী পীড়নকে ঋণাত্মক ধরা হয়।

পীড়িত (stressed) বস্তুর যে কোন বিন্দুতে পরস্পরের সমকোণে

অবস্থিত এমন তিনটি সরলরেখা বেছে নেওয়া সম্ভব, যে-রেখাগুলির সমান্তরালে কেবল পীড়নের আভিলম্বিক উপাদান থাকবে এবং কোন ছেদক উপাদান থাকবে না। এই রেখাগুলিকে পীড়নের প্রধান অক্ষ (principal axis of stress) বলা হয়। যে-অক্ষের সমান্তরালে আভিলম্বিক পীড়নের মান সবচেয়ে বেশী সেই অক্ষটিকে বৃহত্তম পীড়নের অক্ষ বলা হয় এবং যেদিকে পীড়নের মান সবচেয়ে কম সেটিকে ক্ষুদ্রতম পীড়নের অক্ষ বলা হয়। তৃতীয় অক্ষটিকে মধ্যম পীড়নের অক্ষ বলা হয়। বলা বাহুল্য, সঙ্কোচনকারী পীড়নকে ধনাত্মক ধরলে, বৃহত্তম পীড়ন সর্বদাই সঙ্কোচনকারী এবং ক্ষুদ্রতম পীড়ন সম্প্রসারণকারী হবে।

স্থিতাবস্থায়, তরল পদার্থের অভ্যন্তরে পীড়নের মান সর্বদিকেই সমান থাকে। এই পীড়নকে বলা হয় উদস্থিতি চাপ (hydrostatic pressure)। ভূত্বকের গভীরাঞ্চলেও স্বাভাবিক অবস্থায় শিলার চাপ মোটামুটি ভাবে সর্বদিকে সমান থাকে। এই চাপকে লিথোস্ট্যাটিক্ চাপ বা জিওস্ট্যাটিক্ চাপ বা অবরোধী চাপ (confining pressure) বলা হয়। অবরোধী চাপের ফলে শিলার আকৃতির পরিবর্তন হয় না। পীড়নের মান যদি বিভিন্ন দিকে অসমান হয়, একমাত্র তাহলেই শিলার আকৃতির পরিবর্তন হয়। সুতরাং ভূত্বকের অবরোধী চাপের ওপর অতিরিক্ত পীড়ন আরোপিত হলেই শিলার আকৃতির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। প্রধান পীড়নগুলিকে (principal stresses) σ_1, σ_2 এবং σ_3 আখ্যা দেওয়া হলে, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম পীড়নের বিয়োগফলকে ($\sigma_1 - \sigma_3$) পীড়নের পার্থক্য (stress difference) বলা হয়। পীড়নের পার্থক্য যত বেশী হয়, শিলার আকৃতির পরিবর্তনও তত বেশী হয়।

পরীক্ষাগারে শিলার আচরণ নির্ণয় করার জন্যে সাধারণতঃ যে-পরীক্ষাগুলি করা হয় (তৃতীয় অধ্যায় দেখ), সেখানে ভূত্বকের গভীরাঞ্চলের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যে শিলাখণ্ডের চারিপাশে একটি তরলবস্তুর অবরোধী চাপ রাখা হয়। স্তম্ভাকার শিলাখণ্ডটির অক্ষের সমান্তরালে পীড়নের মান বাড়ালে শিলাখণ্ডটি সেইদিকে সঙ্কুচিত হয়। এক্ষেত্রে স্তম্ভাকার শিলাখণ্ডের অক্ষের সমান্তরালে বৃহত্তম প্রধান পীড়ন (σ_1) সক্রিয় হয় এবং এই অক্ষের সমকোণের প্রধান পীড়ন দুটির মান সমান হয় ($\sigma_2 = \sigma_3$)। σ_2 অথবা σ_3 অবরোধী চাপের মান নির্দেশ করে। পীড়নের পার্থক্য, $\sigma_1 - \sigma_3$, যত বেশী হয়, শিলাখণ্ডটি তত বেশী বিরূপিত হয়। (পীড়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে Jaeger, 1956 দ্রষ্টব্য।)

টান

নিছক জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি বস্তুকে কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টিরূপে কল্পনা করে নেওয়া যায়। এই বিন্দুগুলির আপেক্ষিক অবস্থিতির (relative position) পরিবর্তন হলে বলা হয় বস্তুটি বিরূপিত (deformed, strained) হয়েছে। টান বা strain-এর মান সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যের ও কোণের পরিবর্তন দ্বারা পরিমিত হয়। যদি কোন রেখাংশের আদি দৈর্ঘ্য l হয় এবং টানের ফলে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য l' হয়
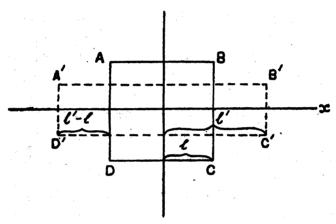
চিত্র - ৩ঃ অনুদৈর্ঘ্য টান। দৈর্ঘ্য, l, পরিবর্তিত হয়ে l' হয়েছে। অনুদৈর্ঘ্য টানের মান $(l' - l)/l$।

(চিত্র ৩), তাহলে ঐ রেখাংশটির অনুদৈর্ঘ্য টানের (longitudinal strain) মানঃ

$$\varepsilon = \frac{l' - l}{l} \qquad (8)$$

আবার, ধরা যাক্ O-বিন্দুতে পরস্পরের সমকোণে অবস্থিত OP এবং OQ দুটি রেখা (চিত্র 4)। টানের ফলে যদি এই সমকোণটির মানের পরিবর্তন হয়, এবং পরিবর্তিত কোণটির মান যদি $(\pi/2 - \psi)$ হয়, তাহলে OP এবং OQ রেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছেদক টানের (shearing strain) সংজ্ঞাঃ

$$\gamma = \tan \psi \qquad \ldots \qquad (9)$$

(এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে Jaeger, 1956 দ্রষ্টব্য।)
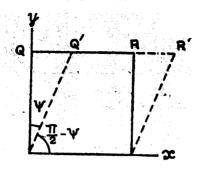
চিত্র - 4ঃ ছেদক টান। POQ সমকোণটি পরিবর্তিত হয়ে $(\pi/2 - \psi)$ হয়েছে। ছেদক টান $= \tan \psi$

সমমাত্র বিরূপণ (homogeneous deformation)

সাধারণতঃ বৃহদায়তন শিলাগঠনে বিরূপণের যে চিহ্ন পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায় যে কোন এক দিকে বিরূপণের মান সর্বত্র সমান নয়। তবে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের অন্তবর্তী বিভিন্ন জায়গায় সাধারণতঃ বিরূপণ সর্বত্র একই ধরনের হয়। যে-ক্ষেত্রে বিরূপণ সর্বত্র সমান সেই ক্ষেত্রের বিরূপণকে সমমাত্র বিরূপণ (homogeneous deformation) বলা হয় (Jaeger, 1956 দ্রষ্টব্য)। সমমাত্র বিরূপণে সরল রেখাগুলি সরলরেখাই থেকে যায়, বেঁকে যায় না। আবার, সমান্তরাল রেখাগুলি বিরূপণের পরেও সমান্তরাল থাকে। সমমাত্র বিরূপণের ফলে একটি বৃত্ত একটি উপবৃত্তে পরিণত হয়। বিরূপণের আগে কোন একটি বস্তুর পৃষ্ঠে বা অভ্যন্তরের যেকোন সমতলে একক মাত্রার ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট একটি বৃত্ত (circle of unit radius) কল্পনা করা যাক্। সমমাত্র বিরূপণের ফলে বৃত্তটি অবশ্যই উপবৃত্তে পরিণত হবে। এই উপবৃত্তটিকে বিরূপণ-উপবৃত্ত (strain ellipse বা deformation ellipse) বলা হয়। এই বিরূপণ-উপবৃত্তের সাহায্যে সহজেই বোঝা যায় কোন্ দিকে বিরূপণের মান কিরকম। যেমন 5-নং চিত্রের ABCD আয়তক্ষেত্রটি বিরূপণের ফলে A′B′ C′D′ সামান্তরিকে রূপান্তরিত হয়েছে। ABCD আয়তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একটি বৃত্ত অঙ্কিত থাকলে, A′B′C′D′-এর বিরূপণ-উপবৃত্তটি থেকে সহজেই বলা যায় যে উপবৃত্তের বৃহত্তম অক্ষের দিকে সম্প্রসারণ সবচেয়ে বেশী হয়েছে, এবং ক্ষুদ্রতম অক্ষের দিকে সঙ্কোচন সবচেয়ে বেশী হয়েছে।
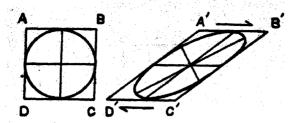
চিত্র-5ঃ ছেদক টানের ফলে একটি আয়তক্ষেত্র এবং বৃত্তের বিরূপণ।

পীড়ন ও টানের সম্পর্কঃ—স্থিতিস্থাপক, সান্দ্র ও প্ল্যাস্টিক্ পদার্থ

কোন পদার্থে পীড়ন ও টানের সম্পর্ক কি হবে সেটা নির্ভর করে পদার্থটির গুণাবলীর ওপর। যেমন, কোন কঠিন পদার্থে যদি পীড়ন ও টানের সম্পর্ক আনুপাতিক (proportional) হয়, তাহলে সেই পদার্থটিকে **স্থিতিস্থাপক** বলা হয়। অর্থাৎ, স্থিতিস্থাপক পদার্থে পীড়ন ও টানের সম্পর্ক নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়ঃ—

পীড়ন = ধ্রুবক × টান

অথবা

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \qquad ; \qquad (10)$$

এখানে σ একটি আভিলম্বিক পীড়ন, ε অনুদৈর্ঘ্য টান (longitudinal strain) এবং E একটি ধ্রুবক। E-ধ্রুবকটিকে **ইয়ংস্ মডিউলাস্ (Young's modulus)** বলা হয়। কোন একটি বিশেষ পদার্থে E-ধ্রুবকটি পীড়ন ও টানের অনুপাত নির্দিষ্ট করে। বিভিন্ন ধরনের কঠিন পদার্থে E-এর মানও বিভিন্ন হয়। যেমন, ইস্পাতের $E = 20 \cdot 9 \times 10^{11}$ ডাইন্/বর্গ সেন্টিমিটার, এবং গ্রানিট্ পাথরের $E = 4 \cdot 6 \times 10^{11}$ ডাইন্/বর্গ সেন্টিমিটার। (ডাইন্-এর পরিমাপ গ্রাম্-সেন্টিমিটার-সেকেণ্ড্$^{-2}$) স্থিতিস্থাপক পদার্থে পীড়ন ও টানের সম্পর্ক 6-ক চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ছেদক পীড়ন ও ছেদক টানের সম্পর্কও 10-নং সমীকরণের অনুরূপঃ

$$\tau = G \times \gamma, \qquad (11)$$

যেখানে τ হচ্ছে ছেদক পীড়ন, γ ছেদক টান এবং G একটি ধ্রুবক। G ধ্রুবকটিকে বলা হয় **modulus of rigidity**।

স্থিতিস্থাপক পদার্থে পীড়ন অপসারিত হলে পদার্থটি তৎক্ষণাৎ পূর্বের আকৃতিতে ফিরে আসে।

যদি কোন তরল পদার্থে টানের হার (strain rate) এবং পীড়নের সম্পর্ক আনুপাতিক হয়, তাহলে সেই পদার্থটিকে সান্দ্র পদার্থ অথবা নিউটোনীয় তরল পদার্থ বলা হয়। সান্দ্র পদার্থে পীড়ন ও টানের হারের সম্পর্ক নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়ঃ

$$\tau = \eta \times \dot{\gamma} \qquad (12)$$

এক্ষেত্রে η-ধ্রুবকটিকে সান্দ্রতাঙ্ক (coefficient of viscosity) বলা হয়। উল্লিখিত সমীকরণে τ পীড়ন এবং $\dot{\gamma}$ টানের হার (strain rate) নির্দেশ করে। সান্দ্র (viscous) পদার্থে একটি বিশেষ পীড়নের জন্যে কোন নির্দিষ্ট বিরূপণ হয় না। পীড়ন যত সামান্যই হোক্, বিরূপণ ক্রমশঃ বেড়ে চলে। তবে, একটি নির্দিষ্ট পীড়নের ফলে বিরূপণের
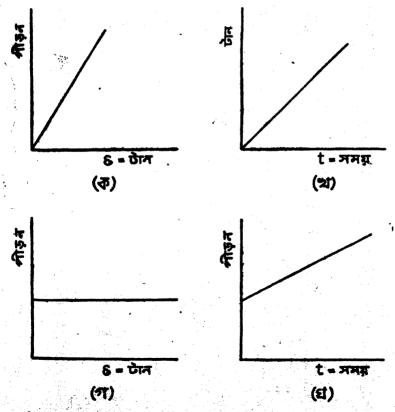
চিত্র - 6ঃ স্থিতিস্থাপক, সান্দ্র ও প্ল্যাস্টিক্ পদার্থে পীড়ন ও টানের সম্পর্ক।

বৃদ্ধির হার বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন রকম। η-এর মান যত বেশী হবে, অর্থাৎ তরল পদার্থটি যত গাঢ় হবে, বিরূপণের বা টানের হার তত কম হবে। 6-খ চিত্রে পীড়ন এবং টানের হারের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

কোন কোন পদার্থে পীড়নের মান একটি নির্দিষ্ট সীমার কম থাকলে বস্তুটি স্থিতিস্থাপক থাকে, কিন্তু পীড়নের মান সেই নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছলে বস্তুটির স্থিতিস্থাপকতা লুপ্ত হয়। পীড়নের মান সেই নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। এই নির্দিষ্ট পীড়নে পদার্থটির বিরূপণ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে (চিত্র 6-গ)। এই ধরনের পদার্থকে প্ল্যাস্টিক্ পদার্থ বলা হয়। 6-ঘ চিত্রে প্ল্যাস্টিক্ পদার্থে পীড়ন ও সময়ের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

ভূত্বকের অথবা ভূত্বকের নীচের শিলায় পীড়ন এবং টানের সম্পর্ক বেশ জটিল। স্বল্পস্থায়ী পীড়নে শিলার আচরণ অনেকটা স্থিতিস্থাপক পদার্থের মতো; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পীড়নে শিলার আচরণ আরও জটিল। সেক্ষেত্রে শিলার প্রতিক্রিয়া কিছুটা স্থিতিস্থাপক বস্তুর মতো আবার কিছুটা সান্দ্র এবং প্ল্যাস্টিক্ পদার্থের মতো হতে পারে।

শিলার সহনীয়তা

শিলার সহনীয়তা বা strength কাকে বলে? ভঙ্গুর পদার্থের বেলায় এ-প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। যে-পীড়নে একটি ভঙ্গুর শিলা
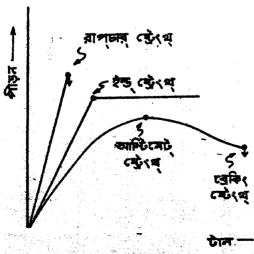
চিত্র-7: পীড়ন-টান লেখচিত্রে শিলার বিভিন্ন ধরনের সহনীয়তার ব্যাখ্যা।

ভেঙে যায় সেই পীড়নটিকে শিলাটির strength বা rupture strength বলা হয় (চিত্র 7)। শিলার আচরণ পুরোপুরি ভঙ্গুর পদার্থের মতো না হলে শিলার সহনীয়তাকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে। যে-পীড়নে শিলার চিরস্থায়ী বিরূপণ (permanent deformation) সুরু হয় সেই পীড়নকে বলে yield strength (চিত্র 7)। সম্প্রসার্য (ductile) শিলা কিছুটা চিরস্থায়ী বিরূপণের পর অবশেষে যে-পীড়নে ভেঙে যায় সেই পীড়নটিকে বলা হয় শিলার breaking strength (চিত্র 7)। সম্প্রসার্য শিলা সবচেয়ে বেশী যে-পীড়ন সইতে পারে তা'কে ultimate strength বলা হয়। পীড়ন-টানের লেখ-চিত্রের উচ্চতম বিন্দুটিতে পীড়নের যা মান তা'কেই ultimate strength বলে (চিত্র 7)।

ভূত্বকে শিলার বিরূপণ হয় খুব মন্থর বেগে। এই মন্থর বিরূপণকে বলা হয় ক্রীপ্ (creep)। ক্রীপ্-এর একটি বিশেষত্ব এই যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুদ্র পীড়নেও—এমনকি পীড়নের মান স্থিতিস্থাপক সীমার (elastic limit) কম হলেও—শিলার চিরস্থায়ী বিরূপণ হতে পারে। অবশ্য পীড়নের মান খুব অল্প হলে ক্রীপ্ হওয়াও সম্ভব নয়। যে-পীড়নের নীচে বিশেষ কোন ক্রীপ্ হয় না, সেই পীড়নকে creep strength অথবা fundamental strength বলা হয় (Griggs, 1936)।

পরিচ্ছেদ ৩

শিলাবিরূপণের নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকা

পৃথিবীর উপরে আমরা যে পাথরগুলো দেখি সেগুলোকে সাধারণভাবে চাপ দিয়ে বাঁকানো, দুমড়ানো বা মুচড়ানো যায় না; বেশী চাপ দিলে পাথরটা ভেঙে যায়। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ওপরের পাথরগুলো সম্প্রসার্য বা নম্য (ductile) নয়, ভঙ্গুর। কিন্তু শিলার গঠনগুলি থেকে আমরা জানি যে কোন এক সময়ে এ-শিলাগুলি বেশ সম্প্রসার্য ছিল। কোন এক সময়ে শিলার স্তর বেঁকে গিয়ে বলির সৃষ্টি করেছে, কোথাও প্রাচীন উপলগুলি বিকৃত হয়ে লম্বা বা চ্যাপটা হয়ে গিয়েছে। এর থেকে প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি ধরনের অবস্থায় পড়ে সাধারণ ভঙ্গুর পাথরগুলো নম্য বস্তুর মত আচরণ করে? ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনেকদিন আগের থেকেই এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি আন্দাজ করেছিলেন। ভূপৃষ্ঠের ওপরে চারিপাশের শিলার কোন চাপ নেই, কিন্তু ভূত্বকের অভ্যন্তরে, যেখানে শিলার বিরূপণ হয়, সেখানে ওপরের শিলার এবং চারিপাশের শিলার চাপ থাকে। তাই অনেক আগে থেকেই ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেছিলেন যে অবরোধী চাপের (confining pressure) মাত্রা বেশী থাকলে শিলার ভঙ্গুরতা কমে যায়। আবার যেহেতু ভূত্বকের গভীরে তাপ খুব বেশী, তাই ধরে নেওয়া হয় যে উচ্চতাপের পরিবেশে শিলার আচরণ নম্য বস্তুর মত হয়। এছাড়া মিগ্‌মোটাইট্‌-এর বলিগুলির জ্যামিতি থেকে অনুমান করা হয় যে এই বলিগুলির সৃষ্টির সময়ে শিলাসমূহ যেন খুব সহজেই বিকৃত হয়েছিল। উপরন্তু অনুমান করা হয় যে মিগ্‌মোটাইট্‌-এর সৃষ্টির সময়ে শিলার অভ্যন্তরে গ্রানিটের উপাদান-মিশ্রিত জলীয় বস্তু সঞ্চারিত হয়। এর থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে শিলার অভ্যন্তরে জলীয় বস্তু বা দ্রবণের উপস্থিতিতে শিলার ভঙ্গুরতা হ্রাস পায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশে শিলার বিরূপণ খুব মন্থরগতিতে হয়। যেমন আধুনিক কালে ভূত্বকের ওঠানামার হার মোটামুটি ভাবে এক শতাব্দীতে কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন যে স্বল্পস্থায়ী

পীড়নে শিলার আচরণ ভঙ্গুর পদার্থের মত হলেও, দীর্ঘস্থায়ী পীড়নে মন্থর গতিতে বিরূপণ হলে শিলার আচরণ নম্য পদার্থের মত হয়।

আধুনিক কালে পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিলাবিরূপণের নানা রকম পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পরীক্ষাগুলির থেকেই সঠিকভাবে জানা গিয়েছে কি কি জিনিষ শিলাবিরূপণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলি হল,—অবরোধী চাপ (confining pressure), তাপমাত্রা, দ্রবণের উপস্থিতি (presence of solution), রন্ধ্র-চাপ (pore pressure), বিরূপণের হার এবং শিলার এনাইসোট্রপি (anisotropy)।

(ক) অবরোধী চাপের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ্যাডাম্‌স্‌ এবং ফন্‌ কারমান্‌-এর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে অবরোধী চাপ বৃদ্ধি করলে লাইম্‌স্টোন্‌ এবং মার্বল-কে নম্য বস্তুর মত বিরূপিত করা যায় (Adams and Nicholson, 1901; Von Karmán, 1911)। পরে গ্রিগ্‌স্‌, হ্যান্‌ডিন্‌, পেটার্‌সন্‌ ও অন্যান্যদের সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা থেকে এ সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে (Griggs, 1936; Handin and Hager, 1957; Paterson, 1958; Heard, 1960 ইত্যাদি)।

উদাহরণতঃ পেটার্‌সন্‌-এর পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে স্বাভাবিক বায়ুচাপে মার্ব্‌ল্‌-এ কয়েকটি এলোমেলো ফাটলের সৃষ্টি হয়। ফাটলগুলি সঙ্কোচনকারী পীড়নের সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারে (চিত্র 8-ক) বা তির্যক্‌ ভাবে থাকতে পারে। অবরোধী চাপ অল্প একটু বাড়ালে (18 kg/cm²) কেবলমাত্র তির্যক ফাটলগুলি দেখা দেয় (চিত্র 8-খ)। অবরোধী চাপ 100 থেকে 150 kg/cm²-এর কম থাকলে সাধারণতঃ একটি দিকে ছেদক ফাটল (shear fracture) দেখা যায়। অবরোধী-চাপ আরও বেশী হ'লে সঙ্কোচনকারী পীড়নাক্ষের সাথে প্রতিসম (symmetrical) ভঙ্গীতে দুদিকেই ছেদক ফাটলের সৃষ্টি হয় (চিত্র 8-গ)। অবরোধী চাপ 300 kg/cm²-এর বেশী হ'লে আর সুনির্দিষ্ট ছেদক ফাটল দেখা যায় না। ছোট ছোট অনেকগুলি ছেদক ফাটল শিলাস্তরটির অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে থাকে (চিত্র 8-ঙ)। অবরোধী চাপের মাত্রা খুব বেশী হলে (1000 kg/cm²) সমগ্র শিলাখণ্ডটিই সমান ভাবে বিরূপিত হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে শিলাটির আচরণ প্রায় সম্প্রসার্য (ductile) পদার্থের মত হয় (চিত্র 8-চ)। 25° সেন্টিগ্রেড্‌ তাপমাত্রায় এবং বিভিন্ন মাত্রার অবরোধী চাপে লাইম্‌স্টোনের আচরণ কেমন হয় সেটা 9-(ক) চিত্রে
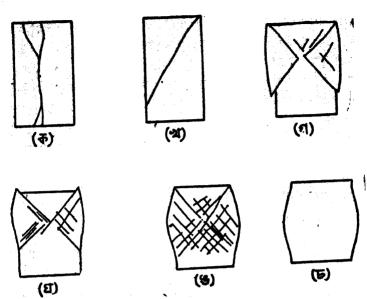
চিত্র - ৪ঃ অবরোধী চাপের বৃদ্ধির সঙ্গে শিলার আচরণের প্রভেদ। অবরোধী চাপ বাড়লে পরীক্ষাগারের শিলাখণ্ডে ভঙ্গুর থেকে ক্রমশ নম্য বা সম্প্রসার্য (ductile) আচরণ দেখা যায়। (পেটার্সন্, 1958 অবলম্বনে)।

পীড়ন এবং টানের লেখ (graph) দিয়ে দেখানো হয়েছে। এই লেখগুলির খাড়াই ঋজু অংশগুলি শিলার স্থিতিস্থাপক আচরণ নির্দেশ করে। 9-(ক) চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে অবরোধী চাপের মান কম থাকলে স্থিতিস্থাপক বিরূপণের পরেই শিলাটি ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ, স্বল্প অবরোধী চাপে শিলাটি ভঙ্গুর পদার্থের মত আচরণ করে। লেখগুলির যে অংশগুলি প্রায় অনুভূমিক বা যে অংশের ঢাল খুব কম, সে-অংশগুলি শিলার সান্দ্র (viscous) এবং প্ল্যাস্টিক্ আচরণ নির্দেশ করে। দেখা যায় যে অবরোধী চাপের মান বাড়লে শিলার আচরণ নম্য পদার্থের মত হচ্ছে। আবার 9-(ক) চিত্র থেকে আরও দেখা যায় যে অবরোধী চাপের মান যত বেশী হয় শিলাটি ভেঙ্গে যাওয়ার আগে তত বেশী পীড়ন সহ্য করতে পারে; অর্থাৎ অবরোধী চাপ বাড়লে শিলার সহনীয়তা (strength) বাড়ে।

(খ) তাপমাত্রার প্রভাব

গ্রিগস্, হ্যান্ডিন, হার্ড্ এবং অন্যান্যদের পরীক্ষায় থেকে জানা যায় যে তাপমাত্রা বাড়লে শিলার আচরণ সম্প্রসার্য পদার্থের মতো হয়।
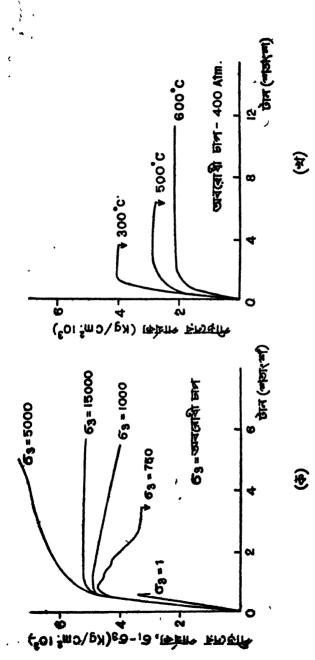
চিত্র - 9 : (ক) 25° সেণ্টিগ্রেড্ তাপমাত্রায় এবং বিভিন্ন অবরোধী চাপে লাইম্‌স্টোন্‌-এর পরীক্ষামূলক বিদ্‌লনের লেখ-চিত্র। (হার্ড্‌, 1960 অবলম্বনে)। (খ) 400 বায়ুচাপে এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় লাইম্‌-স্টোন্‌-এর পীড়ন-টান লেখচিত্র।

9-(খ) চিত্রে বিভিন্ন তাপমাত্রায় লাইম্‌স্টোন্‌-এর পীড়ন ও বিরূপণের কতকগুলি লেখ দেখানো হয়েছে। এই লেখগুলি থেকে দেখা যায় যে তাপমাত্রা যত বাড়ে তত ক্ষুদ্রতর পীড়নে শিলার সম্প্রসার্য আচরণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়লে শিলার yield strength তত কমে যায়।

(গ) সময়ের প্রভাব

দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়নের ফলে কোন বস্তুতে যে মন্থর বিরূপণ হয়ে থাকে তাকে ক্রীপ্‌ (creep) বলা হয়। কেলাসিত ধাতুর এবং শিলার দীর্ঘস্থায়ী বিরূপণের পরীক্ষায় এই ধরনের ক্রীপ্‌ দেখা যায়। স্বল্প-স্থায়ী পীড়নে কঠিন পদার্থ প্রথমে স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত আচরণ করে। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক সীমার (elastic limit) নীচে যে বিরূপণ হয় সেটি চিরস্থায়ী নয়। পীড়ন অপসৃত হ'লে বস্তুটি আবার নিজের আকার ফিরে পায়। কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়নে, পীড়নের মান স্থিতিস্থাপক সীমার কম হ'লেও ক্রীপের ফলে চিরস্থায়ী বিরূপণ (permanent deformation) হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রেও মোট যে বিরূপণ দেখা যায় তার একটি অংশ স্থিতিস্থাপক বিরূপণের ফলে হয় এবং অপর অংশটি চিরস্থায়ী বিরূপণের ফলে হয়। ক্রীপ্‌-এর পীড়ন অপসৃত হলে, স্থিতিস্থাপক বিরূপণের অংশটিও অপসৃত হয়, কিন্তু বিরূপণের চিরস্থায়ী অংশটির জন্যে বস্তুটি কিছুটা পরিমাণে বিকৃতই থেকে যায়।

গ্রিগ্‌স, রবার্ট্‌সন্‌ এবং অন্যান্যরা মার্ব্‌ল্‌, লাইম্‌স্টোন্‌ ইত্যাদি শিলার ক্রীপ্‌-এর কিছু কিছু পরীক্ষা করেছেন (Griggs, 1939, 1940; Robertson, 1960)। এ ধরনের পরীক্ষায় পীড়ন ও টানের লেখগুলি মোটামুটি ভাবে 10-নং চিত্রের মতো হয়। 10-ক চিত্রের লেখটির খাড়াই অংশগুলিতে পীড়নের মান হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে পীড়নের মান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এই সময়ে ক্রীপ্‌-এর ফলে যে-বিরূপণ হয়েছে সেটা লেখটির অনুভূমিক অংশে নির্দিষ্ট হচ্ছে।

ক্রীপ্‌-এর পরীক্ষাগুলি থেকে মনে হয় যে এক একটি বিশেষ পরি-স্থিতিতে শিলার একটি ক্রীপ্‌-স্ট্রেংথ্‌ (Creep strength) থাকে। ক্রীপ্‌-স্ট্রেংথ্‌ হচ্ছে পীড়নের এমন একটি নির্দিষ্ট মান, যার নীচে ক্রীপ্‌-এর ফলে বিশেষ কোন বিরূপণ হয় না। তাপমাত্রা বাড়লে শিলার ক্রীপ্‌-স্ট্রেংথ্‌ কমে যায়। এই পরীক্ষাগুলি থেকে অনুমান করা হয় যে ভূত্বকের
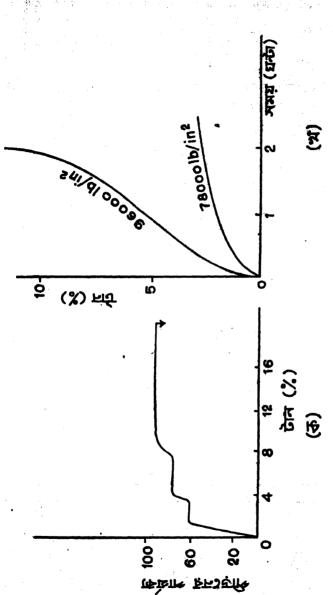
চিত্র - 10 : (ক) 10,000 এ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার্‌ অবরোধী চাপে লাইম্‌স্টোন্‌-এর বিরূপণ। লেখটির খাড়াই অংশে পীড়নের মান হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনুভূমিক অংশে পীড়ন অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
(খ) ক-লেখটির দুটি অনুভূমিক অংশের সংশ্লিষ্ট সময়ে লাইম্‌স্টোন্‌-এর মন্থর বিরূপণ বা ক্রীপ্‌। (গ্রীগ্‌স্‌, 1940 অবলম্বনে)।

অধিকাংশ গঠনই উচ্চতাপমাত্রায় দীর্ঘকাল-স্থায়ী পীড়নে ক্রীপ্-এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) দ্রবণ এবং রন্ধ্রচাপের প্রভাব

গ্রীগ্স্-এর পরীক্ষা থেকে আরও জানা যায় যে জল বা জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে এ্যালাব্যাস্টার্-এর (এক ধরনের জিপ্সাম্) ক্রীপ্-স্ট্রেংথ্ অনেকটা কমে যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক বায়ুচাপে, দ্রবণের অনুপস্থিতে, এ্যালাব্যাস্টার্-এর আচরণ হয় ভঙ্গুর পদার্থের মত। অবরোধী চাপ কিছুটা বাড়ালে শুষ্ক এ্যালা-ব্যাস্টার্ অল্প একটু বিরূপণের পরেই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু জলীয় পদার্থের উপস্থিতিতে, অবরোধী চাপ অল্প থাকলেও, এ্যালাব্যাস্টার্ ক্রীপ্-এর ফলে বেশ কিছুটা বিরূপিত হয় (11-চিত্র)। দ্রবণের উপস্থিতি বিরূপণের হারকে বাড়িয়ে দেয় (Griggs, 1940)।
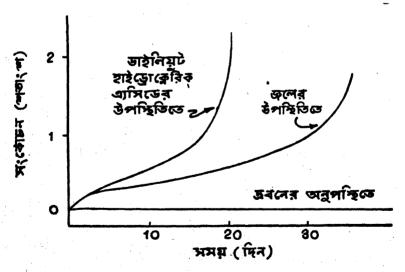
চিত্র - 11 : এ্যালাব্যাস্টার্-এর বিরূপণে দ্রবণের প্রভাব (গ্রীগ্স্, 1940 অবলম্বনে)।

চ্যুতির সৃষ্টির সময়ে শিলার অভ্যন্তরে ঘর্ষণ হয়। শিলার অভ্যন্তরের ঘর্ষণকে অতিক্রম না করলে চ্যুতি বা ফাটলের সৃষ্টি হয় না। শিলার সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্যে দ্রবণের চাপ বাড়লে শিলার অভ্যন্তরের ঘর্ষণকে অতিক্রম

করাও সহজ হয়। তাই দ্রবণের রন্ধ্রচাপ (pore pressure) বাড়লে শিলার ভঙ্গুরতাও বৃদ্ধি পায় (Heard, 1960)।

(ঙ) এ্যানাইসোট্রপি

যে বস্তুর ধর্ম সবদিকেই সমান, তাকে সমসারক বা আইসোট্রপিক্ বলা হয়। যে বস্তুর ধর্ম সব দিকে সমান নয়, তাকে বিষমসারক বা এ্যানাই-সোট্রপিক্ বলা হয়। তাপ, চাপ বা বিরূপণের হার—এগুলি সবই শিলার বাইরের পরিবেশকে নির্দিষ্ট করছে। কিন্তু, কেবল বাইরের পরিবেশই শিলার বিরূপণকে প্রভাবিত করে না। অন্যান্য বস্তুর মতো শিলার আচরণও নির্দিষ্ট হয় তার স্বকীয় ধর্ম এবং বাইরের পরিবেশের যুগ্ম প্রভাবে। যে শিলায় সম্ভেদ (cleavage) বা মণিকরেখা (mineral lineation) থাকে সেগুলি বিষমসারক বা anisotrotic হয়।

গ্রিগস্-এর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে শিলার সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী কিছুটা পরিমাণে শিলার বিরূপণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ-পরীক্ষা-গুলিতে 10,000 kg/cm² অবরোধী চাপে মার্বেল্-এ বেশ কিছুটা চিরস্থায়ী বিরূপণ দেখা গিয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সঙ্কোচনকারী পীড়ন মার্বেল্-এর সম্ভেদ বা ফোলিয়েশন্-এর সমান্তরালে থাকলে যতটা
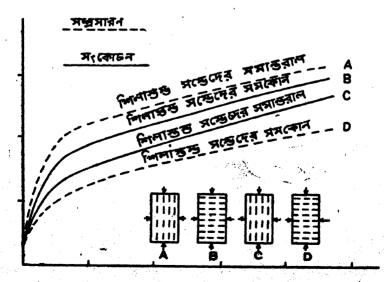
চিত্র - 12 : 100,000 kg/cm² অবরোধী চাপে এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মার্বেল্-এর বিরূপণে এ্যানাইসোট্রপির প্রভাব।

বিরূপণ ঘটায়, পীড়নটি ফোলিয়েশন্-এর সমকোণে থাকলে বিরূপণ তার থেকে কম হয় (চিত্র 12)। আবার একটি নির্দিষ্ট সম্প্রসারণকারী পীড়ন, ফোলিয়েশন্-এর সমান্তরালে থাকলে যতটা বিরূপণ ঘটায়, পীড়নটি ফোলিয়েশন্-এর সমকোণে থাকলে বিরূপণ তার থেকে অনেক বেশী হয় (চিত্র 12)।

শিলার ফোলিয়েশন্ কেবল শিলার বিরূপণকেই প্রভাবিত করে না, শিলার ছেদক ফাটলের (shear fracture) ভঙ্গীকেও নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা জানি যে সমসারক বা আইসোট্রপিক্ শিলায় সঙ্কোচনকারী পীড়নের সাথে মোটামুটি ভাবে 30° কোণ করে ছেদক ফাটলের সৃষ্টি হয় (Hubbert, 1951)। কিন্তু শিলায় যদি কোন সম্ভেদ (cleavage) থাকে (অর্থাৎ শিলাটি যদি বিষমসারক বা এ্যানাইসোট্রপিক হয়) তাহলে ছেদক ফাটলের ভঙ্গী অন্যরকম হতেও পারে। 13-চিত্রে σ_1 সঙ্কোচনকারী
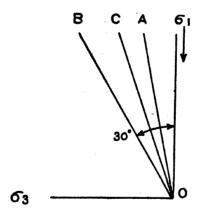
চিত্র - 13 : জেগার্-এর তত্ত্ব অনুসারে ছেদক ফাটলের সৃষ্টি। OA-রেখা শিলাসম্ভেদের সমান্তরাল। OB-রেখা σ_1-এর সঙ্গে 30° কোণ করছে। তত্ত্ব অনুসারে OC-ফাটলটি OA এবং OB-এর মধ্যবর্তী কোণের ভেতরে সৃষ্টি হবে।

পীড়ন-অক্ষের সমান্তরাল, OA-রেখাটি শিলা সম্ভেদের সমান্তরাল এবং OB রেখাটি σ_1-অক্ষের সাথে 30° কোণ করে আছে। বলবিদ্যার তত্ত্ব প্রয়োগ করে জেগার্ (Jarger, 1960) সিদ্ধান্ত করেছেন যে এক্ষেত্রে ছেদক

ফাটলটি OA এবং OB রেখার মধ্যবর্তী কোণের ভেতরে (13-চিত্রের OC-রেখা) সৃষ্টি হবে। স্লেট্-পাথরের উপর পরীক্ষা করে ডোনাথ্ (1961) মোটামুটি ভাবে অনুরূপ সিদ্ধান্তেই এসেছেন। উদাহরণতঃ সঙ্কোচনকারী পীড়নের সাথে স্লেট্-এর ত্বক্ভেদ 60° কোণ করে থাকলে, পীড়নাক্ষের সাথে 45° কোণ করে ছেদক ফাটলের সৃষ্টি হয়। আবার সঙ্কোচনকারী পীড়নের সাথে শিলাসম্ভেদ 10° কোণ করে থাকলে পীড়নাক্ষের সাথে 18° কোণ করে ছেদক ফাটলের সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষাগারের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিলাবিরূপণের পরীক্ষাগুলি থেকে দেখা গিয়েছে যে কয়েকটি নির্দিষ্ট শিলাগঠন (চিত্র 14) এক একটি
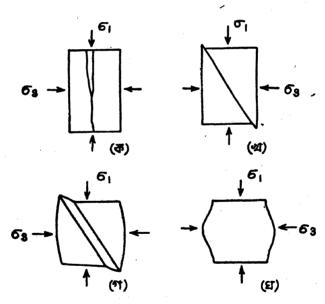
চিত্র - 14ঃ পরীক্ষাগারের বিরূপিত শিলাখণ্ডে চার ধরনের গঠনঃ—(ক) সম্প্রসারক ফাটল, (খ) স্বতন্ত্র স্খলনতল-যুক্ত চ্যুতি, (গ) স্খলিত-অঞ্চল-যুক্ত চ্যুতি, এবং (ঘ) সুসম প্রবাহ (uniform flow)।

বিশেষ পরিবেশে সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশে এই গঠনগুলি দেখলে আমরা অবরোধী চাপ এবং তাপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারি (Griggs and Handin, 1960)। অবরোধী চাপ এবং তাপ অল্প হলে পরীক্ষাগারের শিলাখণ্ডগুলিতে সঙ্কোচনকারী পীড়নের

সমান্তরালে সম্প্রসারক ফাটলের (extension fracture) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাপ এবং অবরোধী চাপ অল্প হলে শিলাটি পুরোপুরি ভঙ্গুর পদার্থের মতো আচরণ করে। মাঝারি ধরনের তাপে বা অবরোধী চাপে পরিষ্কার ছেদক ফাটলের বা চ্যুতির সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশে শিলার আচরণ মোটামুটি ভাবে ভঙ্গুর পদার্থের মতো হলেও কিছুটা চিরস্থায়ী বিরূপণও হতে পারে। তাপ এবং অবরোধী চাপের মান আরও বাড়লে শিলার আচরণ আর পুরোপুরি ভঙ্গুর পদার্থের মত হয় না। এক্ষেত্রে শিলাটির আচরণ হয় ভঙ্গুর ও নম্য পদার্থের আচরণের মাঝামাঝি ধরনের। এ ধরনের আচরণকে বলা হয় ট্র্যান্‌জিশনাল্‌ (transitional)। এই পরিবেশে একটি পরিষ্কার পৃষ্ঠের উপর চ্যুতি হয় না, একটি চওড়া অঞ্চল জুড়ে চ্যুতিটি ছড়িয়ে থাকে (14-গ চিত্র)। এই চ্যুত অঞ্চলে শিলার মণিকগুলি বিচূর্ণিত হয় এবং অঞ্চলটিতে মাইলোনাইট্‌-এর (mylonite) সৃষ্টি হয়। তাপ বা অবরোধী চাপের মান আরও বেশী হলে শিলাটির আচরণ পুরোপুরি নম্য বস্তুর মতো হয় (চিত্র 14-ঘ)।

সংক্ষেপে বলা চলে যে শিলার বিরূপণের প্রকাশ মোটামুটি তিন ধরনের হয়ঃ (ক) সম্প্রসারক ফাটল, (খ) চ্যুতি এবং (গ) সুসম প্রবাহ (uniform flow)। পরীক্ষালব্ধ চ্যুতিগুলি আবার দুধরনের হয় (Donath et al, 1971) ঃ—ভঙ্গুর চ্যুতি (brittle fault) এবং নম্য চ্যুতি (ductile fault)। ভঙ্গুর চ্যুতির সৃষ্টির সময়ে শিলার সংসক্তি (cohesion) সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় (চিত্র 14)। ভঙ্গুর চ্যুতি দুধরনের হতে পারেঃ পরিষ্কার স্খলনতলের চ্যুতি (clean-cut fault) এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে একটি স্খলিত অঞ্চল বা শিয়ার্‌ জোন্‌ (shear zone)। নম্য চ্যুতির সৃষ্টির সময়ে শিলার সংসক্তি বিনষ্ট হয় না। পরীক্ষাগারে ভঙ্গুর চ্যুতির সৃষ্টির সময়ে পীড়নের মান হঠাৎ কমে যায়। নম্য চ্যুতির সৃষ্টির সময়ে পীড়নের মান এভাবে হঠাৎ কমে না (Odé, 1960)।

পরিচ্ছেদ ৪

গঠনের পরিমাপ

গঠনের জ্যামিতি বর্ণনা হোক্ কিংবা তার জন্মবৃত্তান্ত হোক্, শিলার গঠন সম্পর্কে যে কোন আলোচনাতে গঠনটি কত বড় সেটা স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া দরকার। একই পদার্থ দিয়ে গঠিত বিভিন্ন পরিমাপের বস্তুর আচরণ সমান নয়। কাদা দিয়ে খেলার ঘর বা কুটির তৈরী করা সম্ভব, কিন্তু কাদা দিয়ে বিশাল অট্টালিকা তৈরীর চেষ্টা করলে সেটা নিজের ওজনেই ভেঙে পড়বে। অর্থাৎ, কোন প্রতিকৃতি বা মডেল্-এর আচরণ তার পরিমাপের ওপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে যে-তত্ত্বটি প্রচলিত আছে তার নাম পরিমাপগত প্রতিকৃতির তত্ত্ব (theory of scale models)। এই তত্ত্বের প্রয়োগ থেকে জানা যায় যে শিলার গঠন তার আয়তনের ওপর নির্ভরশীল (Hubbert, 1937)।

অনুবীক্ষণে দেখা যায় যে শিলা কতগুলি মণিকের (mineral) স্বতন্ত্র দানার সমষ্টি। আরও সূক্ষ্ম মাপে মণিকের দানাগুলিও স্বতন্ত্র পরমাণু বা অণুর সমষ্টি দিয়ে গঠিত। কিন্তু বিশাল আয়তনে শিলার আচরণ এক অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমের মতো; সেক্ষেত্রে শিলার দানাগুলির বা পরমাণুগুলির স্বাতন্ত্র্য অপ্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন পরিমাপের গঠনগুলির চর্চার পদ্ধতিও বিভিন্ন। উদহরণতঃ, অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে গঠনগুলির নিরীক্ষা হয় সেগুলি খুব ছোট বা খুব বড় হলে চলবে না।

এছাড়া আরও একটি কারণে গঠনের পরিমাপ মোটামুটি ভাবে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ভূত্বকের কোন একটি গঠনের জ্যামিতি অনেকখানি জায়গা জুড়ে একরকম থাকে না। সাধারণতঃ নিরীক্ষিত গঠনটির পরিসর যত বড় হয়, বিভিন্ন জায়গায় গঠনটির আকৃতি ও ভঙ্গীতে তত বেশী প্রভেদ দেখা যায়। কোন নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে একটি গঠনের আকৃতি ও ভঙ্গী সর্বত্র একরকম হলে বলা হয় ঐ বিশেষ গঠনটির প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট পরিসরটির গাঠনিক সমরূপতা অথবা গাঠনিক অভিন্নতা (structural homogeneity) আছে। সাধারণতঃ একটি বিশেষ মাপের গঠনের নিরীক্ষা থেকে তার অনেক বড় বা অনেক ছোট গঠন সম্পর্কে সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত করা চলেনা।

শিলাগঠনের আয়তন নির্দিষ্ট করতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন সূক্ষ্ম মাপের প্রয়োজন নেই। মোটামুটি ভাবে আয়তনটি কি ধরনের সেটা জানলেই কাজ চলে যায়। তাই গঠনের বর্ণনায় যে পরিমাপ (scale) সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় তার বিভাগগুলো বেশ স্থূল হয়। গঠনের আয়তন নির্দিষ্ট করার জন্য দু'ধরনের পরিমাপ-পদ্ধতি প্রচলিতঃ—

প্রথম পদ্ধতি (Bailey, 1935 দ্রষ্টব্য)

(ক) **আণুবীক্ষণিক মাপ** (microscopic scale)।

(খ) **শিলাখণ্ডের মাপ** (scale of hand specimen), অথবা **ক্ষুদ্রায়তন** (small scale); অর্থাৎ গঠনটি এত ছোট যে হাতে নিয়ে সেটি নিরীক্ষা করা চলে।

(গ) **একক উদ্ভেদের মাপ** (scale of a single outcrop), অথবা **মধ্যমায়তন** (intermedicate scale); অর্থাৎ গঠনটি এত ছোট নয় যে হাতে নিরীক্ষা করা চলে, আবার এত বড় নয় যে কেবলমাত্র মানচিত্র তৈরী করে তার গঠন অনুধাবন করা সম্ভব। সাধারণতঃ যেটুকু জায়গায় মাটি থেকে পাথরগুলি বেরিয়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে একনজরে যতটা শিলাগঠন দেখা যায় সেই পরিমাপ পর্যন্ত **মধ্যমায়তন** বলা চলে।

(ঘ) মানচিত্রের মাপ, অথবা **বৃহদায়তন**; অর্থাৎ গঠনটি এত বড় যে কেবলমাত্র তার নক্সা তৈরী করেই গঠনটিকে সমগ্র ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

বিকল্পে, উইস্-রচিত পরিমাপ-পদ্ধতিও (Weiss, 1959; Turner, and Weiss, 1963) ব্যবহার করা চলে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ—

(ক) **উপআণুবীক্ষণিক মাপ** (submicroscopic scale) গঠনগুলির মাপ পরমাণুর আয়তনের সমতুল্য। এক্স্‌রশ্মির সাহায্যে এই মাপের গঠনের পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

(খ) **আণুবীক্ষণিক মাপ** (microscopic scale)ঃ যে-মাপের গঠনগুলি অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(গ) **মেসোস্কোপিক মাপ** (mesoscopic scale)ঃ প্রথম পরিমাপ-পদ্ধতিটির ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তন এই দুটি মাপকে একত্র করে এই বিভাগটি রচিত।

(ঘ) **বৃহদায়তন** (macroscopic scale)ঃ মানচিত্রের মাপ।

উল্লিখিত অর্থে আণুবীক্ষণিক, ক্ষুদ্রায়তন, মধ্যমায়তন এবং বৃহদায়তন —এই মাপগুলি বাঙলাভাষায় ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। পরবর্তী আলোচনায় পরিমাপের বর্ণনার জন্য শুধু এই শব্দগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে। উপআণুবীক্ষণিক গঠনগুলি গাঠনিক ভূবিদ্যার অংশ হিসাবে এখনও পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়নি।

পরিচ্ছেদ ৩

রৈখিক ও সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী

রৈখিক ও সমতলীয় গঠনের ভঙ্গীর বর্ণনা

সাধারণতঃ কিছু সংখ্যক সরল জ্যামিতিক উপাদানের মাধ্যমে শিলার গঠনগুলির আকৃতি ও ভঙ্গী বর্ণিত হয়। গঠনের এই উপাদানগুলি দু'ধরনের হয়ঃ রৈখিক ও সমতলীয়। স্তরবিন্যাস বা বেডিং একটি সমতলীয় গঠন (planar structure)। স্লেট্ পাথরের মতো কোন কোন রূপান্তরিত শিলার গঠন এমন হয় যে একটি সমতলের সমান্তরালভাবে শিলাটিকে পাতায় পাতায় খুলে ফেলা সম্ভব। এই গঠনগুলির নাম সম্ভেদ্ বা ক্লিভেজ্। সম্ভেদ্ বা ক্লিভেজ্ একটি সমতলীয় গঠন। আবার বেডিং ও শিলাসম্ভেদ যে-রেখায় পরস্পরকে ছেদ করে সেটি একটি রৈখিক গঠন। যে কোন দুটি সমতলীয় গঠনের প্রতিচ্ছেদকে (intersection) রৈখিক গঠন বলা চলে। আবার সমান্তরালভাবে অবস্থিত দীর্ঘ বস্তুসমূহের সমন্বয়েও রৈখিক গঠন চিহ্নিত হতে পারে।

একটি রৈখিক বা সমতলীয় গঠনের **ভঙ্গী** (attitude) বলতে বোঝায় গঠনটি কোন্‌দিকে কতখানি অবনত তার বর্ণনা। **গাঠনিক ভূবিদ্যায় একটি রৈখিক গঠন বা একটি সরলরেখার ভঙ্গী তার ট্রেন্ড্** (trend) **এবং প্লাঞ্জ্** (plunge) **দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।** একটি সরলরেখার দুই প্রান্ত থেকে একটি সমতলের ওপর দু'টি লম্ব টানলে লম্বগুলি দু'টি বিন্দুতে সমতলটিকে ছেদ করে। এই দুই বিন্দুর যোজক রেখাটিকে সমতলটির ওপর প্রথমোক্ত রেখাটির অভিক্ষেপ (projection) বলা হয়। একটি রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড্ বলতে বোঝায় একটি অনুভূমিক (horizontal) সমতলের ওপর রৈখিক গঠনটির অভিক্ষেপের দিক্‌নির্দেশ। অথবা, বলা যেতে পারে যে **একটি রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড্ বলতে বোঝায় রৈখিক-গঠন-গামী উল্লম্ব-সমতলের** (vertical plane) **ওপরে অবস্থিত একটি অনুভূমিক রেখার দিক্‌নির্দেশ। রৈখিক-গঠনগামী উল্লম্ব-সমতলের ওপরে অবস্থিত একটি অনুভূমিক রেখার সাথে রৈখিক গঠনটি যে কোণ সৃষ্টি করে, সেই কোণকে রৈখিক গঠনটির প্লাঞ্জ্ বলা হয়।** চিত্র 15-তে OP-রেখাটি একটি রৈখিক গঠন, OPM একটি উল্লম্ব সমতল এবং OM-

চিত্র - 15 : OX এবং OY অক্ষদুটি অনুভূমিক এবং OZ -অক্ষটি উল্লম্ব। OX-অক্ষ উত্তর দিকের সমান্তরাল। OLPR -সমতলীয় গঠনের উপরে অবস্থিত OP একটি রৈখিক গঠন। PM একটি উল্লম্ব রেখা; সুতরাং OPM সমতলটি উল্লম্ব। এই সমতলে OM একটি অনুভূমিক রেখা। θ এবং ϕ, OP -রেখার দুটি spherical coordinates। উত্তর দিক্ এবং OM-রেখার মধ্যবর্তী θ কোণটিকে রৈখিক গঠন OP -এর ট্রেন্ড বলা হয়। OM এবং OP রেখার মধ্যবর্তী α-কোণটিকে প্লাঞ্জ্ বলা হয়। OL-রেখাটি সমতলীয় গঠন OLPR -এর স্ট্রাইক্। স্ট্রাইক্-রেখা OL এবং রৈখিক গঠন OP -এর মধ্যবর্তী কোণ LOP -কে রৈখিক গঠনটির পিচ্ বলা হয়।
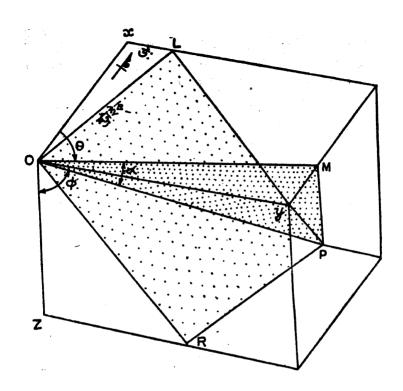
রেখাটি এই সমতলস্থিত অনুভূমিক রেখা। MOP কোণটি রৈখিক গঠনের প্লাঞ্জ্। উত্তর দিকের OX-রেখার সাথে OM রেখার কোণ গঠনটির ট্রেন্ড্।

একটি সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী তার নতি (*dip*) এবং নতির দিক্‌নির্দেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। বিকল্পে, গঠনটির ভঙ্গী তার স্ট্রাইক্ ও নতি দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। একটি সমতলীয় গঠন এবং একটি অনুভূমিক

সমতলের মধ্যবর্তী কোণকে সমতলীয় গঠনটির নতি বলা হয় (চিত্র 19)। একটি সমতলীয় গঠন এবং একটি অনুভূমিক সমতলের প্রতিচ্ছেদের দিক্-নির্দেশকে গঠনটির স্ট্রাইক্ বলা হয় (চিত্র 19)। অথবা, **সমতলীয় গঠনের ওপরে অবস্থিত একটি অনুভূমিক রেখার দিক্‌নির্দেশকে গঠনটির স্ট্রাইক্ বলা হয়।** সমতলীয় গঠনটির নতির দিক্‌নির্দেশ (dip direction) বলতে বোঝায় গঠনটির স্ট্রাইক্-এর সমকোণে অবস্থিত একটি অনুভূমিক রেখার দিক্‌নির্দেশ।

স্থানাঙ্কের দ্বারা রৈখিক ও সমতলীয় গঠনের ভঙ্গীর নির্দেশঃ

ট্রেন্ড্ এবং প্লাঞ্জ্, অথবা স্ট্রাইক্ এবং নতির এই প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি থেকে কিন্তু একথা বোঝা যায় না যে কেন এই বিশেষ পদ্ধতিতে রৈখিক ও সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী বর্ণিত হয়। জ্যামিতিতে কোন রেখার অথবা সমতলের ভঙ্গী ও অবস্থান নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই একটি স্থানাঙ্ক প্রণালী (coordinate system) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ একটি বিন্দু থেকে পরস্পরের সমকোণে অবস্থিত তিনটি অক্ষ দ্বারা স্থানাঙ্ক প্রণালীটি নির্দিষ্ট করা হয়। গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যাতেও একটি বিশেষ স্থানাঙ্ক প্রণালীর সাহায্যে গঠনের ভঙ্গী নির্দিষ্ট করা হয়।

ধরা যাক্ ox, oy এবং oz পরস্পরের সমকোণে অবস্থিত তিনটি অক্ষ (চিত্র 15), এবং P যেকোন একটি বিন্দু। P-বিন্দু থেকে xy-সমতলের ওপর PM লম্ব টানা হোল। এখন OM-রেখাটি xy-সমতলের ওপর OP-রেখার অভিক্ষেপ (projection)। x-অক্ষ এবং OM-রেখার অন্তরর্তী কোণকে θ, z-অক্ষ এবং OP-রেখার অন্তবর্তী কোণকে ϕ, এবং O-বিন্দু থেকে P-বিন্দুর দূরত্বকে r আখ্যা দেওয়া হোল। ঘনজ্যামিতিতে θ, ϕ এবং r স্থানাঙ্ক দ্বারা যেকোনো বিন্দুর অবস্থান বা সরলরেখার ভঙ্গীকে নির্দিষ্ট করা যায়। এই স্থানাঙ্কগুলিকে spherical coordinates বলে।

গাঠনিক ভূবিদ্যায় ঘনজ্যামিতির এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই রৈখিক ও সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী নির্দিষ্ট করা হয়। তবে, যেহেতু এক্ষেত্রে গঠনের উপরিস্থিত কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই, তাই r-স্থানাঙ্কটির প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু রৈখিক গঠনের ভঙ্গী মাপার জন্যে ϕ কোণটির পরিবর্তে OM এবং OP রেখার অন্তবর্তী α-কোণটিকে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। বলা বাহুল্য $\alpha = 90° - \phi$। অতএব α এবং θ এই দুই কোণের দ্বারা এই রৈখিক গঠনের ভঙ্গী নির্দিষ্ট করা যায় (চিত্র 15)।

কিন্তু এক্ষেত্রে xy-সমতলটি এবং x ও z-অক্ষ কিভাবে ঠিক করা হোল? ব্যবহারিক ভূবিদ্যায় xy-সমতলটির পরিবর্তে একটি জায়গার অনুভূমিক সমতল, x-অক্ষের পরিবর্তে উত্তরদিক্ এবং z-অক্ষের পরিবর্তে সেই জায়গার উল্লম্ব রেখাকে (vertical line) বেছে নেওয়া হয় (চিত্র 15)। অতএব, এক্ষেত্রে θ-কোণটি হোল রৈখিক গঠন OP-এর ট্রেন্ড্ এবং α-কোণটি তার প্লাঞ্জ্।

ঘন জ্যামিতিতে একটি সমতলের ভঙ্গীকে সমতলটির অভিলম্বের (normal) ভঙ্গী দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। 16 নং চিত্রে ABCD একটি
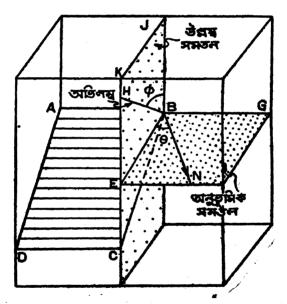
চিত্র-16ঃ ABCD একটি সমতলীয় গঠন, BEG একটি অনুভূমিক সমতল এবং BJKEC একটি উল্লম্ব সমতল। BH-রেখাটি সমতলীয় গঠন ABCD-এর অভিলম্ব, এবং BJ একটি উল্লম্ব রেখা। BJKEC উল্লম্ব সমতলটিকে BEFG অনুভূমিক সমতলটি BE-রেখায় ছেদ করছে। BN-এর তীর-চিহ্ন উত্তর দিক্ নির্দেশ করছে। এক্ষেত্রে BJ এবং BH রেখার মধ্যবর্তী ϕ-কোণটিকে নতি বলা হয়, এবং BN ও BE রেখার মধ্যবর্তী θ-কোণটিকে নতির দিক্‌নির্দেশ বলা হয়।

সমতলীয় গঠন, EBG একটি অনুভূমিক সমতল, BH-রেখা ABCD-সমতলের অভিলম্ব এবং BJ একটি উল্লম্ব রেখা। সুতরাং 16 নং চিত্রের

BJKEC একটি উল্লম্ব সমতল (vertical plane)। অনুভূমিক সমতলটির ওপর BN-রেখার তীর-চিহ্ন উত্তর দিক্ নির্দিষ্ট করছে। উল্লম্ব BJKEC-সমতলটি EBG-সমতলকে BE-রেখায়, এবং সমতলীয় গঠন ABCD-কে BC-রেখায় ছেদ করে। BE-রেখাটি অবশ্যই একটি অনুভূমিক সমতলের ওপরে সমতলীয় গঠনটির অভিলম্বের অভিক্ষেপ। সুতরাং BE এবং BN-রেখার (অর্থাৎ, উত্তর দিকের) মধ্যবর্তী θ-কোণ (চিত্র 16) একটি স্থানাঙ্ক নির্দেশ করবে। আবার অভিলম্ব BH-রেখা এবং উল্লম্ব BJ-রেখার মধ্যবর্তী ϕ-কোণ অপর স্থানাঙ্কটি নির্দেশ করবে। গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যায় ϕ-কোণটিকে নতি এবং θ-কোণটিকে নতির দিক্-নির্দেশ (dip direction) বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে BE-এবং BC-রেখার মধ্যবর্তী কোণটিও ϕ-এর সমান।

রৈখিক গঠনের ক্ষেত্রে (চিত্র 15) গঠনটির নিম্নগামী অংশের অনুভূমিক অভিক্ষেপ এবং উত্তর-দিকের মধ্যবর্তী কোণকে θ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সমতলীয় গঠনের ক্ষেত্রে অভিলম্বের ঊর্ধ্বগামী অংশের (চিত্র 16) অভিক্ষেপ এবং উত্তর-দিকের মধ্যবর্তী কোণকে θ বলা হয়েছে। এর কারণ, সমতলীয় গঠনটি যেদিকে অবনত, গঠনটির অভিলম্ব তার বিপরীত দিকে অবনত থাকে। অর্থাৎ, অভিলম্বটি যেদিকে উন্নত হয়, সমতলটি সেই দিকে অবনত হয় (চিত্র 17 দ্রষ্টব্য)। তাই অভিলম্বটির ঊর্ধ্বাংশের অভিক্ষেপের দিক্‌নির্দেশ দ্বারা সমতলীয় গঠনটির নতির দিক্‌নির্দেশ করা হয়।

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে নতির যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞা অনুসারে একটি সমতলীয় গঠন ও একটি অনুভূমিক সমতলের মধ্যবর্তী কোণকে নতি বলা হয়েছে। এই প্রচলিত সংজ্ঞাটি গ্রহণ করলে মনে রাখা দরকার যে জ্যামিতিতে দুটি সমতলের মধ্যবর্তী কোণকে সমতল-দুটির অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। এক্ষেত্রে অনুভূমিক সমতলের অভিলম্ব অবশ্যই একটি উল্লম্ব রেখা। সুতরাং কোন স্থানে নতি মাপতে হলে কার্যতঃ একটি উল্লম্ব রেখা এবং সমতলীয় গঠনের অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণটিকেই মাপা হয় (চিত্র 16 এবং চিত্র 17 দ্রষ্টব্য)। ক্লাইনোমিটার কম্পাস্-এর সাহায্যে এই কোণটিকে সরাসরি মাপা যায়। নতি মাপার জন্যে ক্লাইনোমিটার কম্পাস্‌টি একটি সমতলীয় গঠনের ওপর এমনভাবে রাখা হয় যাতে ধাতু নির্মিত ওলনটি কোন বাধা না পেয়ে ঝুলে থাকতে পারে (চিত্র 18)। এ অবস্থায় কম্পাসের সমতলটি উল্লম্ব থাকে এবং ক্লাইনোমিটার-এর স্কেল্-এর শূন্য-চিহ্নের দিক্‌টি সমতলীয় গঠনের অভিলম্ব নির্দেশ করে। সমতলীয় গঠনটির নতির মান
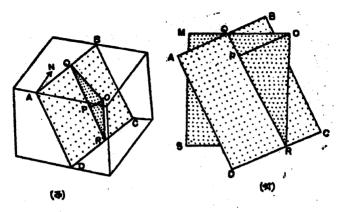
চিত্র - 17 ঃ ABCD একটি সমতলীয় গঠন এবং OP এই সমতলের অভিলম্ব। AB -রেখাটির দিক্‌নির্দেশকে গঠনটির স্ট্রাইক্ বলা হয়। (খ)-চিত্রের OP অভিলম্বগামী QORSM একটি উল্লম্ব সমতল। এই সমতলের ওপর OQ একটি অনুভূমিক রেখা এবং OR একটি উল্লম্ব রেখা। এক্ষেত্রে OP এবং OR রেখার মধ্যবর্তী ROP কোণটিকে ABCD সমতলীয় গঠনের নতি বলা হয়। OQ এবং QR রেখার মধ্যবর্তী OQR কোণটিও নতির সমান। (ক)-চিত্রের গঠনটিকেই বড় করে (খ)-চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ক্লাইনোমিটারের স্কেল্-এ ওলনের তীর-চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট হয় (চিত্র 18)।

যেকোন একটি উল্লম্ব সমতলের ওপর একটি সমতলীয় গঠনের ছেদরেখা (trace) ঃ প্রকৃত নতি ও উপনতি।

প্রকৃতিতে শিলাগঠনের রূপটি সবসময় সম্পূর্ণভাবে আমরা দেখতে পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্‌ভেদের (outcrop) বিভিন্ন পৃষ্ঠে গঠনটির প্রতিচ্ছেদের (intersection) রূপটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আগেই বলা হয়েছে যে একটি অনুভূমিক সমতলের ওপর একটি সমতলীয় গঠনের ছেদরেখা থেকে গঠনটির স্ট্রাইক্ নির্ণীত হয়। তেমনি, সমতলীয় গঠনটির অভিলম্বের সমান্তরাল একটি উল্লম্ব সমতলের ওপর (অর্থাৎ, স্ট্রাইক্‌এর সমকোণে অবস্থিত শিলাপৃষ্ঠের ওপর) গঠনটির ছেদরেখা থেকে নতির মান নির্ণয় করা যায় (চিত্র 19-ক)। কিন্তু উল্লম্ব সমতলটি যদি স্ট্রাইক্-এর সাথে সমকোণে অবস্থিত না হয় (চিত্র 19-খ) তাহলে সেই সমতলের ওপর একটি সমতলীয় গঠনের ছেদরেখা থেকে প্রকৃত নতি (অর্থাৎ, নতি)
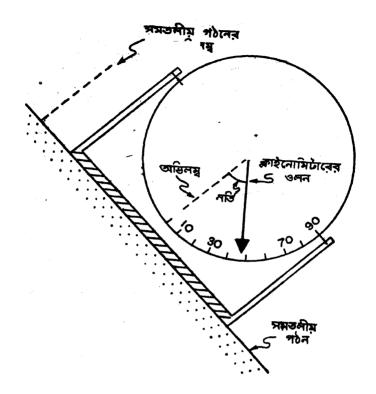
চিত্র - 18ঃ নতি মাপার জন্যে ক্লাইনোমিটার কম্পাস্‌টি'কে একটি সমতলীয় গঠনের ওপরে এমনভাবে বসানো হয় যাতে ক্লাইনোমিটার্‌-এর ওলনটি উল্লম্ব থাকে। এই অবস্থায় ক্লাইনোমিটার্‌-এর শূন্য-চিহ্নটি সমতলীয় গঠনের অভিলম্বের সমান্তরাল হয়। সমতলীয় গঠনটির নতির মান ক্লাইনোমিটার্‌-এর স্কেল্‌-এ ওলনের তীর-চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। এইভাবে একটি উল্লম্ব রেখা এবং সমতলীয় গঠনের অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণটিকে ক্লাইনোমিটার্‌-এর সাহায্যে সরাসরি মাপা যায়।

নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই ছেদরেখা এবং উল্লম্ব সমতলটির ওপর অবস্থিত একটি অনুভূমিক রেখার মধ্যবর্তী কোণটিকে উপনতি (apparent dip) বলা হয় (চিত্র 19-খ)।

স্ট্রাইক্‌-এর সমান্তরালে উপনতির মান অবশ্যই শূন্য হবে। স্ট্রাইক্‌-এর সাথে উপনতির দিকের কোণ যত বাড়বে, উপনতির মানও তত বৃদ্ধি পাবে। স্ট্রাইক্‌-এর সমকোণে 'উপনতি'র মান বৃহত্তম হবে। এইটিই প্রকৃত নতি বা নতি।

কোন একটি বিশেষ দিকে একটি সমতলীয় গঠনের উপনতির মান কত হবে? বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়।

(ক) স্ট্রাইক্ এবং উপনতির দিক্‌নির্দেশের মধ্যবর্তী কোণ যদি β হয়, ϕ যদি প্রকৃত নতির মান হয়, এবং ψ যদি উপনতির মান হয় (চিত্র 19), তাহলে নিম্নলিখিত সূত্র থেকে নতি এবং উপনতির সম্পর্ক পাওয়া যাবেঃ

$$\tan \psi = \sin \beta \tan \phi \tag{5}$$

উদাহরণতঃ, ধরা যাক্ একটি স্তরের স্ট্রাইক্ 80° এবং প্রকৃত নতি 60° উত্তরাভিমুখী। এক্ষেত্রে 30°-এর দিকে উপনতি কত হবে? এখানে $\beta = 50°$, এবং $\phi = 60°$।

$$\text{সুতরাং, } \tan \psi = \sin 50° \times \tan 60° = 1{\cdot}3$$

অতএব উপনতির মান $52{\cdot}5°$।

(5)-নম্বর সমীকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে স্ট্রাইক্-এর সমান্তরালে (অর্থাৎ, $\beta = 0$) উপনতির মান শূন্য হবে। আবার, $\beta = 90°$ হলে ψ এবং ϕ-এর মান সমান হবে। (5)-নম্বর সূত্রটি থেকে আরও বোঝা যায় যে প্রকৃত নতি (ϕ) যদি 90° হয়, তাহলে উপনতি ψ-এর মান সবসময়ে 90° হবে। অর্থাৎ, উল্লম্ব স্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃত নতি এবং উপনতির কোন প্রভেদ থাকে না। (5-নং সমীকরণটি কিভাবে পাওয়া গেল সেটা পরিশিষ্ট (ক)-তে দেখানো হয়েছে।)

(খ) বিকল্পে, জ্যামিতিক অঙ্কন থেকেও উপনতির মান নির্ণয় করা যায়। উদাহরণতঃ (ক)-এ বর্ণিত প্রথম উদাহরণটি ধরা যাক্। এক্ষেত্রে স্ট্রাইক্-এর সমান্তরালে উত্তরদিকের সাথে 80° কোণ করে AB-সরলরেখা আঁকা হোল (চিত্র 20)। ধরা যাক্ এই রেখাটি সমভূমির ওপর অবস্থিত একটি স্তরের স্ট্রাইক্-রেখা। AB-রেখার সমান্তরালে, নতির দিকে যেকোন দূরত্বে CD-রেখা আঁকা হোল। ধরা যাক্ CD-রেখাটি একটি সমগভীরতার রেখা। অর্থাৎ এই CD-রেখার যেকোন বিন্দু থেকে সমভূমির নীচে একটি বিশেষ গভীরতায় নামলে (20 নং চিত্রের h-গভীরতা) স্তরটিকে পাওয়া যাবে। এখন AB এবং CD রেখার সমকোণে একটি সরলরেখা আঁকা হোল। এই রেখাটি AB এবং CD-কে যথাক্রমে E এবং F বিন্দুতে ছেদ করে। EF রেখাতে স্তরটির প্রস্থচ্ছেদ আঁকার জন্যে E-বিন্দু থেকে EF-রেখার সাথে প্রকৃত নতির সমান কোণ করে
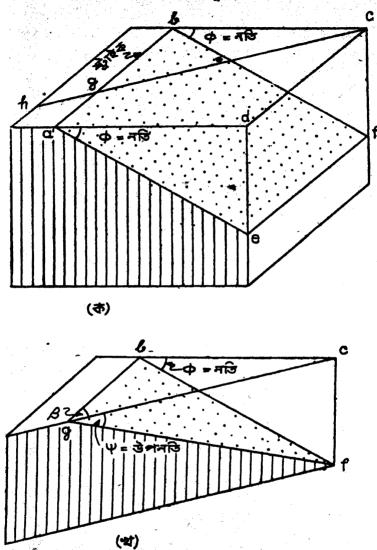
চিত্র-19: (ক) $abfe$ একটি সমতলীয় গঠন এবং $abcd$ একটি অনুভূমিক সমতল। ab এই দুই সমতলের ছেদ রেখা। এটিকে স্ট্রাইক্ বলা হয়। ab-রেখার সমকোণে ade একটি উল্লম্ব সমতল। dae সমতলীয় গঠনটির নতি বা প্রকৃত নতি। (খ) ক-চিত্রের gc-রেখার সমান্তরালে gef একটি উল্লম্ব সমতল। gf এই উল্লম্ব সমতলের ওপরে $abcd$ সমতলীয় গঠনের ছেদরেখা। এই চিত্রে gc একটি অনুভূমিক রেখা। gcf কোণটিকে উপনতি বলা হয়।

চিত্র-২০ঃ জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে উপনতির মান নির্ণয়ের পদ্ধতি।
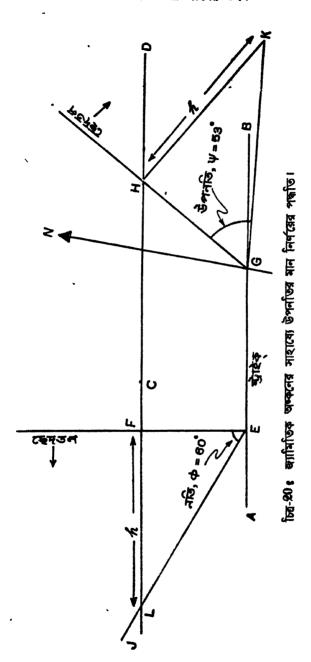
(অর্থাৎ, 60° কোণ ক'রে) EJ-রেখা আঁকা হোল। প্রস্থচ্ছেদে এটিই স্তরটির ছেদরেখা। এখন F-বিন্দু থেকে EF-রেখার ওপর লম্ব টানা হোল। এই লম্বটি EJ-রেখাকে L-বিন্দুতে ছেদ করে। FL-রেখাটির দৈর্ঘ্য h-গভীরতার সমান হবে। অর্থাৎ প্রকৃত নতির দিকে EF-এর সমান দূরত্বে গেলে গভীরতাবৃদ্ধির মান h হবে। এখন উপনতির দিকে (অর্থাৎ, উত্তর দিকের সাথে 30° কোণ করে) একটি সরলরেখা আঁকা হোল। এই রেখাটি AB এবং CD-কে যথাক্রমে G এবং H-বিন্দুতে ছেদ করে। GH-রেখার ওপর একটি ছেদতল (section) আঁকার জন্যে H-বিন্দু থেকে GH-রেখার ওপর লম্ব টানা হোল। এই লম্ব থেকে HK-রেখাংশটি FL-রেখাংশের সাথে সমান করে নেওয়া হোল। এক্ষেত্রে উপনতির দিকে GH-এর সমান দূরত্বে গেলে স্তরটির গভীরতাবৃদ্ধির মান h হবে। সুতরাং HGK কোণটি উপনতির মান নির্দেশ করবে।

(গ) কার্যক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিকরা ওপরে বর্ণিত পদ্ধতি দুটির কোনটিই সাধারণতঃ ব্যবহার করেন না। স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের (stereographic projection) সাহায্যে খুব অল্প সময়ে নতি থেকে উপনতির মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের পদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

গাঠনিক ভূবিদ্যায় কোন কোন সময়ে যে কোন দুই দিকের উপনতি থেকে নতির মান ও দিক্‌নির্দেশ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও সাধারণতঃ স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের সাহায্যেই সমস্যাটির সমাধান করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হয় সেই পদ্ধতিটি নীচের উদাহরণে দেখানো হয়েছে। ধরা যাক্ 30°-এর দিকে একটি সমতলীয় গঠনের উপনতির মান 44°। 320°-এর দিকে একই গঠনের উপনতির মান 59°। সমতলীয় গঠনটির নতির মান ও দিক্‌নির্দেশ কত?

এই সমস্যাটির সমাধানের জন্যে যে কোন একটি বিন্দু O-থেকে 30° এবং 320°-এর দিকে OB এবং OC রেখাদুটি আঁকা হোল (চিত্র 21)। এখন OB-রেখার সমান্তরালে একটি ছেদতল আঁকার জন্যে OB-এর সাথে 44° কোণ করে OE-রেখা আঁকা হোল। এই রেখাস্থিত যে কোন বিন্দু E থেকে OB-এর ওপর লম্ব টানা হোল। এই লম্বটি OB-কে D-বিন্দুতে ছেদ করে। অর্থাৎ, সমভূমির ওপর O-বিন্দু থেকে D-বিন্দুতে গেলে সমতলীয় গঠনটির গভীরতাবৃদ্ধির মান হয় DE। একই ভাবে OC-এর দিকে একটি উল্লম্ব ছেদতল আঁকার জন্যে OC-এর সাথে 59° কোণ করে

চিত্র-২১ঃ জ্যামিতিক অংকনের সাহায্যে উপনতির থেকে প্রকৃত নতির মান এবং স্ট্রাইক্ নির্ণয়।
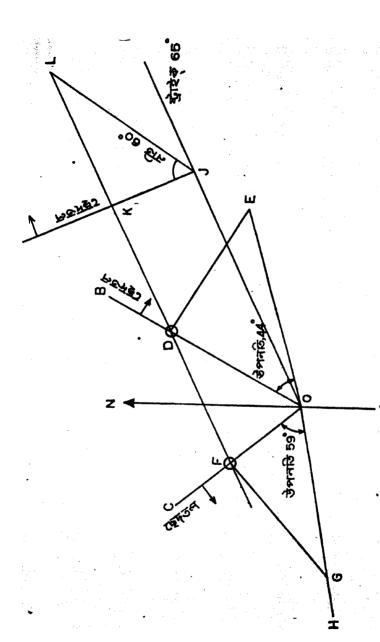
OH-রেখা আঁকা হোল। এখন OH-এর উপরিস্থিত এমন একটি বিশেষ বিন্দু G-থেকে OC-এর ওপর লম্ব টানা হোল যে GF-লম্বটি ED-রেখাংশের সমান হয়। এখন F এবং D এমন দুটি বিন্দু যাতে এই বিন্দুদুটি থেকে সমান গভীরতায় নামলে সমতলীয় গঠনটিকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ FD রেখাটি একটি সমগভীরতার রেখা, এবং এই রেখাটি অবশ্যই সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্-এর সমান্তরাল। O-থেকে FD-এর সমান্তরালে OJ রেখা আঁকা হোল। OJ-রেখাটি সমভূমির ওপরে সমতলীয় গঠনটির স্ট্রাইক্ নির্দিষ্ট করে। FD-রেখাকে দুপাশে বিস্তৃত করার পর, J-বিন্দু থেকে FD-রেখার বিস্তৃত অংশের ওপর JK লম্ব টানা হোল। এখন JK-রেখাটি সমতলীয় গঠনের প্রকৃত নতির দিক্-নির্দেশের সমান্তরাল। প্রকৃত নতির দিকে একটি ছেদতল আঁকার জন্যে K-বিন্দু থেকে JK-রেখার ওপর একটি লম্ব টানা হোল। এই লম্ব থেকে DE-রেখাংশের সমান ক'রে KL রেখাংশটি নেওয়া হোল। সমভূমিতে J-বিন্দু থেকে K-বিন্দুতে যেতে হলে সমতলীয় গঠনটির গভীরতাবৃদ্ধির মান হয় KL(=DE=GF)। সুতরাং LJK কোণটি সমতলীয় গঠনের প্রকৃত নতি।

একটি সমতলীয় গঠনের ওপর একটি রৈখিক গঠনের পিচ্ :—

আগেই বলা হয়েছে যে একটি রৈখিক গঠনের ভঙ্গী তার ট্রেন্ড্ এবং প্লাঞ্জ্ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। প্লাঞ্জ্-এর মান যদি বেশী হয় তাহলে ক্লাইনোমিটার্ কম্পাস্-এর সাহায্যে সরাসরি ট্রেন্ড্ মাপতে গেলে কিছুটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অনেক সময়ে রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড্ এবং প্লাঞ্জ্ না মেপে রৈখিক গঠনটির পিচ্ মাপা হয়। তবে, রৈখিক গঠনের পিচ্ মাপতে হলে গঠনটি একটি নির্দিষ্ট সমতলের ওপর (অর্থাৎ, একটি সমতলীয় গঠনের ওপর) থাকার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সমতলীয় গঠনটির ভঙ্গী জানা থাকলে, কেবলমাত্র রৈখিক গঠনটির পিচ্ মাপলেই গঠনটির ভঙ্গী নির্দিষ্ট হয়। **সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্-এর সাথে সেই সমতলস্থিত রৈখিক গঠনটি যে কোণ সৃষ্টি করে, সেই কোণটিকে রৈখিক গঠনটির পিচ্ বলা হয়** (চিত্র 15)। বলা বাহুল্য যে পিচ্-এর মান শূন্য হলে রৈখিক গঠনটি অনুভূমিক হবে এবং গঠনটির ট্রেন্ড্ সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্-এর সমান হবে। আবার পিচ্-এর মান 90° হলে রৈখিক গঠনটির ট্রেন্ড্ নতির দিক্‌নির্দেশের সমান্তরাল হবে, এবং গঠনটির প্লাঞ্জ্ নতির মানের সমান হবে।

কার্যক্ষেত্রে সবসময়েই পিচ্-প্লাঞ্জ্-এর সমস্যার সমাধান স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের সাহায্যে করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে। জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যেও পিচ্ থেকে ট্রেন্ড্ এবং প্লাঞ্জ্ নির্ণয় করা সম্ভব। তবে স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের তুলনায় জ্যামিতিক অঙ্কনে অনেক বেশী সময় লাগে। পিচ্-এর সাথে ট্রেন্ড্ বা প্লাঞ্জ্-এর সম্পর্ক গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। পরিশিষ্ট 'খ'-এ এই সমীকরণগুলি দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৬

স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ

স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ কাকে বলে?

স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের (Bucher, 1944 এবং Phillips, 1954 দ্রষ্টব্য) জন্যে কল্পনা করা হয় যে একটি গোলকের কেন্দ্রে সমতলীয় ও রৈখিক গঠনগুলি অবস্থিত। সমতলীয় গঠনগুলি অবশ্যই গোলকটির পৃষ্ঠকে বৃত্তাকার রেখায় ছেদ করবে। আবার, একটি রৈখিক গঠন গোলকটির পৃষ্ঠকে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন গোলার্ধে দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে। স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের জন্যে গোলকটির নিম্নগোলার্ধের পৃষ্ঠের এই ছেদরেখা বা ছেদবিন্দুগুলিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গোলকটির নৈরক্ষিক তলে (equatorial plane) অভিক্ষেপ করা হয়। গোলকটির নিম্ন-গোলার্ধের একটি বিন্দুকে গোলকটির ঊর্ধ্বগোলার্ধের মেরুর সাথে সরলরেখায় যোগ করলে, যোজক রেখাটি গোলকের নৈরক্ষিক তলকে যে-বিন্দুতে ছেদ করবে, সেটিই রৈখিক গঠনটির স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ (চিত্র 22)। আবার, গোলকটির নিম্নগোলার্ধের বৃত্তাকার ছেদরেখার প্রতিটি বিন্দুকে গোলকের ঊর্ধ্বমেরুর সাথে যোগ করলে, যোজক রেখাগুলি গোলকের নৈরক্ষিক তলকে কতকগুলি বিন্দুতে ছেদ করবে। এই বিন্দু-গুলির সমষ্টি যে-বক্ররেখার সৃষ্টি করবে সেটিই একটি সমতলীয় গঠনের স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ। গোলকের যে-নৈরক্ষিক তলটির ওপর অভি-ক্ষেপ করা হয় সেটি অবশ্যই একটি বৃত্তের দ্বারা সীমিত। এই বৃত্তটিকে আদিবৃত্ত (primitive circle) বলা হয়।

স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্

গাঠনিক ভূবিদ্যায় স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের জন্যে স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্ ব্যবহার করা হয়। এই নেট্-এর সাহায্যে যে কোন ভঙ্গীর সমতলীয় বা রৈখিক গঠনের স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ সহজেই করা যায়। নেট্এর আদিবৃত্তটিতে পরস্পরের সমকোণে দুটি ব্যাস আঁকা থাকে। এই ব্যাস-দুটির একটি (চিত্র 23) উত্তর-দক্ষিণ দিক্ নির্দেশ করে এবং অপরটি পূর্ব-পশ্চিম দিক্ নির্দেশ করে। সুতরাং কম্পাস্-এর 360 ডিগ্রির মতো
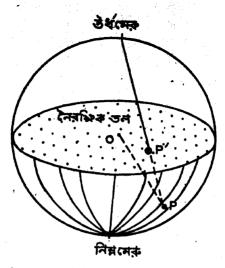
চিত্র - 22 ঃ স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের জন্যে কল্পনা করে নেওয়া হয় যে রৈখিক বা সমতলীয় গঠনগুলি একটি গোলকের কেন্দ্রে অবস্থিত। ধরা যাক্ গোলকের কেন্দ্রগামী OP-রেখাটি গোলকের নিম্ন গোলার্ধের পৃষ্ঠকে P-বিন্দুতে ছেদ করে। গোলকের ঊর্ধ্বমেরুর সাথে P-বিন্দুটি যোগ করলে, যোজক রেখাটি গোলকের নৈরক্ষিক তলকে P′-বিন্দুতে ছেদ করে। P′-বিন্দুটি OP-রেখার স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ।

স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর আদিবৃত্তের পরিধিকেও 360 ডিগ্রিতে ভাগ করা যায়।

আদিবৃত্তের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু দিয়ে পরপর কতকগুলি বৃত্তাকার চাপ (arc) আঁকা থাকে। ভূগোলকের দ্রাঘিমারেখার সদৃশ এই বৃত্তাংশগুলিকে মহাবৃত্ত (great circles) বলা হয়। প্রত্যেকটি মহাবৃত্ত এক একটি সমতলের স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ। এই সমতলগুলির প্রত্যেকটির স্ট্রাইক্ উত্তর-দক্ষিণ, এবং সমতলগুলি পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে নত। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম রেখাদুটিকেও (চিত্র 23) মহাবৃত্ত বলা হয় কারণ এই রেখাদুটিও গোলকের কেন্দ্রগামী দুটি উল্লম্ব সমতলের অভিক্ষেপ। মনে রাখা দরকার যে গোলকের কেন্দ্রগামী যে কোন সমতলই গোলকের পৃষ্ঠকে বৃত্তাকারে ছেদ করে। স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর আদিবৃত্তটি (primitive circle) একটি অনুভূমিক সমতলের অভিক্ষেপ।

স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর সমাক্ষরেখার (latitudes) সদৃশ রেখাগুলিকে ক্ষুদ্রবৃত্ত (small-circles) বলা হয়। এগুলি গোলকের কেন্দ্রগামী
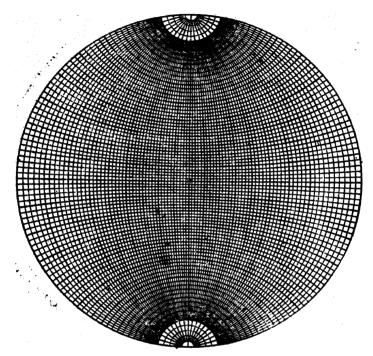
চিত্র - 23 : স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্।

সমতলের অভিক্ষেপ নয়। গোলকের উত্তর বা দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে গোলকের পৃষ্ঠে একটি বৃত্ত আঁকলে এই বৃত্তের স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ হবে স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর একটি ক্ষুদ্রবৃত্ত। একটি বিশেষ ক্ষুদ্রবৃত্তের ওপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু গোলকের উত্তর মেরু (অথবা দক্ষিণ মেরু) থেকে একটি নির্দিষ্ট কোণে অবস্থিত হয়। স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর ক্ষুদ্রবৃত্তগুলি উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসটিকে বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করে। বলা বাহুল্য এই বিন্দুগুলি উত্তর বা দক্ষিণ মেরু থেকে এক একটি নির্দিষ্ট কোণের নির্দেশক।

স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর সাহায্যে সমতলীয় বা রৈখিক গঠনের অভিক্ষেপ অঙ্কনের জন্যে প্রথমে নেট্-টির ওপরে একটি স্বচ্ছ কাগজ বা

ট্রেসিং-কাগজ রেখে বোর্ড্-পিন্ দিয়ে কাগজটিকে নেট্-এর কেন্দ্রে গেঁথে দেওয়া হয়। তারপর ট্রেসিং কাগজের আদিবৃত্তের পরিধিতে একটি পেন্সিলের চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিক্ নির্দিষ্ট করা হয়।

(১) রৈখিক গঠনের অভিক্ষেপ

(ক) প্রথমে ট্রেসিং কাগজটি ঘুরিয়ে কাগজের উত্তর চিহ্নটি নেট্-এর উত্তর দিকের সাথে মিলানো হল।

(খ) এখন আদিবৃত্তের পরিধির ওপর রৈখিক গঠনটির ট্রেন্ড্-এর সমান কোণে একটি দাগ দেওয়া হোল। কাগজটিকে ঘুরিয়ে এই দাগটিকে এখন নেট্-এর উত্তর দিকের সংগে মিলানো হোল।

(গ) তারপর নেট্-এর উত্তর মেরু থেকে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসের ওপর প্লাঞ্জ্-এর সমান কোণটি মেপে ট্রেসিং কাগজে একটি বিন্দু চিহ্নিত করা হোল। এই বিন্দুটিই রৈখিক গঠনটির স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ।

উদাহরণতঃ, ধরা যাক্ একটি রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড 60° এবং প্লাঞ্জ্ 40°। ট্রেসিং-কাগজটির উত্তর দিক্-চিহ্নটি নেট্-এর উত্তর দিকে মিলিয়ে আদি-বৃত্তের পরিধিতে 60°-তে একটি চিহ্ন দেওয়া হোল। তারপর ট্রেসিং কাগজটিকে ঘুরিয়ে এই চিহ্নটিকে নেট্-এর উত্তর দিকের সাথে মিলানো
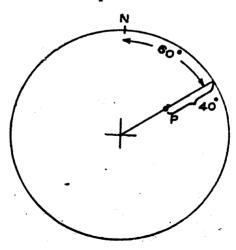
চিত্র - 24 : স্টিরিওগ্রাফিক্ অভি-ক্ষেপে রৈখিক গঠনের ভঙ্গী স্থাপন। এক্ষেত্রে 60°-এর দিকে রৈখিক গঠন P-এর প্লাঞ্জ্ 40°।

হোল। এখন নেট্-এর উত্তর মেরু থেকে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসের ওপর 40°-তে একটি বিন্দু আঁকা হোল (24-চিত্রের P-বিন্দু)।

(২) সমতলীয় গঠনের অভিক্ষেপ

সমতলীয় গঠনের অভিক্ষেপ দু'ভাবে করা যায়। সমতলীয় গঠনটিকে একটি মহাবৃত্তে অভিক্ষেপ করা যায়, অথবা সমতলীয় গঠনের অভিলম্ব-টিকে একটি বিন্দু হিসেবে অভিক্ষেপ করা যায়।

প্রথমে ট্রেসিং কাগজের উত্তর-চিহ্নকে নেট্-এর উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হোল। এখন নেট্-এর পরিধির কৌণিক মাপ অনুসারে ট্রেসিং কাগজে গঠনটির স্ট্রাইক্ অথবা নতির দিক্ চিহ্নিত হোল। তারপর স্ট্রাইক্-চিহ্নটিকে নেট্-এর উত্তর দিকে (অথবা নতির দিক্‌কে নেট্-এর পূর্ব বা পশ্চিম দিকে) নিয়ে যাওয়া হোল। নতির মান অনুসারে উপযুক্ত মহাবৃত্তটি এঁকে নেওয়া হোল। এটিই সমতলীয় গঠনটির অভিক্ষেপ (চিত্র 25)।
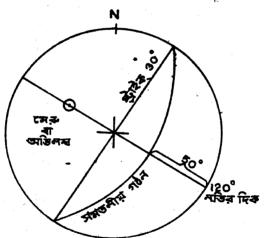
চিত্র - 25 : স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপে সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী স্থাপন। সমতলীয় গঠনটি 120°-এর দিকে 50°-তে নত। সমতলীয় গঠনটির মেরু বা অভিলম্বটি সমতলীয় গঠনের ঠিক বিপরীত দিকে (অর্থাৎ 300°-এর দিকে) 40°-তে অবনত।

সমতলীয় গঠনের অভিলম্বের অভিক্ষেপের প্রণালী অন্যান্য রৈখিক গঠনের অভিক্ষেপ-প্রণালীর অনুরূপ। তবে, মনে রাখা দরকার যে সম-

তলীয় গঠনটির নতি যেদিকে থাকে, অভিলম্বের প্লাঞ্জ্ হয় তার ঠিক বিপরীত দিকে। আবার, সমতলীয় গঠনের নতির মান যদি θ হয়, তাহলে অভিলম্বের প্লাঞ্জ্ হবে $(90° - \theta)$। উদাহরণতঃ, 25-চিত্রের সমতলীয় গঠনটি 120°-এর দিকে 50°-তে নত। সমতলীয় গঠনটির অভিলম্বটির ট্রেন্ড্ $120° + 180° = 300°$, এবং অভিলম্বটির প্লাঞ্জ্ $90° - 50° = 40°$। স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপে সমতলীয় গঠনের অভিলম্বকে মেরু বা পোল্ (pole) আখ্যা দেওয়া হয়।

(৩) প্রকৃত নতি থেকে উপনতি নির্ণয়

(ক) যে কোন দিকে একটি সমতলীয় গঠনের উপনতি নির্ণয়ের জন্যে প্রথমে সমতলীয় গঠনটিকে তার স্ট্রাইক্ এবং প্রকৃত নতির সাহায্যে (২) প্রণালী অনুসারে একটি মহাবৃত্তে এঁকে নেওয়া হয়।

(খ) এখন ট্রেসিং কাগজের উত্তর-চিহ্ন নেট্-এর উত্তর দিকের সাথে মিলিয়ে আদিবৃত্তের পরিধিতে উপনতির দিকে একটি দাগ দেওয়া হয়।

(গ) ট্রেসিং কাগজ ঘুরিয়ে উপনতির দিক্‌নির্দেশের চিহ্নটিকে নেট্-এর উত্তর দিকের সাথে মিলানো হয়। তারপর সমতলীয় গঠনের নির্দেশক
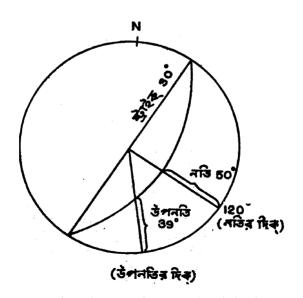
চিত্র - 26 : স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপে প্রকৃত নতি থেকে উপনতির মান নির্ণয়।

মহবৃত্তটি নেট্-এর উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসকে যে-বিন্দুতে ছেদ করছে সেই বিন্দুটিকে চিহ্নিত করা হয়। এই বিন্দুটি নেট্-এর উত্তর বা দক্ষিণ মেরু থেকে যে কৌণিক দূরত্বে থাকবে সেটিই গঠনটির উপনতি (চিত্র 26 দ্রষ্টব্য)।

(৪) দুটি উপনতি থেকে সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী নির্ণয়

(ক) প্রথমে ট্রেসিং কাগজের উত্তর-চিহ্ন নেট্-এর উত্তর দিকে মিলিয়ে উপনতির দিক্ দুটি আদিবৃত্তের (primitive circle) পরিধিতে চিহ্নিত করা হোল।

(খ) এখন একটি উপনতির দিক্-চিহ্নকে নেট্-এর উত্তর দিকের সাথে মিলানো হোল, এবং উপনতির মান অনুসারে নেট্-এর উত্তর মেরু থেকে উপযুক্ত কৌণিক দূরত্বে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসের উপর একটি বিন্দু স্থাপিত হোল। অনুরূপভাবে অপর উপনতিটির থেকে আর একটি বিন্দু অভিক্ষেপ করা হোল।
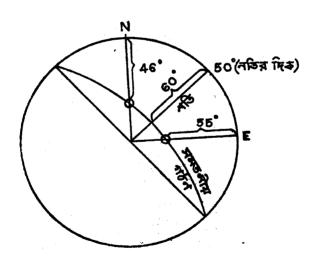
চিত্র - 27 : স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপে দুটি উপনতি থেকে সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী নির্ণয়। এক্ষেত্রে পূর্বদিকে উপনতি 55° এবং উত্তর দিকে উপনতি 46°। উপনতির অভিক্ষিপ্ত বিন্দু দুটি দিয়ে যে মহাবৃত্তটি আঁকা যাবে সেটিই সমতলীয় গঠন। এক্ষেত্রে গঠনটি 50 ডিগ্রির দিকে 60 ডিগ্রিতে নত।

(ঘ) তারপর ট্রেসিং কাগজটি ঘুরিয়ে এমন এক অবস্থায় রাখা হোল যে দুটি বিন্দুই নেট্-এর ঠিক্ একটি মহাবৃত্তের ওপর আসে। এই অবস্থায় এই মহাবৃত্তটিকে ট্রেসিং কাগজে এঁকে নেওয়া হোল। এই মহা-বৃত্তটির ভঙ্গীই সমতলীয় গঠনের ভঙ্গী নির্দেশ করবে (চিত্র 27 দ্রষ্টব্য)।

(৫) যেকোন দুটি সমতলীয় গঠনের ছেদরেখার ভঙ্গী নির্ণয়

(২)-এ বর্ণিত প্রণালী অনুসারে সমতলীয় গঠনদুটিকে দুটি মহাবৃত্তে অভিক্ষেপ করা হোল। এই মহাবৃত্তদুটির ছেদবিন্দু P-এর ভঙ্গীই নির্ণেয় ছেদরেখার ভঙ্গী। ট্রেসিং কাগজ ঘুরিয়ে P-বিন্দুটিকে নেট্-এর উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসের ওপরে নিয়ে যাওয়া হোল। এখন এই ব্যাসের ওপর উত্তর বা দক্ষিণ মেরু থেকে বিন্দুটির কৌণিক দূরত্ব মেপে নেওয়া হোল। এই কোণটি সমতলীয় গঠনদ্বয়ের ছেদ রেখার প্লাঞ্জ্ নির্দেশ করবে। তারপর নেট্-এর উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসটি P-বিন্দু দিয়ে গিয়ে ট্রেসিং কাগজের আদিবৃত্তের পরিধিকে যে-বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটিকে (28-চিত্রের
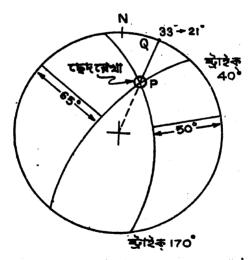
চিত্র - 28: স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের সাহায্যে দুটি সমতলীয় গঠনের ছেদরেখার ভঙ্গী নির্ণয়। একটি সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্ 40° এবং নতি 65° উত্তরপশ্চিম; দ্বিতীয় গঠনটির স্ট্রাইক্ 170° এবং নতি 50° পূর্ব। সমতলীয় গঠনদুটির ছেদ রেখার প্লাঞ্জ্ 33 ডিগ্রি এবং ট্রেন্ড্ 21 ডিগ্রি।

Q-বিন্দু) চিহ্নিত করা হোল। আবার কাগজটিকে ঘুরিয়ে উত্তর চিহ্নটিকে নেট্-এর উত্তর দিকের সাথে মিলানো হোল। এখন Q-বিন্দুটি নেট্-এর উত্তর দিক্ থেকে যে-কোণে থাকবে সেটি ছেদরেখার ট্রেন্ড্।

(৬) রৈখিক গঠনের পিচ্ থেকে ট্রেন্ড্ এবং প্লাঞ্জ্ নির্ণয়

স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর প্রত্যেকটি মহাবৃত্তকে ক্ষুদ্রবৃত্তগুলি বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করে। এই বিন্দুগুলি থেকে এক একটি মহাবৃত্তের ওপর বিভিন্ন ভঙ্গীর রেখার পিচ্ নির্দিষ্ট হয়। যেমন, মহাবৃত্তের যে-বিন্দুতে 40° কোণের ক্ষুদ্রবৃত্ত ছেদ করে (চিত্র-29), সেই বিন্দুটির পিচ্-ও 40°। (মনে রাখা দরকার যে সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্-এর সাথে সেই সমতলস্থিত রৈখিক গঠন যে-কোণ সৃষ্টি করে সেই কোণকে পিচ্ বলা হয়)।
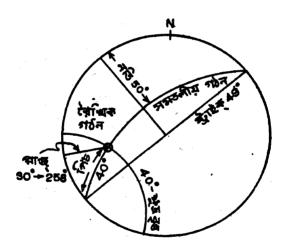
চিত্র-29: পিচ্ থেকে প্লাঞ্জ্ নির্ণয়। 49 ডিগ্রি স্ট্রাইক্-এ উত্তরপশ্চিমে 50° নত সমতলীয় গঠনের ওপর একটি রৈখিক গঠনের পিচ্ 40° (দঃ)। রৈখিক গঠনটির প্লাঞ্জ্ 30° এবং ট্রেন্ড্ 258°।

একটি সমতলীয় গঠনের ওপর একটি রৈখিক গঠনের পিচ্ দেওয়া থাকলে, প্রথমে সমতলীয় গঠনটিকে (২)-প্রণালীতে একটি মহাবৃত্তে এঁকে নেওয়া হয়। তারপর মহাবৃত্তটির ওপর পিচ্-এর কোণ অনুসারে মেপে নিয়ে একটি বিন্দু স্থাপন করা হয়। এই বিন্দুটি রৈখিক গঠনটির অভি-

প্লেট—2 : লাইম্‌স্টোন্‌-এ স্ট্রোমাটোলিটিক্‌ বেডিং ; মাইহার, মধ্যপ্রদেশ।
(অধ্যাপক অজিত কুমার সাহার সৌজন্যে)
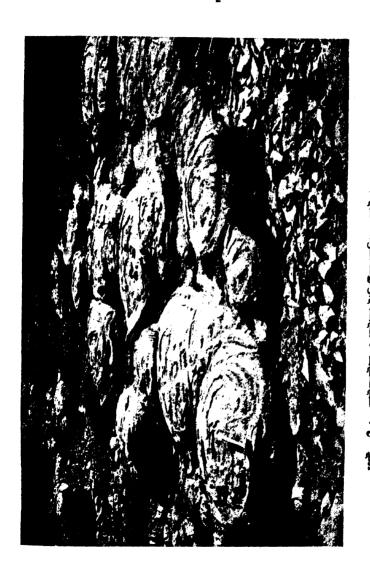
প্লেট—1 : বেলে পাথরে স্রোতজাত লহরীচিহ্ন ; পাথ্‌না নালা, মাইহার, মধ্যপ্রদেশ।
(অধ্যাপক অজিত কুমার সাহার সৌজন্যে)

ক্ষেপ-বিন্দু। এখন (৫)-নং প্রণালীর শেষাংশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড্ ও প্লাঞ্জ্ নির্ণয় করা যাবে (চিত্র-29 দ্রষ্টব্য)।

সমক্ষেত্র-অভিক্ষেপ

গাঠনিক ভূবিদ্যায় যখন একই ধরনের অনেকগুলি গঠনের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ে, তখন স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের পরিবর্তে **সমক্ষেত্র-অভিক্ষেপের** (equal area projection) ব্যবহার সুবিধাজনক হয়। সমক্ষেত্র অভিক্ষেপের জন্যে সমক্ষেত্র নেট্ ব্যবহার করা হয়। এটি দেখতে প্রায় স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্-এর মতো, এবং এই নেট্-এর সাহায্যে গাঠনিক উপাদানগুলিকে অভিক্ষেপ করার পদ্ধতি স্টিরিওগ্রাফিক্ নেট্ ব্যবহারের পদ্ধতির অনুরূপ।

পরিচ্ছেদ ৭

পাললিক গঠন এবং ক্রমবিচ্ছেদ

গাঠনিক ভূবিদ্যায় পাললিক গঠনের নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পলির অবক্ষেপণের (deposition) সময়ে এবং পলিগুলির দৃঢ়ীভবনের (consolidation) পূর্বে যে-গঠনগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে পাললিক গঠন বলা হয় (Shrock, 1948; Hills, 1963 দ্রষ্টব্য)। পাললিক গঠন-গুলির সৃষ্টির প্রক্রিয়া সরাসরি ভাবে গাঠনিক ভূবিদ্যার অংশ নয়। তবে গাঠনিক ভূবিদ্যার চর্চায় পাললিক গঠনগুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। প্রথমতঃ, শিলার বিরূপণের (deformation) বিশ্লেষণের জন্যে শিলার আদি আকৃতি কেমন ছিল সেটাও জানা দরকার। কোন বস্তুর আদি আকৃতি জানা না থাকলে, সে-আকৃতির কতটা পরি-বর্তন হয়েছে সেটা জানা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, পলির দৃঢ়ীভবনের পরে যে গঠনগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলির সাথে কিছু কিছু পাললিক গঠনের আকারের সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন নরম অশিলীভূত পলিতে তির্যক স্তর (cross-bedding) বলিত (folded) হতে পারে; আবার শিলীভবনের পরেও বলির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই দুই ধরনের বলির সৃষ্টির প্রক্রিয়া একেবারেই আলাদা। তাই ভূসংক্ষোভজাত গঠনগুলির (diastrophic structure) সাথে পাললিক গঠনের প্রভেদ নির্ণয়ের প্রয়ো-জনীয়তা আছে। তৃতীয়তঃ, কোন কোন পাললিক গঠন থেকে শিলার নবীনত্বের দিক (direction of younging) নির্ণয় করা সম্ভব। ভূসং-ক্ষোভের ফলে যেসব অঞ্চলে শিলাস্তরের উল্টিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই অঞ্চলে পাললিক গঠনের সাহায্যে শিলার নবীনত্বের দিক্ নির্ণয় করতে পারলে গাঠনিক বিশ্লেষণ অনেক সহজ হয়।

স্তরের স্থূলতা

পাললিক শিলায় পলির বিভিন্ন স্থূলতার পরত (layers) দেখা যায়। সাধারণভাবে এগুলিকে স্তর বলা হলেও, আরও নির্দিষ্ট এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে স্তর (stratum) বলতে অপেক্ষাকৃত স্থূল পরতকে বোঝায়। সাধারণতঃ এক সেন্টিমিটারের চেয়ে স্থূল পরতগুলিকেই স্তর আখ্যা

দেওয়া হয়। পরতের স্থূলতা এক সেন্টিমিটারের চেয়ে কম হলে সেগুলিকে ল্যামিনেশন্ (lamination) বলা হয় (McKee and Weir, 1953)।

একটি বিশেষ স্তর বা ল্যামিনেশন্-এর স্থূলতা দৈর্ঘ্যের দিকে অনেকটা পর্যন্ত বেশ সমান থাকতে পারে। অপর পক্ষে কোন কোন স্তরে স্থূলতার অনেকটা পরিবর্তন দেখা যায়; স্তরটি কোথাও সরু হয়, কোথাও পুরু হয়। আবার কোথাও দেখা যায় একটি স্তর দৈর্ঘ্যের দিকে লেন্স্-এর আকারে ক্রমশঃ পাতলা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

স্তরের আভ্যন্তরিক গঠন

পলির স্তরের অন্তর্গত গঠনগুলিও বিভিন্ন ধরনের হয়। কোন কোন স্তরের অভ্যন্তরে কোন রকম সমতলীয় গঠন দেখা যায় না, আবার কোন কোন স্তরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রঙের বা বিভিন্ন মণিক সমষ্টির সূক্ষ্ম ল্যামিনেশন্ দেখা যায়। এই ল্যামিনেশনগুলি দু'ধরনের হতে পারে। সাধারণতঃ পলির অবক্ষেপণের সময়ে ল্যামিনেশনগুলি মোটামুটিভাবে অনুভূমিক হয়। পক্ষান্তরে, বিশেষ করে বেলে পাথরের মতো শিলায়, পলির অবক্ষেপণের সময়েই অনুভূমিক স্তরের সাথে কোনাকুনিভাবে **তির্যক্ ল্যামিনেশনের** (cross lamination) সৃষ্টি হতে পারে। এই গঠনটিকেই কখনও **কারেন্ট্ বেডিং** (current bedding) অথবা তির্যক্ বেডিং (cross bedding) অথবা তির্যক স্তরায়ণ (cross stratification) বলা হয়। (কারো কারো মতে তির্যক ল্যামিনেশন্ কথাটি কেবল ক্ষুদ্রায়তনের গঠনের জন্যে ব্যবহার করা উচিত। অপেক্ষাকৃত স্থূল গঠনের জন্যে কারেন্ট্ বেডিং বা তির্যক্ বেডিং বা তির্যক্ স্তরায়ণ কথাগুলি ব্যবহার করা চলে)। কারেন্ট্ বেডিং-এর মূল অংশটিকে (অর্থাৎ যে অংশে ল্যামিনেশন্-গুলি অন্য স্তরের সাথে তির্যক্ ভঙ্গীতে থাকে) ফোর্সেট্ বেড্ (foreset bed) বলে। ব-দ্বীপ সৃষ্টির সময়ে তির্যক্ ফোর্সেট্-গুলি নীচের দিকে ও ব-দ্বীপের সামনের দিকে প্রায় অনুভূমিক হয়ে আসে। এই অংশটিকে বটম্সেট্ বেড্ (bottomset bed) বলা হয়। আবার ব-দ্বীপের তির্যক্ ফোর্সেট্ স্তরের ওপরের অনুভূমিক স্তরগুলিকে টপ্সেট্ বেড্ (topset bed) আখ্যা দেওয়া হয় (চিত্র 30-ক)।

তির্যক্ বেডিং-এর মূল বা তির্যক অংশটির স্তরায়ণ সমতলীয় (planar) হতে পারে অথবা বক্র হতে পারে। বক্র ফোর্সেট্ বেড্-গুলি নীচের সাধারণ স্তরগুলির সাথে ক্রমশঃ সমান্তরাল হয়ে আসে। সাধারণতঃ অবক্ষেপণের সময়েই ফোর্সেট্ বেড্ এর ওপরের কিছুটা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত

হয়। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতল স্তরগুলি বক্র ফোর্‌সেট্‌ বেড্‌গুলিকে ওপরের দিকে কেটে যায়। উদ্‌ভেদে কারেন্ট্‌-বেডিং-এর শীর্ষদেশের এই বিচ্ছিন্নতা ও পাদদেশের স্পর্শিনী (tangential) ভঙ্গীর থেকে শিলাস্তরের নবীনত্বের দিক্‌ নির্ণয় করা হয়ে থাকে (চিত্র ৩০-ক)।
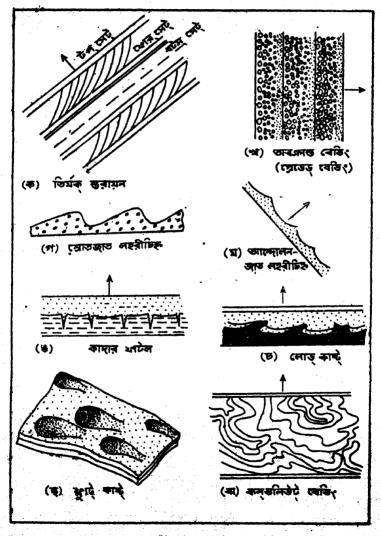
চিত্র-৩০ঃ বিভিন্ন ধরনের পাললিক গঠন। তীর চিহ্নগুলি স্তরের নবীনত্বের দিক্‌ নির্দেশ করছে।

পাললিক শিলার অভ্যন্তরে আর এক ধরনের গঠন পাওয়া যেতে পারে; এ-গুলিকে গ্রেডেড্ বেডিং (graded bedding) বা অবক্রান্ত বেডিং বলা হয়। গ্রেডেড্ বেডিং-এ একটি স্তরের নীচের থেকে ওপরের দিকে পলির দানাগুলি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। সাধারণতঃ গ্রেডেড্ বেডিং-এর নীচের অংশটি বালুকাময় (arenaceous) হয় এবং ওপরের দিকের শিলাটি ক্রমশঃ মৃন্ময় (argillaceous) হয়ে ওঠে।

গ্রেডেড্ বেডিং-এর সৃষ্টি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হতে পারে। ভার্ভ্ (varve) নামে হিমবাহজাত একধরনের অবক্ষেপে (deposit) প্রায়ই গ্রেডেড্ বেডিং দেখা যায়। হিমবাহজাত হ্রদে এই অবক্ষেপগুলির সৃষ্টি হয়।

কখনও কখনও পলিময় ঘোলা জলের স্রোত সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের পরিষ্কার জলের চেয়ে এই আবিলতার স্রোত (turbidity current) বেশী ভারী। তাই স্রোতটি সমুদ্রের তলদেশ ঘেঁষে প্রবাহিত হয়। আবিলতার স্রোতের থেকে অবক্ষিপ্ত (deposited) পলিগুলিকে টার্বিডাইট্ বলা হয়। টার্-বিডাইট্ শিলাস্তরে প্রায়ই গ্রেডেড্ বেডিং দেখা যায়।

গ্রেডেড বেডিং থেকে সহজেই শিলার নবীনত্বের দিক্ নির্ণয় করা সম্ভব (চিত্র 30-খ)। একটি নির্দিষ্ট অবক্রান্ত স্তরে (graded bed) যেদিকে পলির দানার আয়তন কমে আসছে সেই দিক্‌টি শিলার নবীনত্বের দিক্ (direction of younging)।

কোন কোন চূণাপাথরে বেডিং-এর গঠনের নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। খুব সম্ভব সমুদ্রের নীল-সবুজ শৈবালের আস্তরণগুলি এই ধরনের স্তরায়ণের সৃষ্টি করে। এই গঠনটিকে স্ট্রোমাটোলিটিক্ বেডিং বা অ্যাল্-গাল্ বেডিং (stromatolitic bedding, algal bedding) আখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরনের স্তরায়ণের আকৃতি আঁকাবাঁকা, গোলাকার বা বেশ এলোমেলো হতে পারে (প্লেট্ - ৫)।

স্তরতলের কারুকার্য

একটি স্তরের ওপরের পৃষ্ঠে অথবা নীচের পৃষ্ঠে কিংবা স্তরের অভ্য-ন্তরের বেডিং-এর পৃষ্ঠে বিভিন্ন রকমের কারুকার্য দেখা যেতে পারে। গাঠনিক ভূবিদ্যার চর্চায় এ-গুলির নিরীক্ষা থেকে স্তরায়ণের (strati-fication) সংগে অন্যান্য সমতলীয় গঠনের প্রভেদ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আবার কখনও কখনও এগুলির থেকে শিলার নবীনত্বের দিক্ নির্ণয় করা যায়।

কোন কোন স্তরের ওপরের পিঠে দেখা যায় **লহরী চিহ্ন** (ripple marks)। জলের স্রোতের তাড়নায় ঢেউয়ের আন্দোলনে নরম ঝুরঝুরে পলিতে এই ধরনের লহরীচিহ্নের সৃষ্টি হয়। স্রোতের তাড়নায় যে লহরীচিহ্নের সৃষ্টি হয় সেগুলিকে **স্রোতজাত লহরীচিহ্ন** (current ripple mark) বলে, এবং যেগুলি ঢেউয়ের ইতস্তত আন্দোলনে সৃষ্ট হয় সেগুলিকে **আন্দোলনজাত লহরীচিহ্ন** (oscillation ripple mark) বলা হয়। আন্দোলনজাত লহরীচিহ্নের আকৃতি মোটামুটি ভাবে প্রতিসম (symmetrical) হয়। এই লহরীগুলির শীর্ষ তীক্ষ্ণ এবং নীচের দিক্‌টা নিটোল হয় (চিত্র 30-ঘ)। আন্দোলনজাত লহরীচিহ্নের তীক্ষ্ণ শীর্ষ থাকায় এই গঠনটি থেকে সহজেই স্তরের নবীনত্বের দিক্‌ নির্ণয় করা সম্ভব। স্রোতজাত লহরীচিহ্নের (Plate—1) আকৃতি অপ্রতিসম (asymmetrical) হয় এবং লহরীগুলির শীর্ষদেশ ও নিম্নদেশ উভয়ই নিটোল হয়। স্রোতজাত লহরীচিহ্নের সাহায্যে সহজে শিলার নবীনত্বের দিক্‌ নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য কখনও কখনও দেখা যায় যে ভারী মণিকের দানাগুলি বিশেষভাবে লহরীচিহ্নের নিম্নদেশে সঞ্চিত হয়েছে।

নরম কাদার স্তর শুকিয়ে গেলে স্তরের ওপরের পৃষ্ঠে ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে। এই **কাদার ফাটলের** (mud crack) ওপর বালির স্তর বা অন্য পলির স্তর জমা হলে ফাটলগুলি সেই পলিতে ভরে যায়। কাদার স্তরের ওপরের পিঠে ফাটলগুলির অবস্থিতির থেকে, এবং ফাটলগুলি ক্রমশঃ নীচের দিকে সরু হয়ে আসে ব'লে, এই গঠন থেকে স্তরের ওপরের দিক্‌ বা নীচের দিক্‌ চেনা যায় (চিত্র 30-ঙ)।

এছাড়া স্তরের ওপরের পিঠে কখনও কখনও ছোট ছোট গর্ত দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নরম পলিতে বৃষ্টিপাতের ফলে এই ধরনের গর্তের সৃষ্টি হয়। **বৃষ্টির দাগের** (rain prints) এই গর্তগুলির অবতল দিক্‌ স্তরের নবীনত্বের দিক্‌ নির্দেশ করে। বৃষ্টির দাগ ছাড়াও স্তরের ওপরের পিঠে ছোট ছোট গোল দাগ দেখা যায়। যদি এই গোলাকার গর্তগুলির কিনারা একটু উঁচু হয়ে থাকে তাহলে এই গঠনকে **পিট্‌-এ্যান্ড-মাউন্ড্‌** (pit-and-mound) গঠন বলে।

সমুদ্রসৈকতে বালির ওপর দিয়ে ঢেউয়ের স্রোত চলে গেলে বালির ওপরে স্রোতের গতিপথের দিকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত আঁকাবাঁকা **দীর্ঘ ধারাচিহ্ন** (rill marks) দেখা যায়। আবার সৈকতে কোন ঝিনুক বা নুড়ি পড়ে থাকলে স্রোতের ধারা বয়ে যাওয়ার সময়ে নুড়ি বা ঝিনুকের পাশের বালিতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গর্ত তৈরী হয়। এগুলিকে **কারেন্ট্‌ ক্রেসেন্ট্‌**

(current crescent) বলা হয়। বলা বাহুল্য, ধারাচিহ্ন, কারেন্ট্ ক্রেসেন্ট্ এবং পলির অন্যান্য ক্ষয়ের চিহ্ন শিলাস্তরের ওপরের পৃষ্ঠেই কেবলমাত্র পাওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে শিলাস্তরের ওপরের পিঠে বিভিন্ন প্রাণীর সঞ্চরণের ছাপ এবং পায়ের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।

আবার শিলাস্তরের নীচের পিঠেও বিভিন্নরকম বন্ধুরতা ও কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায়। নরম কাদার স্তরের ওপরে বালির স্তর জমা হলে, বালির ওজনে স্তরটি জায়গায় জায়গায় কাদার মধ্যে বসে যেতে পারে। এর ফলে বালির স্তরের নীচের দিকে যে গঠনগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে **লোড্ কাস্ট্** (load cast) বলে (চিত্র 30-চ)। বর্তুলাকার লোড্ কাস্ট্-গুলির উত্তল দিক্ শিলাস্তরের নীচের দিক্ নির্দেশ করে। আবার জলের স্রোত পলির ওপরে যে গর্ত খুঁড়ে যায় সেগুলি পলি পড়ে বুজে গেলে ওপরের স্তরের নীচের পিঠে সেই ছাঁচের গঠনগুলি সংরক্ষিত হয়। এগুলিকে **স্কাওয়ার মার্ক্** (scour mark) বলে। একটি বিশেষ আকৃতির স্কাওয়ার মার্ক্-কে **ফ্লুট্ কাস্ট্** (flute cast) বলা হয় (চিত্র 30-ছ)। এ-গঠনগুলি ঈষৎ দীর্ঘ হয়। যেদিক থেকে স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল সেদিকটা বর্তুলাকার হয়। অপর দিকে ফ্ল্যুট্ কাস্ট্-এর পৃষ্ঠের বক্রতা কমে এসে স্বাভাবিক ভঙ্গীর বেডিং-তলের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। ফ্লুট্ কাস্ট্-এর উত্তল দিক্ স্তরের নিম্নদিক নির্দেশ করে। এ-ছাড়া নুড়ি, ঝিনুক ইত্যাদি বস্তু স্রোতের তাড়নে স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে পলির ওপরে যে দাগ কেটে যায় সেই দাগগুলির ছাঁচে ওপরের স্তরের নীচের পিঠে বিভিন্ন কারুকার্যের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের গঠনকে **টুল্ মার্ক্** (tool mark) বলা হয়।

সমসাময়িক বিরূপজাত গঠন

পলির অবক্ষেপণের সময়ে বা অব্যবহিত পরে, এবং পলির দৃঢ়ীভবনের পূর্বে স্তরের বিরূপণ হলে বিভিন্ন ধরনের পালালিক গঠনের সৃষ্টি হতে পারে। এগুলিকে সমসাময়িক বিরূপণজাত গঠন অথবা সংক্ষেপে **সমসাময়িক গঠন** (penecontemporaneous structures) বলা হয়।

কোন কোন সমসাময়িক গঠন কেবলমাত্র উল্লম্ব সরণের (vertical movement) ফলে সৃষ্ট হয়। কোন একটি স্তর নিজের ওজনেই বিভিন্ন জায়গায় বসে যেতে পারে। এর ফলে যে-গঠনগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে **সিউডোনডিউল্** অথবা **বল্-এ্যান্ড্-পিলো স্ট্রাকচার্** (pseudonodules, ball-and-pillow structures) বলা হয়। এ গঠনগুলি মোটামুটিভাবে

কিছুটা গোলাকার বা বৃত্তাকার হয়, এবং সাধারণতঃ নীচের দিকে উত্তল হয়।

সমসাময়িক বিরূপণের ফলে পলির স্তরায়ণ বেশ এলোমেলোভাবে বা কুণ্ডলীর আকারে বলিত হতে পারে। এগুলিকে কন্ভলিয়ুট্ বেডিং (convolute bedding) বলা হয় (চিত্র 30-ঝ)। এই জটিল বলির স্তরের ওপরে এবং নীচে অবিরূপিত স্তর পাওয়া যায়। কন্ভলিয়ুট্ বেডিং-এর ওপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী স্তর অবক্ষেপিত হলে শিলাস্তরের নবীনত্বের দিক্ নির্দেশ করা সহজ হয় (চিত্র 30-ঝ)।

কখনও কখনও নরম অদৃঢ়ীভূত পলির স্তর সমুদ্র বা হ্রদের ঢাল বেয়ে ধ্বসে নেমে যেতে পারে। সমুদ্রের বা হ্রদের তলদেশে অনেকদূর পর্যন্ত এই ধ্বস্-নামা পলির স্তর ছড়িয়ে যেতে পারে। বিধ্বস্ত পলিগুলিতে বিভিন্ন ধরনের গঠনের সৃষ্টি হয়। এই গঠনগুলিকে স্লাম্প্ স্ট্রাক্চার্ (slump structure) বলা হয়। ধ্বস্ নামার ফলে পলির স্তরায়ণ বলিত হতে পারে, স্তরায়ণে চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে আবার স্তরগুলি টুকরো টুকরো হয়ে একটি ব্রেক্শিয়ার (breccia) সৃষ্টি করতে পারে। কখনও কখনও সমসাময়িক বিরূপণের ফলে তির্যক্ স্তরায়ণগুলিও বলিত হতে পারে (Naha, 1961)।

সাধারণতঃ সমসাময়িক গঠনগুলির সাথে ভূসংক্ষোভজাত গঠনগুলির প্রভেদ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সমসাময়িক গঠনগুলি যে-স্তরে বা স্তর-সমষ্টিতে দেখা যায় তার ওপরের এবং নীচের স্তর অবিরূপিত বা সমতলীয় থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সমসাময়িক গঠনগুলি পাশের দিকে অল্প দূর গিয়েই মিলিয়ে যায়। কখনও এ-গঠনগুলির ওপরের পৃষ্ঠ স্রোতের তাড়নে ক্ষয়ে যায় এবং গঠনগুলির শীর্ষদেশ কর্তিত হয়। ভূসংক্ষোভজাত গঠনগুলির সৃষ্টির সময়ে শিলার অভ্যন্তরে সম্ভেদ ও মণিকরেখার (foliation and mineral lineation) সৃষ্টি হতে পারে। সমসাময়িক বিরূপণের আতিশয্য খুব বেশী হলেও কখনও শিলার অভ্যন্তরে সম্ভেদ বা মণিকরেখার সৃষ্টি হয় না। সিংভূমের ঘাটশিলা বা গালুডি অঞ্চলের মাইকা-শিস্ট্-এ অনেক সময়েই সমসাময়িক গঠন দেখা যায়। এই গঠনগুলির আকৃতির সাথে এখানকার অক্ষতলীয় সম্ভেদের (axial plane schistosity) কোন বাঁধাধরা জ্যামিতিক সম্পর্ক নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে এই গঠনগুলি ভূসংক্ষোভের (diastrophism) ফলে সৃষ্ট হয়নি (Naha, 1961)।

ক্রমবিচ্ছেদ (ব্যৎক্রমী, unconformity)

প্রাচীনতর শিলাস্তূপ ক্ষয়ে যাওয়ার পর নতুন ক'রে পলির স্তর অবক্ষিপ্ত হলে, ক্ষয়তলটিকে ক্রমবিচ্ছেদ (unconformity) বলা হয়। ক্রমবিচ্ছেদের ওপরের ও নীচের শিলাস্তর সমান্তরাল হতে পারে অথবা পরস্পরের সাথে তির্যক ভঙ্গীতে থাকতে পারে। ক্রমবিচ্ছেদের ওপরের ও নীচের স্তর পরস্পরের সাথে তির্যক্ ভঙ্গীতে থাকলে গঠনটিকে কোণীয় ক্রমবিচ্ছেদ (angular unconformity) বলে। কোন অঞ্চলের গাঠনিক ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ ভাবে কোণীয় ক্রমবিচ্ছেদ চিনতে পারার প্রয়োজনীয়তা আছে। কোণীয় ক্রমবিচ্ছেদের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়
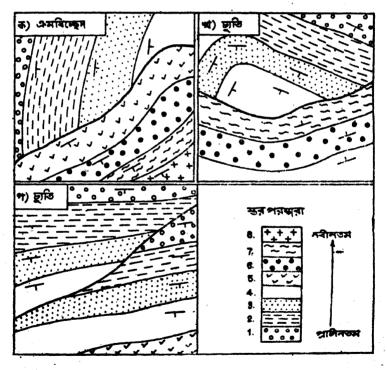
চিত্র - 31 : ক্রমবিচ্ছেদ এবং চ্যুতির পার্থক্য। ক-চিত্রটিতে নবীনতর শিলা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রাচীনতম স্তরটি বিচ্ছেদরেখার গায়ে আছে। তাই এই বিচ্ছেদতলটির ক্রমবিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। খ-চিত্রে সেরকম না থাকায় এখানকার বিচ্ছেদরেখাটি চ্যুতিরেখাই হবে। গ-চিত্রে বিচ্ছেদরেখার দু-পাশে একই স্তর থাকায়, এবং দুপাশের স্তরগুলিই বিচ্ছেদরেখার গায়ে শেষ হওয়ায়, বিচ্ছেদরেখাটিকে চ্যুতি হিসাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

যে ক্রমবিচ্ছেদের ওপরের স্তরসমূহ অবক্ষিপ্ত হওয়ার আগে অঞ্চলটি ভূসংক্ষোভের ফলে উত্থিত হয়েছিল। সুতরাং একটি শিলাস্তূপে বিভিন্ন কালের কয়েকটি কোণীয় ক্রমবিচ্ছেদ থাকলে সেগুলি থেকে ভূসংক্ষোভের ইতিহাস রচনা করার সুবিধে হয়।

চ্যুতির ফলে মানচিত্রে যে স্তরবিচ্ছেদ দেখা যায় (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তার সাথে কোণীয় ক্রমবিচ্ছেদের আপাত সাদৃশ্য থাকতে পারে। অতএব মানচিত্রে স্তরের বিচ্ছিন্নতা ক্রমবিচ্ছেদের ফলে হয়েছে না চ্যুতির ফলে হয়েছে সেটাও নির্ধারণ করা দরকার। বিচ্ছেদতলে (surface of dis-continuity) ক্রমবিচ্ছেদের বিভিন্ন রকম চিহ্ন থাকতে পারে। উদাহরণতঃ বিচ্ছেদতলের নিম্নস্থ শিলার উপল বিচ্ছেদতলের ওপরের শিলাস্তূপে থাকলে নিঃসন্দেহে ক্রমবিচ্ছেদ চেনা যেতে পারে। উদ্ভেদে চ্যুতি বা ক্রমবিচ্ছেদের চিহ্ন পরিষ্কার ভাবে না পাওয়া গেলেও গাঠনিক মানচিত্রের সাহায্যে কখনও কখনও চ্যুতির সাথে ক্রমবিচ্ছেদের প্রভেদ নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। বিচ্ছেদতলের উভয় পার্শ্বের শিলাস্তরই বিচ্ছেদরেখা (line of discontinuity) দ্বারা ছিন্ন হলে বিচ্ছেদরেখাটি অবশ্যই চ্যুতি-রেখা হবে (চিত্র 31-গ)। পক্ষান্তরে, মানচিত্রে কোণীয় ক্রমবিচ্ছেদ-রেখার একপাশের নবীনতর স্তরগুলি বিচ্ছেদে-রেখাটির সমান্তরাল হবে, এবং অন্যপাশের তির্যক্ ভঙ্গীর স্তরগুলি প্রাচীনতর হবে। উপরন্তু নবীনতর স্তরক্রমের অন্তর্গত প্রাচীনতম স্তরটি ক্রমবিচ্ছেদ-রেখার সংলগ্ন থাকবে (চিত্র 31-ক)। বলা বাহুল্য, বিচ্ছেদতলের উভয় পার্শ্বে একই স্তর থাকলে বা একই স্তরসমূহের পুনরাবৃত্তি হলে বিচ্ছেদতলটি অবশ্যই ক্রমবিচ্ছেদ হবে (চিত্র 31-গ)।

পরিচ্ছেদ ৮

বলির সংজ্ঞা ও বলির গাঠনিক উপাদান

বলির সংজ্ঞা

বলি বা ফোল্ড্ (fold) বলতে বোঝায় একটি বক্রতল অথবা কতকগুলি বক্রতলের সমষ্টি যার আদি বক্রতা (initial curvature) বিরূপণের (deformation) ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, এই সংজ্ঞা অনুসারে একটি অবিকৃত কারেন্ট্ বেডিং (current bedding) যার বক্রতা পাললিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বলি আখ্যা দেওয়া চলবে না (চিত্র ৩২-ক)। আবার, একটি বিরূপিত কারেন্ট্-বেডিং, বিরূপণের ফলে যার বক্রতা হ্রাস পেয়েছে, তাকেও বলি আখ্যা দেওয়া চলে না। বিরূপণের ফলে যদি আদি বক্রতা বৃদ্ধি পায় একমাত্র তাহলেই কারেন্ট্-বেডিংকে বলিত (folded) বলা হয়। এই ধরনের বলিত কারেন্ট্-বেডিং বিহারের ঘাটশিলা ও গালুডি অঞ্চলের আর্কিয়ান্ শিলায় প্রায়ই দেখা যায় (Naha, 1961)। ঘাটশিলা ও গালুডির বলিত কারেন্ট্-বেডিং গুলি (চিত্র ৩২-খ) অধিকাংশই নরম পলি-স্তরে সমসাময়িক বিরূপণের (penecontemporaneous deformation) ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আবার শিলীভূত স্তরের বিরূপণের ফলেও কারেন্ট্-বেডিং বলিত হতে পারে (চিত্র ৩২-গ)।

সাধারণতঃ অবিকৃত অবস্থায় পাললিক শিলার বেডিং সমতলীয় থাকে; অর্থাৎ, সাধারণতঃ তলটির আদি বক্রতার মান শূন্য হয়। সুতরাং, সাধারণতঃ পাললিক শিলার বেডিং বক্র দেখা গেলেই গঠনটিকে বলি বা ফোল্ড্ বলা হয়।

বলির জ্যামিতির চর্চায়, প্রয়োজন অনুসারে, কখনও একটি বলিত তলের জ্যামিতি, কখনও দুটি পৃষ্ঠদ্বারা সীমিত একটি স্তরের জ্যামিতি, আবার কখনও কতকগুলি বলিত স্তরের সমষ্টির জ্যামিতি বর্ণনা করা হয়।

স্তম্ভাকার বলি, বলি-অক্ষ, দীর্ঘচ্ছেদ ও প্রস্থচ্ছেদ

একটি বলিত পৃষ্ঠের জ্যামিতি বেশ জটিল হতে পারে। তবে, এই প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা মূলতঃ একটি বিশেষ ধরনের বলির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই বিশেষ ধরনের বলিটিকে স্তম্ভাকার বলি (cylindri-

চিত্র - 36 ঃ অবিরূপিত এবং বিরূপিত তির্যক্ স্তরায়ণ। (ক) অবিরূপিত, (খ) সমসাময়িক বিরূপণে সৃষ্ট এবং (গ) ভূসংক্ষোভের ফলে বলিত তির্যক্ স্তরায়ণ।
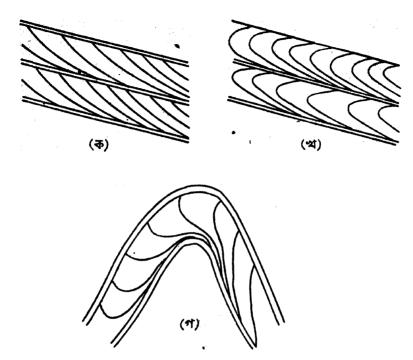
cal fold) বলা হয়। একটি সরলরেখাকে তার সমান্তরালে সরিয়ে যদি কোন বলিত পৃষ্ঠকে নির্দিষ্ট করা যায়, তাহলে সেই বলিটিকে **স্তম্ভাকার বলি** (cylindrical fold) বলা হয়। সংশ্লিষ্ট সরলরেখাটিকে **বলি-অক্ষ** (fold axis) বলা হয় (চিত্র 37)। বলি-অক্ষের সমান্তরালে স্তম্ভাকার বলির কোন বক্রতা থাকে না। বলি-অক্ষের সমকোণে স্তম্ভাকার বলির বক্রতা বৃহত্তম হয়।

একটি বলির অক্ষের সমকোণের ছেদতলকে (section) বলা হয় **প্রস্থচ্ছেদ** (transverse-section অথবা transverse profile)। বলি-অক্ষের সমান্তরালের ছেদতলকে **দীর্ঘচ্ছেদ** (longitudinal section) বলা হয়। গাঠনিক ভূবিদ্যায় সাধারণতঃ প্রস্থচ্ছেদ এবং দীর্ঘচ্ছেদের সাহায্যে বলিত পৃষ্ঠের জ্যামিতিক বর্ণনা করা হয়। তবে, স্তম্ভাকার বলিতে দীর্ঘচ্ছেদ

আঁকার প্রয়োজন হয় না, কারণ স্তম্ভাকার বলির অক্ষের সমান্তরালে বলিত পৃষ্ঠের জ্যামিতির কোন বৈচিত্র্য নেই।

একটি বলিত পৃষ্ঠের গাঠনিক উপাদান

যে বিভিন্ন জ্যামিতিক উপাদানের (বিন্দু, রেখা বা তল) সাহায্যে একটি বলির আকারের বর্ণনা করা হয় সেগুলিকে বলির গাঠনিক উপাদান বলা যেতে পারে।

প্রস্থচ্ছেদে সাধারণতঃ বলিত পৃষ্ঠের একটি তরঙ্গিত রূপ দেখা যায়। এই তরঙ্গিত রেখাটি কোথাও উত্তল হয় এবং কোথাও অবতল হয়। যে-বিন্দুগুলি এই উত্তল ও অবতল অংশগুলির সীমা নির্দেশ করে সেই বিন্দুগুলিকে **ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ বিন্দু** (points of inflection) বলা হয় (চিত্র 33)। (ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ বিন্দুর আরও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পরিশিষ্ট 'গ'-তে
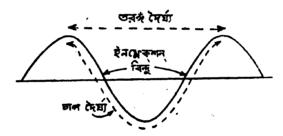
চিত্র - 33 : প্রস্থচ্ছেদে বলিত পৃষ্ঠের গাঠনিক উপাদান : ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ বিন্দু, তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং চাপদৈর্ঘ্য।

দেওয়া হয়েছে)। পর পর বিভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌-বিন্দুগুলিকে যোগ করলে যে-রেখাটি পাওয়া যায় সেটিকে **ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ রেখা** (line of inflection) বলা হয় (চিত্র 34)। পাশাপাশি দুটি ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ রেখার মধ্যবর্তী বক্রতলটি একটি বিশেষ বলির সীমা নির্দেশ করে (চিত্র 36)। প্রস্থচ্ছেদে একটি বলির সর্বোচ্চ বিন্দুটিকে **শীর্ষ-বিন্দু** (crest point) এবং সর্বনিম্ন বিন্দুটিকে **পাদ-বিন্দু** (trough point) বলে (চিত্র 35)। ক্রমিক প্রস্থচ্ছেদের শীর্ষবিন্দুগুলিকে যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেটিকে **শীর্ষরেখা** (crest line) বলে। অনুরূপভাবে পরপর প্রস্থচ্ছেদের পাদবিন্দুগুলিকে যোগ করে **পাদরেখা** (trough line) পাওয়া যায়। প্রস্থচ্ছেদে বলির যে-বিন্দুতে বক্রতা সবচেয়ে বেশী সেই বিন্দুকে গ্রন্থি-

চিত্র - ৩৪ঃ বলিত পৃষ্ঠের গাঠনিক উপাদানঃ গ্রন্থিরেখা, ইনফ্লেক্শন্‌রেখা ও মধ্যতল।
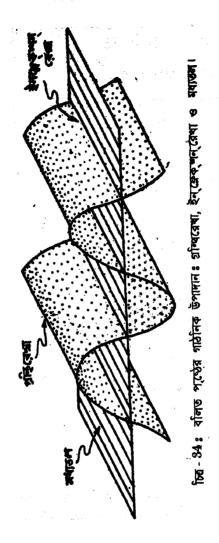
বিন্দু (hinge point) বলা হয় (চিত্র ৩5)। আবার ক্রমিক প্রস্থচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিবিন্দুগুলি যোগ করে বলির গ্রন্থি রেখা (hinge line) নির্দিষ্ট করা হয় (চিত্র ৩৪)। পাশাপাশি ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ রেখাগুলি যোগ ক'রে যে-তলটি পাওয়া যায় তাকে বলির মধ্যতল (median surface) বলা হয় (চিত্র ৩৪)। যে দুটি তলের সীমার মধ্যে তরঙ্গাকৃতি বলিত পৃষ্ঠটি ওঠা-নামা করে সেই পৃষ্ঠদুটিকে বলির আচ্ছাদন-তল (enveloping

চিত্র - ৩৫ঃ প্রস্থচ্ছেদে বলিত পৃষ্ঠের গাঠনিক উপাদানঃ শীর্ষবিন্দু, পাদবিন্দু, গ্রন্থিবিন্দু।
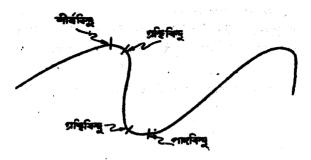
surface) বলা যেতে পারে (চিত্র ৩৬)। আচ্ছাদন-তলদুটির মধ্যে যে ব্যবধান থাকে সেই ব্যবধানের অর্ধাংশকে বলির **বিস্তার** (amplitude) বলা হয় (চিত্র ৩৬)।
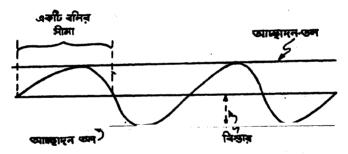
চিত্র - ৩৬ঃ বলির বিস্তার ও বলির আচ্ছাদন তল। পর পর দুটি ইনফ্লেক্শন্-বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশটি একটি বলির সীমা নির্দেশ করে।

প্রস্থচ্ছেদে বলির তরঙ্গিত আকৃতিগুলি পর্যাবৃত্ত (periodic) অথবা অপর্যাবৃত্ত (non-periodic) হতে পারে। পর্যাবৃত্ত বলিতে একটি বিশেষ পর্যায়ে তরঙ্গটির আকৃতির পুনরাবৃত্তি হয়। প্রস্থচ্ছেদে পর্যাবৃত্ত বলি-পৃষ্ঠের এক একটি পর্যায়ের দৈর্ঘ্যকে **তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য** (wave-length) বলা হয় (চিত্র ৩৩)। অর্থাৎ, একান্তর (alternate) ইনফ্লেক্শন্-বিন্দুগুলির মধ্যবর্তী (অথবা, একান্তর গ্রন্থিবিন্দুগুলির মধ্যবর্তী) দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়। একান্তর গ্রন্থিবিন্দুগুলির মধ্যবর্তী বক্ররেখাটির দৈর্ঘ্যকে **চাপ-দৈর্ঘ্য** (length of arc) আখ্যা দেওয়া হয় (চিত্র ৩৩)।

বলিত পৃষ্ঠের উপরিস্থিত গ্রন্থিরেখার নিকটবর্তী অংশকে সাধারণভাবে **গ্রন্থি-অঞ্চল** (hinge zone) বলা যেতে পারে। পাশাপাশি দুটি গ্রন্থি-অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশকে সাধারণভাবে **বলি-বাহু** (fold limb) বলা হয়।

এই অধ্যায়ের অন্যত্র স্তম্ভাকার বলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। **স্তম্ভাকার বলির** গ্রন্থিরেখাটি সরলরেখা হয়, এবং স্তম্ভাকার বলির পৃষ্ঠের ওপর যে কোন বিন্দুতে গ্রন্থিরেখার সমান্তরালে সরলরেখা আঁকা সম্ভব হয়। স্তম্ভাকার বলির গ্রন্থি-রেখার সমান্তরাল যে কোন রেখাকে **বলি-** বলা যায় (চিত্র 37)।
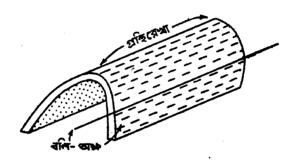
চিত্র - 37 : স্তম্ভাকার বলির অক্ষ গ্রন্থিরেখার সমান্তরাল।

প্রস্থচ্ছেদে একটি বলির পাশাপাশি দুটি ইনফ্লেকশন-বিন্দুতে স্পর্শক আঁকা হলে, স্পর্শক দুটির অন্তর্বর্তী কোণকে **আন্তর্বাহু কোণ** (interlimb angle) বলা হয় (চিত্র 38)। গ্রন্থিরেখাগামী যে-তলটি

চিত্র - 38 : আন্তর্বাহু কোণ নির্ণয়।
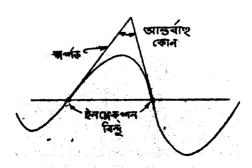
আন্তর্বাহু কোণকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে সেই তলটিকে সমবিভাজক তল বলা যেতে পারে (Whitten, 1966, পৃঃ 40)।

একটি বা একাধিক বলিত স্তরের গাঠনিক উপাদান

একটি বা একাধিক বলিত স্তরের বিভিন্ন তল বা পৃষ্ঠের ওপর সংশ্লিষ্ট ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌-রেখাগুলি যে-তলের ওপর অবস্থান করে তাকে **ইন্‌-ফ্লেক্‌শন্‌-তল** বলা হয় (চিত্র-39)। অনুরূপ ভাবে বলিত স্তরের বিভিন্ন পৃষ্ঠের সংশ্লিষ্ট শীর্ষরেখাগুলি যে-তলের ওপর অবস্থান করে তাকে

চিত্র-39: বলিত স্তরের গাঠনিক উপাদান: শীর্ষতল, পাদতল, অক্ষতল, ইন্‌ফ্লেক্‌শন্‌ তল।
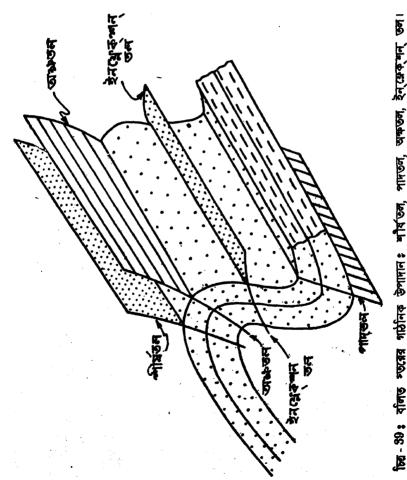
শীর্ষ-তল (crestal surface) এবং পাদ রেখাগুলি যে-তলের ওপর অবস্থান করে তা'কে **পাদ-তল** (trough surface) আখ্যা দেওয়া হয় (চিত্র 39)। বিভিন্ন স্তরের পরপর গ্রন্থিরেখাগুলি যে-তলের ওপর অবস্থান করে তা'কে **অক্ষতল** (axial surface) বলা হয় (চিত্র 39)। কোন একটি পৃষ্ঠ বা তলের ওপরে অক্ষতলের ছেদরেখাটিকে **অক্ষতলীয় ছেদ** (axial trace) বলা হয় (চিত্র 40)।
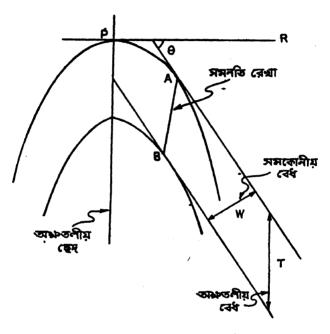
চিত্র - 40 : সমকোণীয় বেধ ও অক্ষতলীয় বেধ নির্ণয়।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটি বলিত স্তরের সর্বত্র স্তরটির স্থূলতা বা বেধ সমান নয়। সুতরাং বলিত স্তরের জ্যামিতিক বর্ণনার জন্যে স্তরটির স্থূলতার পরিবর্তনের বর্ণনাও প্রয়োজন। একটি স্তরের পৃষ্ঠদ্বয় যদি সমান্তরাল হয়, তাহলে একটি পৃষ্ঠের কোন বিন্দু থেকে অভিলম্ব টানলে সেই রেখাটি স্তরের অপর পৃষ্ঠেরও অভিলম্ব হবে। এক্ষেত্রে পৃষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবর্তী আভিলম্বিক দূরত্বকে স্তরটির স্থূলতা বা বেধ বলা হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে একটি স্তরের পৃষ্ঠদ্বয় সমান্তরাল নয় সেক্ষেত্রে স্থূলতা বা বেধ বলতে কি বোঝায়? এই রকম স্তরের একটি

পৃষ্ঠের ওপর অভিলম্ব টানা হলে সেটি অপর পৃষ্ঠের অভিলম্ব না হতেও পারে। এক্ষেত্রে যে কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে বলিত স্তরটির 'বেধ' (thickness) মাপা যেতে পারে। অক্ষতলের সমান্তরালে স্তরটির বেধকে অক্ষতলীয় বেধ বলা হয়। আবার বলিত স্তরের উভয় পৃষ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল দুটি স্পর্শক (tangent) টানা হলে এই স্পর্শক দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধানকে **সমকোণীয় বেধ** (orthogonal thickness) বলা যেতে পারে। 40-চিত্রে PQ রেখা একটি বলিত স্তরের অক্ষতলীয় ছেদ (axial trace)। PR-রেখাটি PQ-এর ওপরে লম্ব। এখন বলিত স্তরের A-বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকা হলে, স্পর্শকটি PR-এর সঙ্গে θ-কোণে অবস্থিত হয়। স্তরটির অপর পৃষ্ঠে স্পর্শকটির সঙ্গে সমান্তরালে অপর একটি স্পর্শক আঁকা হোল। স্পর্শকটি এই পৃষ্ঠটিকে B-বিন্দুতে স্পর্শ করে। সংশ্লিষ্ট θ-কোণটির জন্যে স্পর্শক দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান W এই স্তরের **সমকোণীয় বেধ** নির্দেশ করবে (চিত্র 40)। আবার, অক্ষতলীয় ছেদের সমান্তরালে একটি রেখা টানলে (চিত্র 40), সেই রেখাটি স্পর্শক দুটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে। সংশ্লিষ্ট θ-কোণটির জন্যে এই বিন্দু দুটির ব্যবধান T-কে **অক্ষতলীয় বেধ** বলা যেতে পারে (Ramsay, 1967)। 40নং চিত্রের PR-রেখার সঙ্গে θ-কোণে অবস্থিত স্পর্শক দুটি A এবং B বিন্দুতে বলিত স্তরের পৃষ্ঠদুটিকে স্পর্শ করেছে। এক্ষেত্রে AB-রেখাটিকে θ-কোণের **সমনতি রেখা** (dip isogon) বলা হয় (Elliott, 1965, 1968)।

পরিচ্ছেদ ৯

বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

শিলাস্তরে বলির আকৃতির অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। বলির আকৃতির যথাযথ বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ। তাই গাঠনিক ভূবিদ্যায় সাধারণতঃ বলির কোন বিশেষ গাঠনিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার দ্বারা অসদৃশ বলিগুলির পার্থক্য করা হয়। একটি বলির জ্যামিতিক বর্ণনার জন্য যেমন বলিত স্তরের আকৃতির বর্ণনার প্রয়োজন, তেমনি বলির বিভিন্ন জায়গায় বলির স্থূলতার পরিবর্তনের বর্ণনা করাও প্রয়োজন। এ-ছাড়া বলিটির গাঠনিক উপাদানগুলির (যেমন, অক্ষতল, অক্ষ ও বলি-বাহু) ভঙ্গীর (attitude) বর্ণনাও দরকার।

(ক) গাঠনিক উপাদানের ভঙ্গীর ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ

১। **এ্যান্টিফর্ম্ঃ** একটি শিলাস্তর বেঁকে গিয়ে একটি বলি সৃষ্টি করে। মনে করা যেতে পারে যেন গ্রন্থি-অঞ্চলে শিলা-স্তরটি একটি বাঁক নিচ্ছে। স্তরটি ওপরের দিকে বাঁক নিলে (চিত্র 41) বলিটিকে **এ্যান্টিফর্ম্** (antiform) বলা হয়। অর্থাৎ, ওপর থেকে দেখলে যে-বলিকে উত্তল বা convex দেখাবে তাকে এ্যান্টিফর্ম্ বলা হয়। যে এ্যান্টিফর্ম্-এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মোটামুটি সমান তাকে ডোম্ (dome) বলা হয়।

২। **সিন্ফর্ম্ঃ** যে-বলির বাঁক (fold-closure) নীচের দিকে তাকে সিন্ফর্ম্ (synform) বলা হয় (চিত্র 41)। অর্থাৎ, উপর থেকে দেখলে যে-বলিকে অবতল দেখাবে তাকে সিন্ফর্ম্ বলা হয়। যে সিন্ফর্ম্-এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মোটামুটি সমান তাকে বেসিন্ (basin) বলা হয়।

৩। **নিউট্রাল বলিঃ** যে-বলির স্তরটি ওপরে বা নীচে বাঁক না নিয়ে পাশের দিকে বাঁক নেয় তাকে নিউট্রাল বলি (neutral fold) বলা হয় (চিত্র 41)।

৪। **এ্যান্টিক্লাইন্ঃ** যে বলির ক্রোড়ে বা অবতল দিকে প্রাচীনতর শিলাস্তর থাকে তার নাম এ্যান্টিক্লাইন্ (anticline) যেক্ষেত্রে একটি অঞ্চলের শিলার স্তরবিন্যাস পুরোপুরি উলটে যায়নি সেই ক্ষেত্রে এ্যান্টিফর্ম্ মাত্রই এ্যান্টিক্লাইন্। স্তরবিন্যাস বিপর্যস্ত হলে সিন্ফর্মের ক্রোড়ের দিকে প্রাচীনতর শিলা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বলিটিকে

সিন্‌ফর্মীয় এ্যান্টিক্লাইন্‌ (synformal anticline) বলা যেতে পারে (চিত্র-41)।

৫। **সিন্‌ক্লাইন্‌ঃ** যে-বলির ক্রোড়ের দিকে নবীনতর শিলাস্তর থাকে তার নাম সিন্‌ক্লাইন্‌। স্তরবিন্যাস বিপর্যস্ত না হলে সিন্‌ক্লাইন্‌ মাত্রই সিন্‌ফর্মীয়। স্তরবিন্যাস বিপর্যস্ত হলে এ্যাণ্টিফর্ম্‌-এর ক্রোড়ের দিকে নবীনতর শিলা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বলিটিকে এ্যাণ্টিফর্মীয় সিন্‌-ক্লাইন্‌ (antiformal syncline) বলা চলে (চিত্র-41)।

চিত্র - 41 ঃ

বলির অক্ষ, অক্ষতল এবং বলি-বাহুর ভঙ্গীর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি দেওয়া যেতে পারেঃ—
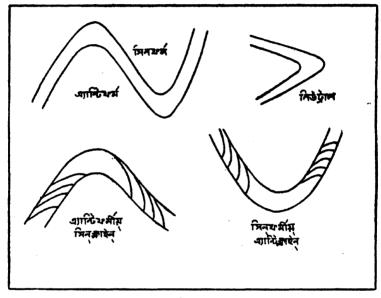
৬। **অনুভূমিক বলি** (horizontal fold)ঃ যে বলির অক্ষ অনুভূমিক (চিত্র 42-ক);

৭। **উল্লম্ব বলি** (vertical fold)ঃ যে বলির অক্ষ উল্লম্ব (চিত্র 42-খ);

৮। **অবনত বলি** (plunged fold)ঃ যে বলির অক্ষ অবনত (plunging), (চিত্র 42-গ ও চ);

৯। **শায়িত বলি** (recumbent fold)ঃ যে বলির অক্ষতলের নতি 10 ডিগ্রির কম (চিত্র 42-ঙ);

১০। **খাড়াই বলি** (upright fold)ঃ যে বলির অক্ষতল উল্লম্ব (চিত্র ৪২-ক, খ, গ);

১১। **আনত বলি** (inclined fold)ঃ যে বলির অক্ষতলের নতি 10 ডিগ্রি থেকে ৪০ ডিগ্রির মধ্যে (চিত্র ৪২-ঘ, চ);
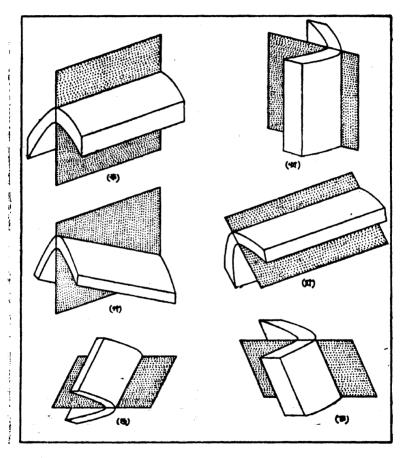
চিত্র - ৪২ঃ (ক) খাড়াই অনুভূমিক বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল উল্লম্ব এবং বলি-অক্ষ অনুভূমিক); (খ) উল্লম্ব বলি; (গ) খাড়াই অবনত বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল খাড়াই এবং বলি-অক্ষ অবনত); (ঘ) আনত অনুভূমিক বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল নত এবং বলি-অক্ষ অনুভূমিক); (ঙ) শায়িত বলি (অক্ষতল অনুভূমিক বা প্রায় অনুভূমিক); (চ) প্রণত বলি (অক্ষতলের নতির দিকে বলি-অক্ষটি অবনত)।

১২। **প্রণত বলি** (reclined fold)ঃ যে আনত বলির অক্ষতলের উপরে বলি অক্ষের পিচ্ 80 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রির মধ্যে (চিত্র 42-চ);

১৩। **বিপর্যস্ত বলি** (overturned fold)ঃ যে আনত বলির দু'টি বাহুই একদিকে নত (চিত্র 43)।

চিত্র - 43ঃ বিপর্যস্ত বলির স্বাভাবিক ও বিপর্যস্ত বাহু।

(খ) বলিত পৃষ্ঠের আকৃতির বর্ণনার ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগঃ—

১। **স্তম্ভাকার বলি** (cylindrical fold)ঃ যে বলির পৃষ্ঠগুলিতে যে কোন জায়গায় গ্রন্থিরেখার সমান্তরালে সরলরেখা টানা যায় তাকে স্তম্ভাকার বলি বলা হয়।

২। **অস্তম্ভাকার বলি** (non-cylindrical fold)ঃ যে বলির পৃষ্ঠে সব জায়গায় গ্রন্থিরেখার সমান্তরালে সরলরেখা টানা যায় না তাকে অস্তম্ভাকার বলি বলা হয়।

৩। **শঙ্কু-আকার বলি** (conical fold)ঃ যে অস্তম্ভাকার বলির আকার একটি শঙ্কু বা cone-এর অংশের মতো তাকে শঙ্কু-আকার বলি বলা হয়।

৪। স্তম্ভাকার বা অস্তম্ভাকার বলির অক্ষতল সমতলীয় হতে পারে অথবা বক্র হতে পারে। এই ভিত্তিতে (Turner and Weiss, 1963) **স্তম্ভাকার সমতলীয়** (cylindrical plane), **অস্তম্ভাকার** (non-cylindrical plane), **অসমতলীয় স্তম্ভাকার** (non-plane cylindrical) এবং **অসমতলীয় অস্তম্ভাকার** (non-plane non-cylindrical) এই চার ধরনের বলির বিভাগ করা যেতে পারে (চিত্র 44)।

৫। একটি বলির দুটি বাহুর মধ্যবর্তী কোণ যত ছোট হবে বলিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় বলিটির উচ্চতা বা বিস্তার (amplitude) তত বেশি হবে—অর্থাৎ বলিটিকে তত বেশি সরু ও লম্বা দেখাবে। একটি বলির আন্তর্বাহু কোণ (interlimb angle) কত ছোট সেই ভিত্তিতে
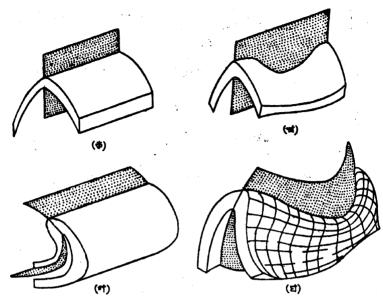
চিত্র - 44 ঃ (ক) স্তম্ভাকার সমতলীয় বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল সমতলীয় এবং গ্রন্থিরেখা ঋজু); (খ) অস্তম্ভাকার সমতলীয় বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল সমতলীয় কিন্তু গ্রন্থিরেখা বক্র); (গ) স্তম্ভাকার অসমতলীয় বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল বক্র কিন্তু গ্রন্থিরেখা ঋজু); এবং (ঘ) অস্তম্ভাকার অসমতলীয় বলি (অর্থাৎ, অক্ষতল এবং গ্রন্থিরেখা উভয়ই বক্র)।

বলিটিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগে ফেলা যেতে পারে (Fleuty, 1964)।

মৃদু বলি (gentle fold)	আন্তর্বাহু	কোণ	180—120	ডিগ্রি
মুক্ত বলি (open fold)	,,	,,	120— 70	,,
বদ্ধ বলি (close fold)	,,	,,	70— 30	,,
সঙ্কীর্ণ বলি (tight fold)	,,	,,	30— 0	,,
সমনত বলি অথবা সমভঙ্গ (isoclinal fold)	,,	,,	0	,,
ছত্রাকার বলি (Fan fold বা mushroom fold)	,,	,,	ঋণাত্মক	

45-ক চিত্রে সমনত বলি এবং 45-খ চিত্রে ছত্রাকার বলি দেখানো হয়েছে। প্লেট্-3-এ সমনত বলির উন্মেদ দেখানো হয়েছে।

৬। **প্রতিসম বলি** (symmetric fold) ঃ প্রস্থচ্ছেদে যে বলির অক্ষ-তলের দুপাশে বলির আকৃতি প্রতিসম (symmetrical) হয়, অর্থাৎ একটি
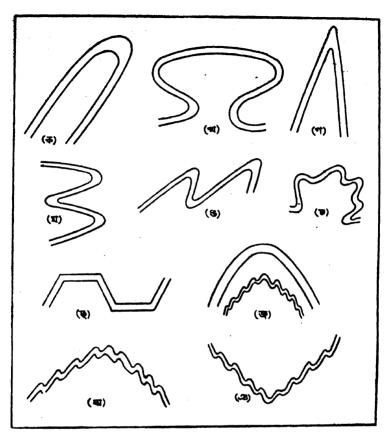
চিত্র - 45 ঃ (ক) সমনত বলি, (খ) ছত্রাকার বলি, (গ) তীক্ষ্ণ বলি, (ঘ) প্রতিসম বলি, (ঙ) অপ্রতিসম বলি, (চ) বহুমুখী বলি, (ছ) যুগ্ম বলি, (জ) বিসদৃশ বলি, (ঝ) এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্, (ঞ) সিন্-ক্লাইনোরিয়াম্।

অপরটির প্রতিবিম্বের সদৃশ হয়, তাকে প্রতিসম বলি বলে, প্রতিসম বলির দুটি বাহু সমান দৈর্ঘ্যের হয় (চিত্র 45-ঘ)।

৭। **অপ্রতিসম বলি** (asymmetric fold) ঃ প্রস্থচ্ছেদে যে বলির অক্ষতলের দুপাশে বলির আকৃতি প্রতিসম হয় না তাকে অপ্রতিসম বলি বলা হয়। অপ্রতিসম বলির উভয় বাহুর দৈর্ঘ্য অসমান হয় (চিত্র 45-ঙ)।

৮। **তীক্ষ্ণ বলি** (chevron fold বা zigzag fold বা accordion fold) ঃ এধরনের বলির গ্রন্থি (hinge) তীক্ষ্ণ হয়, অর্থাৎ বলি বাহুর

তুলনায় গ্রন্থি অঞ্চল (hinge zone) খুব ছোট হয় (চিত্র 45-গ)। সাধারণতঃ তীক্ষ্ন বলির বাহুদ্বয় ঋজু হয়।

৯। **বহুমুখী বা বহুনত বলি** (polyclinal fold)ঃ যখন কতকগুলি সন্নিহিত বলির সমষ্টির আকার এমন হয় যে তাদের অক্ষতলগুলি বিভিন্ন ভঙ্গীতে থাকে (চিত্র 45-চ), তখন সেই বলিসমূহকে বহুমুখী বা বহুনত বলি বলা হয়।

১০। **যুগ্ম বলি বা কনজুগেট্ বলি** (conjugate fold)ঃ যুগ্মবলি বা কনজুগেট্ বলি বহুমুখী বলির একটি বিশেষ রূপ। যুগ্মবলির দুটি গ্রন্থিরেখা থাকে (চিত্র 45-ছ)। সাধারণতঃ যুগ্ম-বলির গ্রন্থি তীক্ষ্ন হয় এবং অন্য অংশগুলি ঋজু হয়। দুটি গ্রন্থিযুক্ত কোন বলির গ্রন্থিগুলি তীক্ষ্ন না হলে সেটিকে বক্স্ ফোল্ড্ বলা যেতে পারে।

১১। **বিসদৃশ বলি** (disharmonic fold)ঃ বিসদৃশ বলিতে বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন আকারের অথবা বিভিন্ন পরিমাপের বলির সৃষ্টি করে (চিত্র 45-জ)। অর্থাৎ বিসদৃশ বলিতে এ্যান্টিফর্ম্-এর তলায় এ্যান্টিফর্মীয় বা সিন্ফর্ম-এর তলায় সিন্ফর্মীয় বলি না থাকতেও পারে। সাধারণতঃ যেখানে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন স্থূলতার শিলাস্তর একসাথে বলিত হয় সেখানে বিসদৃশ বলি পাওয়া যায়।

১২। বলিত অঞ্চলের শিলাস্তরে সাধারণতঃ ছোটবড় বিভিন্ন পরি-মাপের বলি দেখা যায়। এই বিভিন্ন মাপের বলি একই শিলাস্তরেও পাওয়া যেতে পারে। একটি এ্যান্টিফর্মীয় বলির ওপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বলি থাকলে, সেই সমগ্র গঠনটিকে **এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্** বলা হয় (চিত্র 45-ঝ)। অনুরূপভাবে একটি সিন্ফর্মীয় বলির ওপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বলিসমষ্টি থাকলে সমগ্র গঠনটিকে **সিন্ক্লাইনোরিয়াম্** বলে (চিত্র 45-ঞ)। এক একটি এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্ ও সিন্ক্লাইনোরিয়াম্ আবার ক্ষুদ্রতর পরিমাপের এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্ ও সিন্ক্লাইনোরিয়াম্-এর সমন্বয়েও গঠিত হতে পারে।

(গ) বলিতস্তরের বক্রতা ও স্থূলতার পরিবর্তনের ভিত্তিতে বলির শ্রেণী-বিভাগ

অক্ষতলের একপাশে, বলিতস্তরের উভয় পৃষ্ঠে অবস্থিত, যে দুটি বিন্দুতে স্তরটির নতির মান সমান, সে দুটি বিন্দুর যোজক রেখাটিকে একটি সমনতি-রেখা (dip isogon) বলা হয়। 40-চিত্রে AB একটি

সমনতি রেখা। বলিতস্তরের সমনতি রেখাগুলির বিন্যাস (অর্থাৎ রেখাগুলির পারস্পরিক জ্যামিতিক সম্পর্ক) নির্ভর করেঃ

(ক) স্তরটির উভয় পৃষ্ঠের বক্রতার ওপর এবং (খ) গ্রন্থি থেকে বাহু পর্যন্ত স্থূলতার পরিবর্তনের ওপর। এই দুই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে র‍্যাম্‌সে—প্রণীত বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ রচিত হয়েছে (Ramsay, 1967) :—
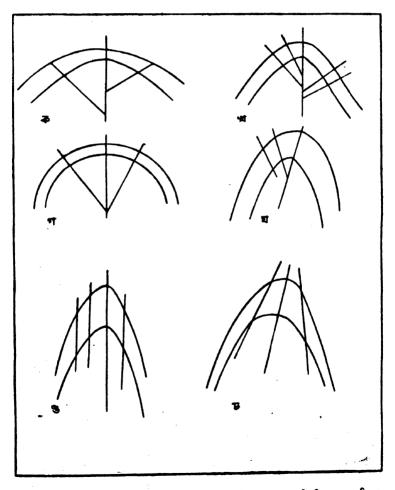
চিত্র - 46 : সমকোণীয় বেধ ও বক্রতার পরিবর্তনের ভিত্তিতে বলির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ।

প্রথম শ্রেণী (Class I) ঃ বলিতস্তরের অবতল পৃষ্ঠের বক্রতা উত্তল পৃষ্ঠের বক্রতার থেকে বেশি। এক্ষেত্রে সমনতি রেখাগুলি ক্রোড়ের দিকে (অর্থাৎ অবতল দিকে) পরস্পরকে ছেদ করে।

A. স্তরের সমকোণীয় বেধ বলি-গ্রন্থিতে সব থেকে কম (চিত্র 46-ক)। এধরনের বলিকে সুপ্রাটেনুয়াস্ ফোল্ড্ (supratenuous fold) অথবা ক্ষীণশীর্ষ বলি বলা হয়।

B. বলিস্তরের সমকোণীয় বেধ সর্বত্র সমান। এধরনের বলিকে **সমান্তরাল বলি** (parallel fold) বলা হয় (চিত্র 46-খ এবং গ)। যদি প্রস্থচ্ছেদে বলিতস্তরটির পৃষ্ঠদ্বয়ের আকার এককেন্দ্রীয় বৃত্তের চাপের মতো হয় তাহলে, সঠিক অর্থে, বলিটিকে **এককেন্দ্রীয়** (concentric) বলা হয় (চিত্র 46-গ)। তবে, সাধারণ ব্যবহারে সমান্তরাল বলি ও এককেন্দ্রীয় বলি অনেক সময় সমার্থক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

C. বলিতস্তরের সমকোণীয় বেধ বলি-গ্রন্থিতে সব থেকে বেশি (চিত্র 46-ঘ)।

দ্বিতীয় শ্রেণী (Class II) ঃ বলিতস্তরের উভয় পৃষ্ঠের বক্রতা সমান। এক্ষেত্রে সমনতি রেখাগুলি সমান্তরাল। এধরনের বলিকে **সমরূপী বলি** (similar fold) বলা হয়, কারণ বলিতস্তরটির উভয় পৃষ্ঠের আকার হুবহু এক। সমরূপী বলির অক্ষতলীয় বেধ সর্বত্র সমান (চিত্র 46-ঙ)।

তৃতীয় শ্রেণী (Class III) ঃ বলিতস্তরের অবতল পৃষ্ঠের বক্রতা উত্তল পৃষ্ঠের বক্রতার থেকে কম। এক্ষেত্রে সমনতি রেখাগুলি বহির্দিকে (অর্থাৎ উত্তল দিকে) পরস্পরকে ছেদ করে (চিত্র 46-চ)।

(বলির জ্যামিতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার জন্যে Fleuty, 1964; Rast, (1964; Whitten, 1966; Wilson, 1967; Ramsay, 1967; Stabler, 1968; Ghosh, 1969 এবং Hudleston, 1973, এবং Turner and Weiss, 1963 দ্রষ্টব্য।)

পরিচ্ছেদ ১০

মানচিত্র, প্রস্থচ্ছেদ ও দীর্ঘচ্ছেদে বলির বর্ণনা

প্রথমে একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গীর বলির অভ্যন্তরে যে-কোন ভঙ্গীতে অবস্থিত একটি ছেদতল (plane of section) কল্পনা করা যাক। যদি বলিটি স্তম্ভাকার (cylindrical) হয়, তাহলে বলি-অক্ষের সমান্তরাল যে-কোন ছেদতলে বলিতপৃষ্ঠের ছেদ রেখাগুলি (lines of intersection) সরলরেখা হবে (কারণ স্তম্ভাকার বলির অক্ষের সমান্তরাল সব রেখাই সরলরেখা (চিত্র 37)।

ছেদতলটি বলি অক্ষের সমান্তরাল না হলে ছেদরেখাটি বক্র হবে। এখন ধরা যাক্ ছেদতলটি একটি অনুভূমিক সমতল (horizontal plane)। এক্ষেত্রে একমাত্র অনুভূমিক বলির ছেদরেখাগুলি (trace) সরলরেখা হবে (চিত্র 47, ক, খ); এবং অবনত বলির ছেদরেখাগুলি বক্র হবে (চিত্র 47, গ, চ)। অর্থাৎ, সমভূমিতে একটি বলিতস্তরের উদ্ভেদ্ (outcrop) দু ধরনের হতে পারেঃ

১। বলি-অক্ষ অনুভূমিক হলে বলিতস্তরের উদ্ভেদ্ ঋজু হবে,

২। বলি-অক্ষ অবনত হলে বলিতস্তরের উদ্ভেদ্ বাঁকা হবে।

অনুভূমিক বলির উভয় বাহুর স্ট্রাইক্ সমান্তরাল হয় (চিত্র 47, ক, খ)। অবনত বলির উভয় বাহুর স্ট্রাইক্ অভিসারী (convergent) হয় (চিত্র 47-গ)।

কেবলমাত্র শিলাস্তরের মানচিত্র থেকে বলির জ্যামিতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। গাঠনিক মানচিত্রে শিলাস্তরের কালানুক্রম (time-sequence) ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় স্তরের নতির দিক্ ও মান নির্দিষ্ট করাও প্রয়োজন। বলিত অঞ্চলের মানচিত্রে স্তরগুলির প্রতিসম পুনরাবৃত্তি (symmetrical repetition) হয় (চিত্র 47)। যে স্তরের উদ্ভেদের দু'পাশে প্রতিসাম্য (symmetry) লক্ষিত হয় সেটি বলির ক্রোড়ে (core) অবস্থিত (চিত্র 47, ক, গ)। 47-ক চিত্রে 1-নং স্তরটি বলির ক্রোড়ে অবস্থিত। অবনত বলির বক্র উদ্ভেদের (প্লেট্—1) যে জায়গায় বক্রতা সবচেয়ে বেশি (চিত্র 47-গ) সেটিকে বলির মোড় বলা হয় (ইংরাজীতে বলা হয় nose)। মানচিত্রে বিভিন্ন স্তরের মোড়গুলিকে যোগ করে বলির অক্ষতলীয় ছেদ (axial trace) পাওয়া যায়। 47-গ চিত্রে AB রেখা একটি অক্ষতলীয় ছেদ।
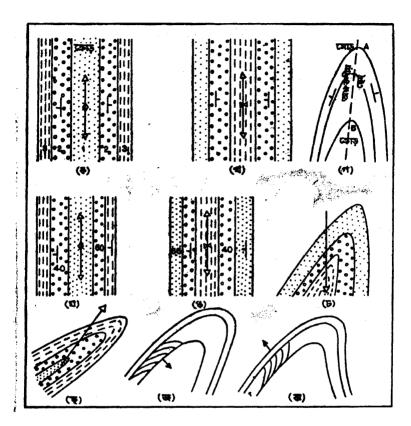
চিত্র - 47 ঃ সমভূমির মানচিত্রে বলির বর্ণনা। (ক) অনুভূমিক এ্যান্টি-ফর্ম্, (খ) অনুভূমিক সিন্‌ফর্ম্, (গ) অবনত বলির ক্রোড়, মোড় ও অক্ষতলীয় ছেদ, (ঘ) অনুভূমিক বিপর্যস্ত এ্যান্টিফর্ম্, (ঙ) অনুভূমিক বিপর্যস্ত সিন্‌ফর্ম্, (চ) অবনত সিন্‌ফর্ম্; তীরচিহ্নটি বলি-অক্ষের প্লাঞ্জ্-এর দিক্ নির্দেশ করছে, (ছ) অবনত এ্যান্টিফর্ম্, (জ) অবনত সিন্‌ক্লাইন্; তীরচিহ্ন স্তরের নবীনত্বের দিক্ নির্দেশ করছে, (ঝ) অবনত এ্যান্টিক্লাইন্ (বলির ক্রোড়ে প্রাচীনতর স্তর)।

এখন দেখা যাক্, গাঠনিক উপাদানের ভঙ্গীর ভিত্তিতে যে বিভিন্ন বলির বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বলিগুলিকে কিভাবে গাঠনিক মানচিত্রের মাধ্যমে চেনা যেতে পারে।

সমভূমিতে এ্যান্টিফর্ম্-এর মানচিত্রে অক্ষতলীয় ছেদের দু'পাশে অথবা ক্রোড়ের দু'পাশে শিলাস্তরের নতির দিক্ বহির্মুখী (অর্থাৎ ক্রোড়ের

বিপরীত দিকে) থাকে (চিত্র 47-ক)। কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। অর্থাৎ, কোন কোন এ্যান্টিফর্ম্-এর মানচিত্রে ক্রোড়ের দু'পাশের স্তরের নতিই এক দিকে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যে পাশে নতির মান ক্ষুদ্রতর সেই পাশে নতির দিক্ বহির্মুখী হবে। কিন্তু যে পাশে নতির মান বৃহত্তর সেই পাশে নতির দিক্ ক্রোড়াভিমুখী হবে (চিত্র 47-ঘ)।

সমভূমিতে সিন্‌ফর্ম-এর মানচিত্রে অক্ষতলীয় ছেদের দু'পাশে স্তরের নতি সাধারণতঃ ক্রোড়াভিমুখী হয় (চিত্র 47-খ)। কোন কোন সিন্‌ফর্ম-এ দু'পাশের নতি একদিকে হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বাহুতে নতির মান ক্ষুদ্রতর সেই বাহুতে নতির দিক্ ক্রোড়াভিমুখী এবং যে বাহুতে নতির মান বৃহত্তর সেই বাহুতে নতির দিক বহির্মুখী হয় (চিত্র 47-ঙ)।

আগেই বলা হয়েছে যে সমভূমিতে অবনত বলির উদ্ভেদ্ বক্র হবে। সমভূমিতে অবনত বলির মানচিত্রে বলি-অক্ষের অবনমনের দিক্‌নির্দেশ দেওয়া থাকলে (চিত্র 47, চ এবং ছ) নীচের সূত্র দুটি থেকে এ্যান্টিফর্ম্ ও সিন্‌ফর্ম্-এর পার্থক্য করা সম্ভব হয়ঃ

১। **বলি অক্ষের অবনমনের দিক্ উদ্ভেদের বাঁকের** (closure) **উত্তল দিকে থাকলে** (চিত্র 47-ছ) **বলিটি এ্যান্টিফর্মীয়**, এবং

২। **বলি অক্ষের অবনমনের দিক্ উদ্ভেদের বাঁকের অবতল দিকে থাকলে** (চিত্র 47-চ) **বলিটি সিন্‌ফর্মীয় হবে।**

এছাড়া বলি অক্ষের ট্রেন্ড্ অক্ষতলীয় ছেদের সমকোণে থাকলে বলিটি নিউট্রাল্ হবে।

বলিটি অনুভূমিক হোক বা অবনত হোক, বলির ক্রোড়ে প্রাচীনতর বা নবীনতর শিলার সংস্থাপন লক্ষ্য করে মানচিত্রে এ্যান্টিক্লাইন্ ও সিন্‌ক্লাইন্-এর পার্থক্য করা সম্ভব (চিত্র 47-জ এবং ঝ)। মানচিত্রে বলির সর্বত্র (অর্থাৎ বলির বাহুতে ও মোড়ে) স্তরের নতির মান 90 ডিগ্রি হলে বলিটি উল্লম্ব হবে।

মানচিত্রে অক্ষতলীয় ছেদ ও বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্-এর সম্পর্কটি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় (চিত্র 48)। কি ধরনের বলির মানচিত্রে অক্ষতলীয় ছেদ (axial trace) ও বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্ সমান্তরাল হবে? বলা বাহুল্য অনুভূমিক বলিতে অক্ষতলীয় ছেদ বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্-এর সমান্তরাল (চিত্র 47-ক)। অবনত বলিতে অক্ষতল যদি উল্লম্ব হয় একমাত্র তাহলেই অক্ষতলীয় ছেদ ও অক্ষের ট্রেন্ড্ সমান্তরাল হবে। অর্থাৎ সমভূমির মানচিত্রে বলিত স্তর বক্র দেখা গেলে এবং অক্ষের ট্রেন্ড্ অক্ষতলীয় ছেদের সমান্তরাল হলে বলিটিকে খাড়াই বলি (upright fold) হিসাবে
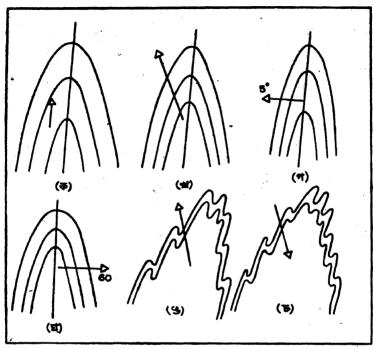
চিত্র - ৪৪ ঃ (ক) অক্ষতল উল্লম্ব হলে বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্ এবং অক্ষতলীয় ছেদরেখা সমান্তরাল হবে। (খ) আনত বলির মানচিত্রে বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্ অক্ষতলীয় ছেদরেখার সমান্তরাল হবে না। (গ) অবনত এবং শায়িত বলি। (ঘ) প্রণত বলির মানচিত্রে বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্ অক্ষতলীয় ছেদরেখার সাথে মোটামুটিভাবে সমকোণে থাকবে; অক্ষতলের নতি 10 ডিগ্রির চেয়ে বেশী হবে। (ঙ) সিন্‌ক্লাইনোরিয়াম্-এ বলি-অক্ষের প্লাঞ্জ্ উল্ভেদের উত্তল দিকে থাকবে। (চ) এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্-এর মানচিত্রে বলি-অক্ষের প্লাঞ্জ্ উল্ভেদের অবতল দিকে থাকবে।

চেনা যাবে (চিত্র ৪৪-ক)। অনুরূপভাবে সমভূমির মানচিত্রে অক্ষের ট্রেন্ড্ ও অক্ষতলীয় ছেদ সমান্তরাল না হলে বলিটিকে আনত বলি (inclined fold) হিসাবে চেনা যায়, কারণ অক্ষতল উল্লম্ব না থাকলে অবনত বলি-মাত্রেই অক্ষতলীয় ছেদ ও অক্ষীয় ট্রেন্ড্ আলাদা হবে (চিত্র ৪৪-খ)। অক্ষীয় ট্রেন্ড্ যদি অক্ষতলীয় ছেদের সাথে মোটামুটি ভাবে সমকোণে থাকে তাহলে বলিটি প্রণত বলি বা শায়িত বলি হতে পারে। যদি অক্ষের অবনমনের মান খুব কম হয় (মোটামুটি ভাবে 10 ডিগ্রির কম) তাহলে বলিটি শায়িত বলিরূপে চেনা যায় (চিত্র ৪৪-গ)। যদি অবনমনের মান

প্লেট্‌—3 : সমভূমির উল্লেখে অবনত এ্যান্টিফর্মীয় সমনত বলি (plunging antiformal isoclinal fold)। বলির দুটি বাহুই চিত্রের ডান দিকে ৪০ ডিগ্রিতে নত। বলি-অক্ষের প্লাঞ্জ্‌-এর দিক্‌ চিত্রের ওপর দিকে।
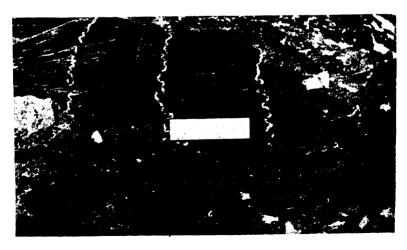
প্লেট্‌—5 : নরওয়ে'র হোম্মেলভিক্‌ অঞ্চলে ফিলাইট্‌-এর অক্ষতলীয় সম্ভেদের সমকোণে কোয়ার্ট্‌জ্‌ ভেইন্‌-এ বাক্‌লিং ফোল্ড্‌। লক্ষণীয় যে ভেইন্‌-এর স্থূলতা
... and Ghosh, 1968 দ্রষ্টব্য)

বেশি হয় (10 ডিগ্রির বেশি ও 90 ডিগ্রির কম) তাহলে বলিটি প্রণত বলি (reclined fold) হিসাবে চেনা যাবে (চিত্র 48-ঘ)। বলা বাহুল্য প্রণত বলি আনত বলির একটি বিশেষ রূপ।

মানচিত্রে একটি বলির উভয় বাহুর নতিই ক্রোড়াভিমুখী না হলে বা উভয় বাহুর নতিই বহির্মুখী না হলে বলিটিকে বিপর্যস্ত বলি (overturned fold) রূপে চেনা যায়। যে বাহুর নতির মান অধিকতর সাধারণতঃ সেটিকে বিপর্যস্ত বাহু (overturned limb) বলা হয়। অপর বাহুটিকে স্বাভাবিক বাহু (normal limb) বলা হয়। সমনত বলিতে উভয় বাহুর নতির মান সমান (প্লেট্ 3)। সেক্ষেত্রে এভাবে বিপর্যস্ত ও স্বাভাবিক বাহুর প্রভেদ নির্ণয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে বলিটি এ্যান্টিফর্মীয় না সিন্‌ফর্মীয় জানা দরকার। বিপর্যস্ত অ্যান্টিফর্মীয় বলির যে বাহুর নতি ক্রোড়াভিমুখী সেটিই বিপর্যস্ত বাহু। বলিটি সিন্‌ফর্মীয় হলে যে বাহুর নতি বহির্মুখী সেটি বিপর্যস্ত বাহুরূপে চেনা যাবে।

পাললিক শিলার কোন কোন পাললিক গঠন থেকে শিলাস্তরের নবীনত্বের দিক্ (direction of younging) নির্ণয় করা সম্ভব (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ এই গঠনগুলি থেকে শিলাস্তরের কোন্ দিক্‌টি নবীনতর সেটা বোঝা যায়। গাঠনিক মানচিত্রে শিলার কালানুক্রম দেওয়া থাকলে অথবা শিলার নবীনত্বের দিক্ দেওয়া থাকলে এ্যান্টিক্লাইন্ ও সিন্‌ক্লাইন্ চেনা সম্ভব। যেখানে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে শিলাস্তর বিপর্যস্ত হয়নি (অর্থাৎ, শিলাস্তর পুরোপুরি উল্টে যায়নি) সে অঞ্চলে মানচিত্রে এ্যান্টিক্লাইন্ চেনা গেলে সেটিকে এ্যান্টিফর্ম্‌ও বলা যায়। সুতরাং বলা বাহুল্য যে এই ক্ষেত্রে সমভূমির মানচিত্রে বলির বাঁক (fold closure) দেখা গেলে এবং বলির ক্রোড়ে প্রাচীনতর শিলা থাকলে বলি-অক্ষের অবনমনের দিক বাঁকের উত্তল দিকে হবে।

অবনত বলির মানচিত্রে যদি দেখা যায় যে একটি বলির বাঁক অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর বাঁকের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে (চিত্র 48-ঙ এবং চ), তাহলে বলিটিকে এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্ অথবা সিন্‌ক্লাইনোরিয়াম্ রূপে চেনা যায়। মূল বা বৃহত্তর আকারের বাঁকটির উত্তলদিকে বলি-অক্ষের প্রাঞ্জ্ থাকলে সমগ্র গঠনটি এ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম্ হবে (চিত্র 48-ঙ)। বৃহত্তর বাঁকের অবতল দিকে বলি-অক্ষের প্রাঞ্জ্ থাকলে গঠনটি সিন্‌ক্লাইনোরিয়াম্ হবে (চিত্র 48-চ)।

স্তম্ভাকার (cylindrical) বলির অক্ষের ভঙ্গী সর্বত্র সমান থাকে।

অস্তম্ভাকার বলির অক্ষের ভঙ্গী সবজায়গায় সমান হয় না। অস্তম্ভাকার বলি সাধারণতঃ দু'ধরনের হয়ঃ (১) শঙ্কু-আকার বলি (conical fold) (২) বক্র গ্রন্থিরেখাযুক্ত বলি। শঙ্কু-আকার এ্যান্টিফর্মীয় বলির মানচিত্রে বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্গুলি বলির বাঁকের দিকে অভিসারী (convergent) হবে (চিত্র 49)। আবার শঙ্কু-আকার সিন্ফর্মীয় বলির মানচিত্রে অক্ষের ট্রেন্ডগুলি বলির ক্রোড়ের দিকে অভিসারী হবে।
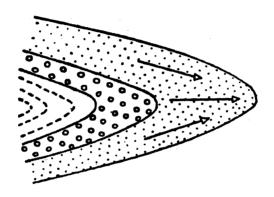
চিত্র - 49ঃ শঙ্কু-আকার বলির মানচিত্রে বলি-অক্ষগুলির ট্রেন্ড্ একদিকে অভিসারী হয়।

গ্রন্থিরেখা বক্র হলে অবশ্যই বলি-অক্ষের ট্রেন্ড্ অথবা প্লাঞ্জ্ কিংবা উভয়েই এক এক জায়গায় এক এক রকম হবে। এর ফলে মানচিত্রে বলির উদ্ভেদেরও বৈচিত্র্য আসবে। মানচিত্রে গ্রন্থিরেখার ট্রেন্ড্-এর বক্রতা দেখা গেলে এই বাঁককে বলি-অক্ষের আর্কুয়েশন্ (arcuation of fold axis) বলা হয় (চিত্র 50-ক)। বলা বাহুল্য, আর্কুয়েশন্ থাকলেই বলিটির অক্ষতলীয় ছেদ (axial trace) বক্র হবে। তবে সকল ক্ষেত্রে অক্ষতলীয় ছেদ বক্র হলেই বলি-অক্ষ বক্র হবে এমন নাও হতে পারে (চিত্র 50-খ)। (অক্ষতলীয় ছেদের বক্রতা অক্ষতলের বক্রতার ফলে দেখা যায়। অক্ষতল বক্র হলেও একটি বলির অক্ষের ভঙ্গী সব জায়গায় সমান থাকতে পারে। এ ধরনের বলিকে অসমতলীয় স্তম্ভাকার বলি বলা হয়।)

বলি-অক্ষের প্লাঞ্জ্-এর পরিবর্তন হলে মানচিত্রে বলির উদ্ভেদের পরিবর্তন দেখা যায়। 50-গ চিত্রে একটি এ্যান্টিফর্মীয় অবনত বলির প্লাঞ্জ্ ক্রমশঃ কমে গিয়েছে। সেইখানে বলিটির উদ্ভেদের আকৃতিরও
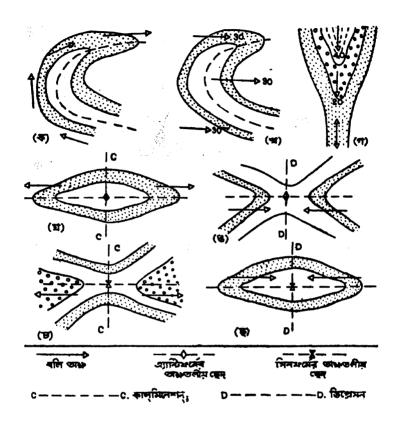
চিত্র - 50 ঃ সমভূমিতে বলির মানচিত্রে বলি-অক্ষের ভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভেদের বিভিন্ন আকৃতি।

পরিবর্তন হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে এ্যান্টিফর্মীয় বলির উদ্ভেদে বলি-অক্ষের অবনমনের দিক্ উদ্ভেদের বাঁকের উত্তল দিকে থাকবে। একইভাবে সিন্‌ফর্মীয় বলির উদ্ভেদে বলি-অক্ষের অবনমন বা প্লাঞ্জ্ বলির বাঁকের অবতল দিকে থাকে। সুতরাং বলি-অক্ষের প্লাঞ্জ্-এর দিক্‌নির্দেশ মোটামুটভাবে উল্টে গেলে উদ্ভেদে বলির বাঁকও উল্টোদিকে ঘুরে যাবে (চিত্র 50-ঘ)।

মানচিত্রে যে অঞ্চলের দু'ধারের বলি-অক্ষগুলির প্লাঞ্জ্ অঞ্চলটি থেকে বহির্মুখী হয়, সেই অঞ্চলকে কালমিনেশন্ অঞ্চল (culmination zone) বলা হয় (চিত্র 50-ঘ এবং চ)। বলি-অক্ষের কালমিনেশন্ থেকে বোঝা যায় যে অস্তম্ভাকার বলিগুলির গ্রন্থিরেখা উত্তল (convex upward) বা
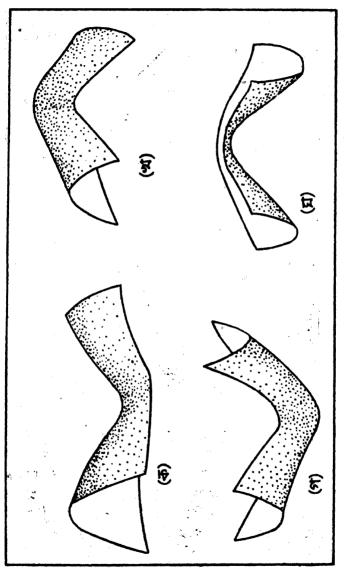
চিত্র-51 : (ক) এ্যান্টিফর্ম্-এর ডিপ্রেশন্, (খ) এ্যান্টিফর্ম্-এর কালমিনেশন্, (গ) সিন্‌ফর্ম্-এর ডিপ্রেশন্, এবং (ঘ) সিন্‌ফর্ম্-এর কালমিনেশন্।

চিত্র-52: উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদের ও দীর্ঘচ্ছেদের সাহায্যে ডিপ্রেশন্-সহ এন্টিফর্ম্-এর মানচিত্রের বর্ণনা।
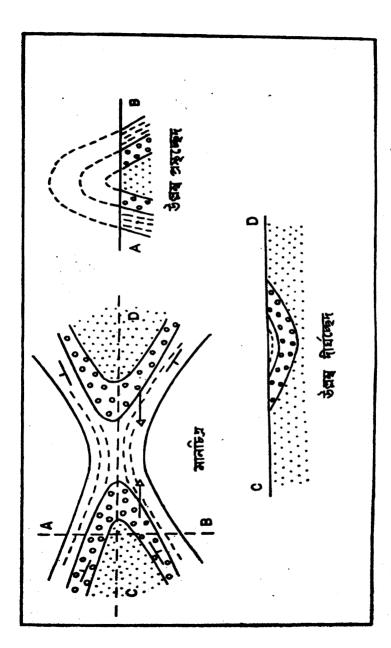
ওপরের দিকে বাঁকা (চিত্র 51-খ এবং ঘ)। মানচিত্রে যে অঞ্চলের দুধারের বলি-অক্ষগুলির প্রাঞ্জ্ অঞ্চলটির অন্তর্মুখী, সেই অঞ্চলকে ডিপ্রেশন্ অঞ্চল (dipression zone) বলা হয় (চিত্র 50-ঙ এবং ছ)। বলি-অক্ষের
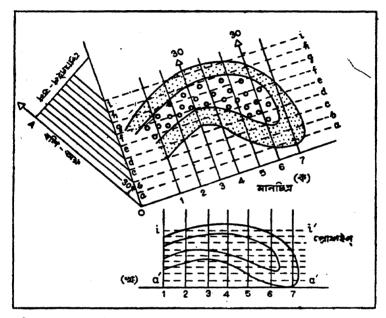
চিত্র - 53 : মানচিত্র থেকে টেক্‌টনিক প্রোফাইল্ আঁকার পদ্ধতি। মানচিত্রটিতে বলি-অক্ষের ট্রেণ্ড্-এর সমান্তরালে কতকগুলি সরলরেখা (1 - 7) এবং তার সমকোণে কতকগুলি সরল রেখা আঁকা হোল। সমকোণের রেখাগুলি বলি-অক্ষের ট্রেণ্ড্‌কে a, b, c ইত্যাদি বিন্দুতে ছেদ করে। এখন বলি-অক্ষের সঙ্গে প্রাঞ্জ্-এর (30°) সমান করে OA রেখা আঁকা হোল। বলি-অক্ষের ট্রেণ্ড্-এর সমান্তরালে OB একটি অনুভূমিক রেখা, এবং OAB একটি ছেদতল (plane of section)। এখন a, b, c ইত্যাদি বিন্দু থেকে OA-এর সমান্তরালে কতকগুলি সরলরেখা আঁকা হোল। এই রেখাগুলিকে (খ)-চিত্রে আলাদা করে এঁকে নেওয়া হয়েছে। মানচিত্রের 1, 2, 3 ইত্যাদি রেখা-গুলিকেও (খ)-চিত্রে আঁকা হয়েছে। এখন মানচিত্রের a, b, c ইত্যাদি রেখাসমূহের সঙ্গে 1, 2, 3 ইত্যাদি রেখাসমূহের ছেদবিন্দুগুলি (খ)-চিত্রের প্রোফাইল্-এর a'-ইত্যাদি রেখার সঙ্গে 1, 2, 3 ইত্যাদি রেখার ছেদবিন্দু হিসেবে নতুন অবস্থানে স্থাপিত করা হোল। এই ভাবে মানচিত্রের যে কোন বিন্দুকে প্রোফাইল্-তলে নতুন করে স্থাপিত করে বলির টেক্‌টনিক প্রোফাইল্ আঁকা হয়।

ডিপ্রেশন্ থেকে বোঝা যায় যে বলিগুলির গ্রন্থিরেখা অবতল (concave) বা নীচের দিকে বাঁকা (চিত্র 51-ক এবং গ)। এ্যান্টিফর্মের ও সিন্‌ফর্মের কালমিনেশন্-এর এবং ডিপ্রেশন্-এর মানচিত্র চিত্র 50-এ দেখানো হয়েছে।

বৃহদায়তন বলির জ্যামিতিক বর্ণনার জন্যে অনেক সময়েই প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কনের প্রয়োজন পড়ে। সাধারণতঃ এই প্রস্থচ্ছেদের তলটি অক্ষতলীয় ছেদরেখার (axial trace) সমকোণে অবস্থিত একটি উল্লম্ব সমতল (vertical plane) হিসাবে নেওয়া হয় (চিত্র 52)। তবে বলির যথাযথ জ্যামিতিক বর্ণনার জন্য উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদের (vertical cross-section) পরিবর্তে টেক্‌টনিক্ প্রোফাইল্ আঁকাই শ্রেয়। যে প্রস্থচ্ছেদ বলি-অক্ষের সমকোণে অবস্থিত একটি সমতলের উপর আঁকা হয় তাকে প্রোফাইল্ অথবা টেক্‌টনিক্ প্রোফাইল্ বলে। বলা বাহুল্য, সমভূমিতে উল্লম্ব-বলির মানচিত্রে আলাদা করে প্রোফাইল্ আঁকার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে মান-চিত্রটিই একটি টেক্‌টনিক্ প্রোফাইল্। আবার, অনুভূমিক বলির উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ থেকেই টেক্‌টনিক্ প্রোফাইল্ পাওয়া যায়। অবনত বলির ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রোফাইল্ আঁকার প্রয়োজন হয়। সমভূমির মানচিত্রে বলি-অক্ষের ভঙ্গী (attitude) জানা থাকলে সহজেই টেক্‌টনিক্ প্রোফাইল আঁকা সম্ভব। 53-চিত্রে প্রোফাইল্ আঁকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। বলি-অক্ষের কালমিনেশন্ ও ডিপ্রেশন্ থাকলে প্রস্থচ্ছেদ বা প্রোফাইল ছাড়াও কোন কোন সময়ে দীর্ঘচ্ছেদ (longitudinal section) আঁকার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ অক্ষতলীয় ছেদরেখার সমান্তরাল একটি উল্লম্ব সমতলের ওপর দীর্ঘচ্ছেদ্ আঁকা হয় (চিত্র 52)।

পরিচ্ছেদ ১১

বৃহদায়তন স্তম্ভাকার বলির অক্ষের ভঙ্গীনির্ণয়

ক্ষুদ্রায়তন বা মধ্যমায়তন বলির ক্ষেত্রে বলি-অক্ষের ভঙ্গীনির্ণয় সহজেই সম্ভব। অবশ্য, এক্ষেত্রে বলির গ্রন্থি উদ্ভেদ থেকে কিছুটা বেরিয়ে থাকার প্রয়োজন। গ্রন্থিরেখার ট্রেন্ড্ ও প্লাঞ্জ্ মাপলেই বলি-অক্ষের ভঙ্গী নির্ণীত হয়। বৃহদায়তন বলির গ্রন্থিরেখা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। তাই বৃহদায়তন বলির অক্ষের ভঙ্গী অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণীত হয়। সাধারণতঃ, নীচের তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে বৃহদায়তনে স্তম্ভাকার বলির অক্ষের ভঙ্গী নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

(১) যদি একটি অঞ্চলের বিভিন্ন বলি মোটামুটিভাবে একই সময়ে গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তন বলিগুলির গ্রন্থিরেখা মোটামুটিভাবে বৃহদায়তন বলির অক্ষের সমান্তরাল। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে বৃহদায়তন বলিসমষ্টিতে বলি-অক্ষের ভঙ্গী সর্বত্র হুবহু এক না হওয়াই সম্ভব। তাই, বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তন বলির গ্রন্থিরেখার ভঙ্গী নির্ণয় করে, যে ভঙ্গীটি সচরাচর দৃষ্ট হয় সেটিকেই বৃহদায়তন বলি-অক্ষের ভঙ্গী হিসাবে নেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ, এর জন্যে ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তন বলির (অর্থাৎ, মেসোস্কোপিক পরিমাপের) গ্রন্থিরেখার ভঙ্গীগুলি একটি স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপে বসানো হয়। এই অভিক্ষেপের যে জায়গায় অভিক্ষিপ্ত গ্রন্থি-রেখার বিন্দুগুলি সবথেকে ঘনসন্নিবিষ্ট, সেটিকে বৃহদায়তন বলির ভঙ্গী হিসেবে ধরা হয় (চিত্র 54-খ)।

(২) বলির অক্ষতল (axial plane) সব সময়েই গ্রন্থিরেখার (hinge line) সমান্তরালে থাকে। আবার, গ্রন্থিরেখাটি অবশ্যই বলিত পৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত থাকবে। তাই অক্ষতল ও বলিত পৃষ্ঠের ছেদরেখাটি গ্রন্থি বা বলি-অক্ষের সমান্তরাল হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বঙ্গিত শিলাস্তরে অক্ষতলের সমান্তরালে এক ধরনের সমতলীয় গঠন দেখতে পাওয়া যায়। অক্ষতলীয় সম্ভেদ্ (axial plane cleavage) এই ধরনের এক সমতলীয় গঠন (planar structure)। সুতরাং অক্ষতলীয় সম্ভেদ্ এবং স্তর-বিন্যাসের ছেদরেখার ভঙ্গী থেকে বলি-অক্ষের ভঙ্গী নির্ণীত হতে পারে।
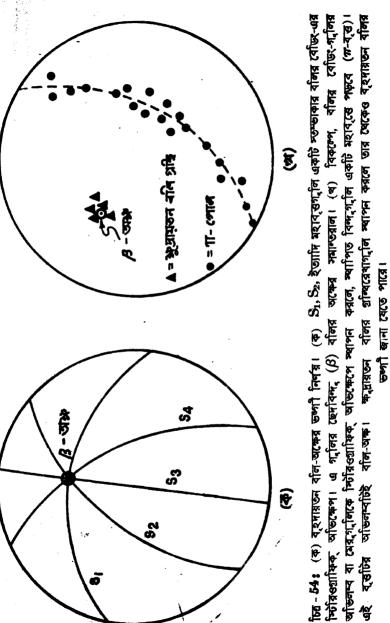
চিত্র - *54*: (ক) বৃহদায়তন বলি-অক্ষের ভঙ্গী নির্ণয়। (ক) S_1, S_2, ইত্যাদি মহাবৃত্তগুলি একটি স্তম্ভাকার বলির বেডিং-এর স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপ। এ গুলির ছেদবিন্দু (β) বলির অক্ষের সমান্তরাল। (খ) বিকল্পে, বলির বেডিং-গুলির অভিলম্ব বা মেরুগুলিকে স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপে স্থাপন করলে, স্থাপিত বিন্দুগুলি একটি মহাবৃত্তে পড়বে (π-বৃত্ত)। এই বৃত্তটির অভিলম্বটিই বলি-অক্ষ। ক্ষুদ্রায়তন বলির গ্রন্থিরেখাগুলি স্থাপন করলে তার থেকেও বৃহদায়তন বলির ভঙ্গী জানা যেতে পারে।

এক্ষেত্রেও একটি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় স্তরবিন্যাস ও অক্ষতলীয় সম্ভেদের ছেদরেখাগুলির ভঙ্গী নির্ণয় করা হয়ে থাকে। যে ভঙ্গীটি সচরাচর দৃষ্ট হয় সেটিকেই বৃহদায়তন বলি-অক্ষের ভঙ্গী হিসাবে নেওয়া হয়।

(৩) ধরা যাক্ একটি বলিত পৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে কতগুলি স্পর্শকতল (tangent plane) আঁকা হোল। বলিত পৃষ্ঠটি স্তম্ভাকার হলে এই স্পর্শকতলগুলি বলি-অক্ষের সমান্তরাল রেখায় পরস্পরকে ছেদ করবে। সুতরাং, বৃহদায়তন স্তম্ভাকার বলির অক্ষের ভঙ্গী নির্ণয়ের জন্য বলিত অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বলিত পৃষ্ঠগুলির ভঙ্গী নির্ণয় করা হয়ে থাকে। স্টিরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপে এই ভঙ্গীগুলি বসানো হয়। অভিক্ষেপের যে বিন্দুতে বলিত পৃষ্ঠগুলি পরস্পরকে ছেদ করে সেটিকে β-অক্ষ (β-axis) বলা হয়। অভিক্ষেপটিকে β-চিত্র (β-diagram) বলা হয় (চিত্র 54-ক)। বিকল্প পদ্ধতিতে বলিত পৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় অভিলম্বগুলি (normals) স্টিরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপে বসানো হয়। অভিক্ষিপ্ত অভিলম্বগুলির বিন্দুগুলিকে π-পোল্ (π-Pole) বলা হয়। বলিগুলি স্তম্ভাকার হলে পাই-পোল্‌সমূহ একটি বৃত্তাকার চাপের ওপর অবস্থান করে। এই চাপটিকে π-বৃত্ত (π-circle) বলা হয়। এই পাই-বৃত্তের অভিলম্বটিই বীটা-অক্ষ (চিত্র 54-খ)। বীটা-অক্ষ স্তম্ভাকার বলিবিশিষ্ট সমগ্র অঞ্চলটির বলি-অক্ষ নির্দেশ করে।

পরিচ্ছেদ ১২

উৎপত্তির প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বলির শ্রেণীবিভাগ

বলির সংজ্ঞায় আগেই বলা হয়েছে যে একমাত্র বিরূপণের (deformation) ফলেই বলির সৃষ্টি হয়। বলির উৎপত্তির প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সাধারণতঃ দু'ধরনের শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে। (এই দুই পদ্ধতির তুলনামূলক বিচারের জন্য Ghosh, 1968 দ্রষ্টব্য)।

(১) শিলাস্তরের অভ্যন্তরে কীভাবে বিভিন্ন বিন্দু, রেখা ও তল পরস্পরের থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেই সরণের (movement) বিভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে অসদৃশ বলিগুলিকে শ্রেণীবিভাগে ফেলা যায়। এই পদ্ধতিতে দু'ধরনের বলিকে আলাদা করা হয়ঃ

(ক) ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্ ফোল্ড্ (flexural slip fold)

(খ) স্লিপ্ ফোল্ড্ বা শিয়ার্ ফোল্ড্ (slip fold or shear fold)

(২) আবার কী ধরনের বল (force) শিলাস্তরের বিরূপণ ঘটাচ্ছে তার ভিত্তিতেও বলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় (Ramberg, 1963)। এই পদ্ধতিতেও মোটামুটিভাবে দু'ধরনের বলিকে আলাদা করা হয়ঃ

(ক) বাক্লিং ফোল্ড্ (buckling fold)

(খ) বেন্ডিং ফোল্ড্ (bending fold)

(১) ক ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্ ফোল্ড্

যদি এক প্যাকেট্ তাস হাতের চাপে বাঁকানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাঁকানোর সময় তাসগুলি একটির ওপর আর একটি পিছ্লে পিছ্লে যাচ্ছে। একইভাবে স্তরীভূত শিলা বেঁকে যাওয়ার সময় এক-একটি স্তর অপর স্তরের ওপর পিছ্লে গেলে বলিটিকে ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্ ফোল্ড্ বলা হয়। ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্ বলির স্তরগুলির পিছলে যাওয়া বা স্খলন সব জায়গায় সমান হয় না। ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্ বলির স্খলনের (slip) মান কিসের ওপর নির্ভর করে? ধরা যাক স্তরীভূত শিলার অভ্যন্তরে AB ও CD দুটি সমতল (চিত্র *55*) এবং AB ও CD রেখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য l এবং রেখাদুটির মধ্যের দূরত্ব h। ধরে নেওয়া যাক যে AB ও CD রেখাদ্বয় এককেন্দ্রীয় বৃত্তের চাপের আকারে বলিত হোল (চিত্র *55*)। বলিত হওয়ার আগে AC-রেখা AB ও CD রেখাদ্বয়ের সমকোণে ছিল। বলিত হওয়ার পর AC-রেখা AB ও CD রেখার সাথে

চিত্র - 55 ঃ ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ বলির স্খলনের মাননির্ণয়।
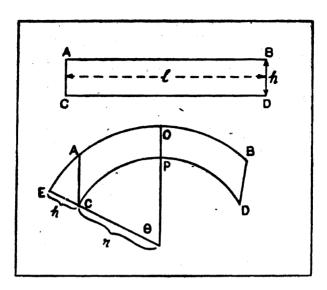
সূক্ষ্মকোণে অবস্থিত। C বিন্দুতে CD রেখার উপর একটি অভিলম্ব আঁকা হোল। অভিলম্বটি AB চাপের বর্ধিত অংশে E বিন্দুতে ছেদ করে। অতএব AB ও CD রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্খলনের মান AE। বলিত AB রেখার O বিন্দুতে রেখাটি অনুভূমিক। এই বিন্দু থেকে AB রেখার অভিলম্ব টানা হোল। ধরা যাক এক কেন্দ্রীয় বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রে এই দুটি অভিলম্ব θ কোণ সৃষ্টি করে। CD চাপের ব্যাসার্ধ r।

এখন,

$$
\begin{aligned}
\text{চাপ EA} &= \text{চাপ OE} - \text{চাপ OA} \\
&= \text{চাপ OE} - \tfrac{1}{2}l \\
&= \text{চাপ OE} - \text{চাপ PC} \\
&= (r+h)\theta - r\theta \\
&= h\theta
\end{aligned}
$$

অতএব ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ বলির বক্রণজনিত স্খলনের (flexural slip) মান দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, h এবং θ। সমকোণীয় বেধ (orthogonal thickness) বাড়লে স্খলনের মানও বাড়ে। আবার বলিত পৃষ্ঠের গ্রন্থির সাথে কোণ (θ) যত বড় হবে স্খলনের মানও তত বাড়বে। যেহেতু বলি-গ্রন্থিতে θ-এর মান শূন্য, তাই সেখানে ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ বা

বক্রণজনিত স্খলনের মানও শূন্য। ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ বলির ইন্‌ফ্লেক্সন্-বিন্দুতে স্খলন সব থেকে বেশি। সাধারণতঃ স্খলনের দিক্‌নির্দেশ বলি-অক্ষের সমকোণে থাকে। একটি বলির উভয় বাহুতে স্খলনের দিক্‌নির্দেশ বিপরীত হবে। এ্যান্টিফর্মে বলিত স্তরের ওপরের পৃষ্ঠ (নীচের পৃষ্ঠের তুলনায়) এ্যান্টিফর্মীয় গ্রন্থির দিকে স্খলিত হয়, এবং সিন্‌ফর্মে নীচের পৃষ্ঠ (ওপরের পৃষ্ঠের তুলনায়) সিন্‌ফর্মীয় গ্রন্থির দিকে স্খলিত হয় (চিত্র 56)।

চিত্র - 56ঃ এ্যান্টিফর্ম্ ও সিন্‌ফর্ম্-এ ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্-এর দিক্‌নির্দেশ।

যদি কোনরকম স্খলন না হয়ে একটি স্তর বেঁকে যায়, তাহলে বলিটিকে ফ্লেক্সার্ ফোল্ড্ (flexure fold) বলা হয়। (বাংলায় ফ্লেক্সার ফোল্ড্-কে বক্রণজাত বলি বলা চলতে পারে)।

ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ ফোল্ড্ বা ফ্লেক্সার ফোল্ড্ কীভাবে চেনা যায় সেটা পরে বাক্‌লিং ফোল্ড্-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে।

(খ) স্লিপ-ফোল্ড্ বা শিয়ার-ফোল্ড্ (slip fold or shear fold)

ধরা যাক্ এক প্যাকেট্ তাসের পাশের দিকে পেন্সিল দিয়ে (চিত্র 57) কাছাকাছি দুটি সমান্তরাল রেখা AB ও CD আঁকা হোল। এখন হাত দিয়ে একপাশ থেকে তাসগুলিকে এমনভাবে ঠেলে দেওয়া হল যাতে মাঝের তাসগুলি ওপরের ও নীচের তাসের চেয়ে বেশি দূরে যায় (চিত্র 57)। এই ঠেলার জন্য পেন্সিলের রেখাদুটি বেঁকে যাবে। এখানে তাস-গুলি নিজেরা বেঁকে যাচ্ছে না, শুধু একটার ওপর আর একটা পিছলে যাচ্ছে। মোটামুটি এই একই পদ্ধতিতে স্লিপ্ ফোল্ড্ তৈরী হতে পারে। 58-ক চিত্রে সমান্তরাল কতকগুলি স্তরবিন্যাস বা বেডিং দেখানো হয়েছে। এই স্তরগুলির সাথে যে কোন কোণে অবস্থিত PR আর একটি সমতল।
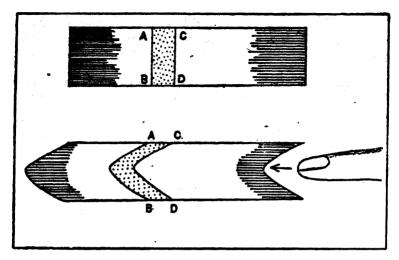
চিত্র - 57 : তাসের প্যাকেট্-এর সাহায্যে স্লিপ্-ফোল্ড্ সৃষ্টির পদ্ধতির ব্যাখ্যা। তাসের প্যাকেটের পাশের দিকে AB ও CD দুটি রেখা এঁকে নেওয়া হয়েছে। তারপরে আঙুল দিয়ে প্যাকেটের মাঝখানটা ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে AB এবং CD রেখাদ্বয় বেঁকে গিয়ে স্লিপ্-ফোল্ড্-এর সৃষ্টি করেছে।

এই সমতলের সমান্তরালে ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলি সমতল আছে যেগুলি একটির ওপর অপরটি পিছ্লে যেতে পারে। এই সমতলগুলিকে স্খলনতল
ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ ফোল্ড্ বা ফ্লেক্সার ফোল্ড্ কীভাবে চেনা যায় সেটা
(slip planes) বলা যেতে পারে। চিত্র 58-খ-তে PQ রেখাটি স্তরবিন্যাস ও স্খলনতলের ছেদরেখা। স্খলনতলের ওপরে PQ-এর সাথে যে কোন একটি কোণ করে স্খলনের দিক্‌নির্দেশ (slip direction) তীর চিহ্নিত *a*-রেখাংশের দ্বারা 58-খ চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখন স্খলনের মান বিভিন্ন তলে অসমান হলে স্তরগুলি বলিত হবে। এই ধরনের বলিকে স্লিপ্-ফোল্ড্ বলা হয়। অর্থাৎ স্লিপ্-ফোল্ড্-এর সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ, স্তরবিন্যাসের সাথে কোণ করে কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট স্খলনতল থাকা প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ, স্খলনের দিক্‌নির্দেশ (*a*) PQ-ছেদরেখার সাথে অসমান্তরাল(non-parallel) হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, স্খলনের মান বিভিন্ন স্খলনতলে অসমান হতে হবে।

স্লিপ্ ফোল্ড্-এর স্খলনতলগুলি বলির অক্ষতলের সমান্তরাল। স্খলনতল ও স্তরবিন্যাসের ছেদরেখাটি (58 নং চিত্রের PQ-রেখা) বলি-অক্ষের সমান্তরাল হয়।

চিত্র-58: স্লিপ্-ফোল্ড্-এর উৎপত্তির প্রক্রিয়া।
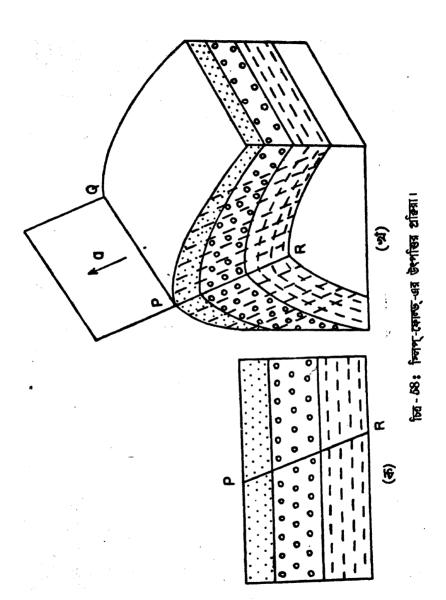
স্লিপ্-ফোল্ড্-এর অক্ষতলীয় বেধ (axial plane thickness) **একটি স্তরের মধ্যে সর্বত্র সমান। অর্থাৎ স্লিপ্-ফোল্ড্ সবসময়েই একটি সমরূপী বলি** (similar fold)। বলা বাহুল্য, স্লিপ্ ফোল্ড্-এর সমকোণীয় বেধ (orthogonal thickness) বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হবে। গ্রন্থি-অঞ্চলের (hinge-zone) তুলনায় বলি-বাহুতে (fold limb) সমকোণীয় বেধ কম হবে।

(২) ক. **বাকলিং ফোল্ড** (buckling fold)

শিলাস্তরের সমান্তরাল কোন এক সংকোচনকারী বলের (compressive force) প্রভাবে যে-বলির সৃষ্টি হয় (চিত্র 59) তাকে বাক্লিং ফোল্ড্ বা বাক্ল ফোল্ড্ (buckling fold or buckle fold) বলা হয় (Ramberg 1963, 1964)। বৃহত্তম সঙ্কোচক টানের দিকের সাথে দৃঢ় শিলাস্তর সূক্ষ্মকোণে অবস্থিত না হলে বাক্লিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি হয় না (প্লেট্-4)।

শিলায় আভ্যন্তরীণ বলসমূহ শিলাস্তরের আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। তবে এই পীড়নের (stress) প্রভাব বিভিন্ন শিলায় বিভিন্ন রকম হয়। কারণ, শিলার অভ্যন্তরে তার আকৃতির পরিবর্তন ঘটানোকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তিও থাকে। যে শিলায় এই প্রতিরোধী বলসমূহ বেশি সেগুলি সহজে বিরূপিত হয় না। এই ধরনের শিলাকে কম্পিটেন্ট্ (competent) শিলা বা দৃঢ় শিলা বলা হয়। যে শিলা সহজেই বিরূপিত হয় তাকে ইন্কম্পিটেন্ট্ শিলা বা অদৃঢ় শিলা বলা হয়। যদি বিভিন্নস্তরের দার্ঢ্য (competence) মোটামুটি একইরকম হয় তাহলে বাকলিং ফোল্ড্ তৈরী হতে পারে না। যেখানে দৃঢ় ও অদৃঢ় দু'ধরনের শিলা একসাথে থাকে একমাত্র সেখানেই বাক্ল ফোল্ড্-এর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

দৃঢ় ও অদৃঢ় শিলার দার্ঢ্যের অনুপাত (ratio of competence) যত বাড়বে, দৃঢ় শিলাস্তরে বাক্ল ফোল্ডের চাপদৈর্ঘ্য (length of arc) তত বেশী হবে। আবার দৃঢ় ও অদৃঢ় শিলার দার্ঢ্যের অনুপাত একই রকম থাকলেও, যে দৃঢ় শিলাস্তর যত বেশি পুরু হবে, সেই স্তরের বলির চাপদৈর্ঘ্যও তত বেশি হবে। অর্থাৎ আশেপাশের শিলার তুলনায় একটি শিলাস্তর যত দৃঢ় হবে এবং যত স্থূল হবে বলিটিও তত বড় হবে।

ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ ফোল্ড্ এবং ফ্লেক্সার্-ফোল্ড্ উভয়েই বাক্লিং-এর ফলে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, স্তরীভূত শিলায় বাক্লিং ফোল্ড্ এবং ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ ফোল্ড্ সমার্থক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

প্লেট্—4 : পরীক্ষাগারে বিরূপিত মডেল্। হাল্কা ছাই রঙের অংশটি অদৃঢ় (incompetent) silcone putty, এবং তার ভেতরের সাদা অংশগুলি modelling clay। কালো 'শিরা' তিনটি দৃঢ় (competent) modelling clay। বিরূপণের আগে তিনটি শিরাই ঋজু ছিল। বিরূপণের ফলে যে-শিরাটি বৃহত্তম সঙ্কোচক টানের সমান্তরাল ছিল সেটিতেই বাক্‌লিং ফোল্ড্-এর আতিশয্য বেশী, যে শিরাটি প্রথমে বৃহত্তম সঙ্কোচনের সাথে সূক্ষ্মকোণে ছিল সেটিতে বাক্‌লিং-এর আতিশয্য কম, এবং যে-শিরাটি বৃহত্তম সঙ্কোচনের সাথে স্থূলকোণে অবস্থিত ছিল সেটি একেবারেই বলিত হয়নি, বরং সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্লেট্ –6 : বিহারের জসিডি অঞ্চলের মিগ্‌মাটাইট্‌-এ বেন্ডিং ফোল্ড্‌। বলিটির সৃষ্টি হয়েছে এ্যাম্ফিবোলাইট্‌-এর দুটি বদিন্‌-এর মাঝখানকার ফাঁকের কাছে। লক্ষণীয় যে এ-ধরনের বেন্ডিং ফোল্ড-এ বলির বিস্তার (amplitude) ক্রমশঃ কমে আসে।
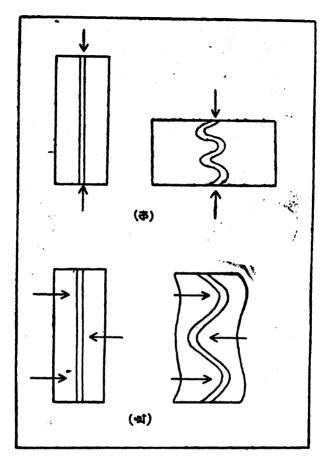
চিত্র - 59 ঃ (ক) বাক্‌লিং ফোল্ড্‌-এর উৎপত্তি। (খ) বেণ্ডিং ফোল্ড্‌-এর উৎপত্তি।

নিম্নলিখিত জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বাক্‌লিং ফোল্ড্‌ বা ফ্লেক্সারাল্‌-স্লিপ্‌ ফোল্ড্‌ (অথবা ফ্লেক্সার ফোল্ড্‌) চেনা যেতে পারে।

(*i*) বিসদৃশ বলির (disharmonic folds) উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে বলিগুলি বাক্‌লিং বা ফ্লেক্সারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 60)।

(*ii*) যদি একই ধরনের শিলায় দেখা যায় যে স্থূলতর স্তরে বৃহত্তর বলির সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 60) তাহলে বলিগুলিকে বাক্‌লিং ফোল্ড্‌ বলা যেতে পারে (প্লেট্‌-5)।
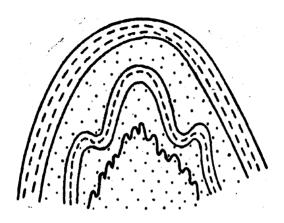
চিত্র - 60 : বাক্‌লিং-এর ফলে সৃষ্ট বিসদৃশ বলি।

(*iii*) বিভিন্ন স্তরে বলির আকৃতি পুরোদস্তুর সমরূপী (similar) হবে না। দৃঢ় শিলাস্তরে সমান্তরাল বলি (parallel fold) পাওয়া যাবে, অথবা বলিগুলি র‍্যাম্‌সের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে প্রথম শ্রেণীর c-বিভাগে পড়বে।

(*iv*) কোন কোন ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাসের (bedding) গায়ে ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্‌-এর (বা বক্রণজনিত স্খলনের) দিকে সমান্তরালভাবে অবস্থিত আঁচড় দেখা যাবে (চিত্র 61-ক)।

(*v*) দৃঢ় শিলাস্তরের বলিতে কোন কোন সময়ে সম্প্রসারণজনিত চিড় (tension crack) দেখা যেতে পারে। এই চিড়গুলি বলির ক্রোড়ের দিকে অভিসারী (convergent) হলে বলিটিকে বাক্‌লিং ফোল্ড্ বা ফ্লেক্সার্ ফোল্ড্ হিসাবে চেনা যাবে (চিত্র 61-খ)।

(*vi*) কোন কোন ক্ষেত্রে কোয়ার্ট্‌জ্ বা অন্য কোন শিলার সরু সরু শিরা (vein) স্তরবিন্যাসকে কেটে যায়। ফ্লেক্সারাল স্লিপ্‌-এর ফলে এই শিরাগুলি স্খলিত বা বিচ্ছিন্ন হতে পারে (চিত্র 61-গ)। এই স্খলনের দিক্‌নির্দেশ বলির দুই বাহুতে বিপরীত হবে (চিত্র 61-গ)। এর থেকে বোঝা যায় যে বলিটি ফ্লেক্সারাল্ স্লিপ্‌-এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

(*vii*) রূপান্তরিত শিলায় গার্নেট্ বা এই ধরনের কঠিন পরফিরো-ব্লাস্ট্‌-এর থেকে অনেক ক্ষেত্রে শিলার অভ্যন্তরে ঘূর্ণনের দিক্‌নির্দেশ
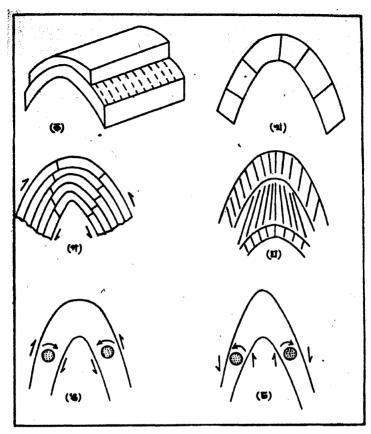
চিত্র - 61 : বাক্‌লিং ফোল্ড্-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। (ঙ) এবং (চ)-চিত্রে ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ এবং স্লিপ্-ফোল্ড্-এর প্রক্রিয়ায় শক্ত, গোল পর্-ফিরোব্লাস্ট্-এর ঘূর্ণনের বিভিন্নতা দেখানো হয়েছে।

পাওয়া যেতে পারে। বাক্‌লিং ফোল্ড্-এর বা ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ ফোল্ড্-এর ঘূর্ণনের দিক্‌নির্দেশ 61-ঙ চিত্রে দেখানো হয়েছে। স্লিপ্ ফোল্ড্-এর ঘূর্ণন এর বিপরীত হয় (চিত্র 61-চ; Ghosh and Sengupta, 1973)।

(*viii*) কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্‌লিং ফোল্ড্-এর অক্ষতলীয় সম্ভেদ্ (axial plane cleavage) দৃঢ় ও অদৃঢ় স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে থাকতে দেখা যায়। সম্ভেদের এই বৈশিষ্ট্যকে "সম্ভেদের প্রতিসরণ" (refraction of cleavage) বলা হয়। সাধারণতঃ অদৃঢ় শিলাস্তরের তুলনায় দৃঢ়

শিলাস্তরে বলিবাহুতে সম্ভেদ্ ও স্তরবিন্যাসের অন্তর্বর্তী কোণ বৃহত্তর হয় (চিত্র 61-ঘ)। "সম্ভেদের প্রতিসরণ" বাক্‌লিং বা ফ্লেক্সারাল্-স্লিপ্ ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় না (Ramberg and Ghosh, 1968)।

(খ) বেণ্ডিং ফোল্ড্ (Bending fold)

যদি শিলাস্তরের আড়াআড়িভাবে সক্রিয় বলসমূহ (forces) স্তরটিকে বিভিন্ন দূরত্বে ঠেলে দেয় তাহলে বেণ্ডিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি হয় (চিত্র 59-খ)। বেণ্ডিং ফোল্ড্ সৃষ্টির সময়ে স্তরবিন্যাসের সমান্তরালে কোন

চিত্র -62ঃ পরীক্ষাগারে তরল পদার্থের মডেল্-এ অভিকর্ষের প্রভাবে ডোম্ (dome) সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়। (ক)-চিত্রে ভারী তরল বস্তুটি ওপরে এবং লঘু বস্তুটি নীচে আছে। (খ) এবং (গ)-চিত্রে লঘু বস্তুটি ডোম্ সৃষ্টি করে ওপরে উঠছে এবং ভারী বস্তুটি বেসিন্ সৃষ্টি করে নীচে নামছে। (ঘ)-চিত্রে ভারী বস্তুটি নীচে এবং হাল্কা বস্তুটি ওপরে গিয়ে সুপ্রতিষ্ঠ (stable) হয়েছে।
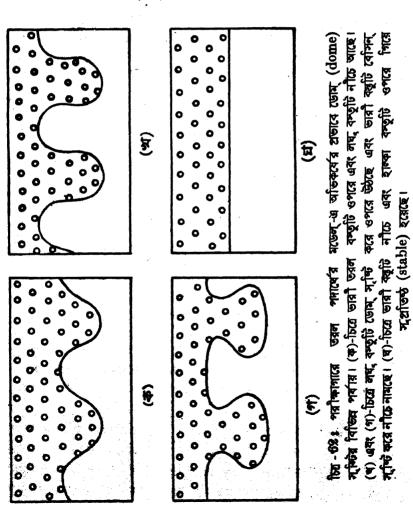
সঙ্কোচনকারী বল থাকে না। স্লিপ্ ফোল্ড্ এক ধরনের বেণ্ডিং ফোল্ড্। তবে, অক্ষতলের সমান্তরালে স্খলন না হয়েও (অর্থাৎ, স্লিপ্ ফোল্ডিং না হয়েও) বেণ্ডিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণতঃ এই ধরনের বেণ্ডিং ফোল্ড্ সহজেই পরীক্ষাগারে তৈরী করা সম্ভব। ধরা যাক, কাচের বা স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের বাক্সের মধ্যে দুটি অমিশ্রণীয় (immiscible) তরল পদার্থ নেওয়া হোল। তরল পদার্থ দুটির রং ও ঘনত্ব আলাদা। বলা বাহুল্য, ভারী তরল বস্তুর স্তরটি বাক্সের নীচে ও হাল্কা বস্তুর স্তরটি
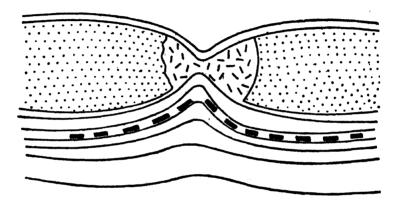
চিত্র - 63ঃ বুদিনাজ্-এর ফলে বেণ্ডিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি। বুদিন্গুলি এ্যাম্ফিবোলাইট্ শিলায় গঠিত। দুটি বুদিন্-এর মধ্যে পেগ্মাটাইট্-এর সৃষ্টি হয়েছে। গ্র্যানিট্নাইস্-এর পরতগুলি এ্যাম্ফিবোলাইট্-এর ভাঙা টুকরো দুটোর ফাঁকে কিছুটা প্রবেশ করে বেণ্ডিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি করেছে। (বিহারের জসিডি অঞ্চলের মিগ্মাটাইট্-এর উদ্ভেদ্ থেকে অঙ্কিত।)

ওপরে থাকবে। এখন হঠাৎ এই মুখবন্ধ বাক্সটি উল্টে দেওয়া হল। প্রথমে হাল্কা স্তরটি নীচে এবং ভারী স্তরটি ওপরে থাকবে। এই অবস্থা থেকে হাল্কা স্তরটিকে ক্রমশঃ সুনিয়মিত তরঙ্গের আকৃতিতে ওপরে উঠতে দেখা যাবে (চিত্র 62-ক, খ)। এগুলিই বেণ্ডিং ফোল্ড্। তরঙ্গগুলি ক্রমশঃ ছত্রাকার হয়ে পড়বে (চিত্র 62-গ) এবং অবশেষে সমগ্র হাল্কা স্তরটি ভারী স্তরের ওপরে এসে সুপ্রতিষ্ঠ (stable) হবে (চিত্র 62-ঘ)। এই একই প্রক্রিয়ায় শিলাস্তরে গ্রানিট্-এর ডোম্ (dome) অথবা সল্ট্-ডোম্ (salt dome) সৃষ্ট হতে পারে। অভিকর্ষের প্রভাবে সৃষ্ট এই ধরনের বেণ্ডিং ফোল্ড্ সবসময়েই বৃহদায়তনের হয়।

ক্ষুদ্র ও মধ্যমাত্রতনের বেণ্ডিং ফোল্ড্ অভিকর্ষের প্রভাবে হয় না। এগুলি শিলাস্তরে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, ভঙ্গুর (brittle) বা সম্প্রসার্য (ductile) শিলার স্তর একসাথে থাকলে অনেক সময় দেখা যায় যে ভঙ্গুর শিলাস্তরটি ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বুদিনাজ্ (boudinage) বলা হয়। সম্প্রসার্য বা অদৃঢ় (incompetent) শিলাস্তরগুলি এই ভাঙ্গা অংশগুলির ফাঁকে ফাঁকে বেঁকে গিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় (চিত্র 69)। এইভাবে বেঁকে যাওয়ার ফলে বেণ্ডিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি হতে পারে। ভঙ্গুর স্তরটি থেকে দূরে গেলে ক্রমশঃ এই বলিগুলির বিস্তার (amplitude) ছোট হয়ে এসে অবশেষে মিলিয়ে যায় (প্লেট্-6)।

পরিচ্ছেদ ১৩

সন্ভেদ্ বা ফোলিয়েশন্

সন্ভেদের সংজ্ঞা ও সাধারণ বর্ণনা

সন্ভেদ একধরনের সমতলীয় গঠন, যে গঠনের সমান্তরালে শিলাটিকে পাতলা পাতায় পাতায় ভেঙে ফেলা সম্ভব এবং যে গঠনটি শিলার রূপান্তর (metamorphism) এবং বিরূপণ (deformation) এই উভয় প্রক্রিয়াতে সৃষ্ট হয়েছে (Hills, 1963, পৃঃ 287)। ইংরাজীতে এই ধরনের গঠনকে ক্লিভেজ্ (cleavage), শিস্টসিটি (schistosity) বা ফোলিয়েশন্ (foliation) বলা হয়। ক্লিভেজ্, শিস্টসিটি ও ফোলিয়েশন্ মোটামুটি-ভাবে সমার্থক হলেও এই কথাগুলির ব্যবহারে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন নাইস্ (gneiss) পাথরে বিভিন্ন মণিকের সমষ্টি আলাদা আলাদা পরত (band) সৃষ্টি করতে পারে। এই গঠনটিকে ক্লিভেজ্ বা শিস্টসিটি না বলে ফোলিয়েশন্ বলা হয়। আবার স্লেট্ পাথরের গঠন বর্ণনায় শিস্টসিটি শব্দের পরিবর্তে ক্লিভেজ্ শব্দটিই সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। আজকাল ফোলিয়েশন্ শব্দটি স্লেট্, ফিলাইট্, শিস্ট্ এবং এবং নাইস্ (slate, phyllite, schist, gneiss) পাথরের সমতলীয় গঠন বর্ণনায় সমানভাবে ব্যবহার করা হয় (Fairbairn, 1949; Turner and Weiss, 1963)। বাংলায় সন্ভেদ্ বা শিলাসন্ভেদ শব্দটি এই বর্ধিত অর্থে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ রূপান্তরিত শিলায় মণিকের চ্যাপ্টা দানাগুলি মোটামুটি ভাবে সমান্তরাল থেকে যে সমতলীয় গঠনসমূহের সৃষ্টি করে সেগুলিকে সন্ভেদ্ হিসাবে চেনা যেতে পারে। স্লেট্ পাথরে মণিকের দানাগুলি খুব ছোট থাকায় খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু পাথরটিকে একটি সমতলের সমান্তরালে পাতলা পাতায় পাতায় সহজেই ভেঙে ফেলা যায়। স্লেট্ পাথরের এই প্রকৃতি থেকে সন্ভেদ্ চেনা যায়। অণুবীক্ষণে অবশ্য দেখা যায় যে স্লেট্-এর মণিকের দানাগুলি (grains) মোটামুটিভাবে পরস্পরের সমান্তরালে আছে। আবার, কোন কোন রূপান্তরিত শিলায় দেখা যায় যে রূপান্তরজাত বিভিন্ন পরতগুলি (bands, layers) বিভিন্ন মণিকের সমষ্টি দিয়ে গঠিত হয়েছে। যদি প্রমাণ করা যায় যে এই পরত-

গুলি বেডিং বা স্তরবিন্যাস নয়, একমাত্র তাহলেই এগুলিকে সম্ভেদ্ বলা চলে। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে এই গঠনটিকে বেডিং-এর থেকে আলাদা করা সম্ভব।

(ক) কোন কোন শিলায় বেডিং বা স্তরবিন্যাস স্পষ্টভাবে চেনা যায়। যদি দেখা যায় যে পরতগুলি (banding) বেডিং-এর সাথে কোনাকুনি ভাবে আছে তাহলে সহজেই এদের সম্ভেদ্ হিসাবে চেনা যাবে।

(খ) কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই পরতগুলি নিকটবর্তী শিলা-সমূহের এমন এক সমতলীয় গঠনের সঙ্গে সমান্তরাল যে গঠনটিকে নিঃসন্দেহে সম্ভেদ্ হিসাবে চেনা যায়, এক্ষেত্রে পরতগুলিকেও সম্ভেদ্ হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

(গ) অনেক সময় পরতগুলির মধ্যেই, অন্ততঃপক্ষে কোন কোন অংশে, দেখা যায় যে মণিকের চ্যাপ্টা দানাগুলি পরতগুলির সাথে সমান্তরাল হয়ে আছে।

(ঘ) কোন কোন পাললিক শিলার স্তরবিন্যাসের (bedding) স্থূলতা বা বেধ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম হয়—অর্থাৎ সরু মোটা বিভিন্ন স্তর পর পর থাকে। এইসব শিলায় রূপান্তরজাত পরতগুলিতে স্থূলতার এই ধরনের প্রভেদ অনেক অল্প হয়। বস্তুতঃ পাললিক শিলার স্তর অনেক স্থূল হতেও পারে, কিন্তু রূপান্তরজাত পরতের স্থূলতা সাধারণতঃ অল্পই (সাধারণতঃ কয়েক মিলিমিটার; কোন কোন ক্ষেত্রে দুই-এক সেণ্টি-মিটার) হয়। পক্ষান্তরে, কোন কোন পাললিক শিলার এক-একটি স্তরের স্থূলতা পাশের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত মোটামুটিভাবে একরকম থাকে। এই সব শিলায় রূপান্তরজাত পরতগুলি পাশের দিকে পাতলা লেন্স্-এর আকারে সরু হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে।

সম্ভেদের শ্রেণীবিভাগ

বলির স্তরের সাথে জ্যামিতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দু'ধরনের সম্ভেদ দেখা যেতে পারে:—

(ক) **অক্ষতলীয় সম্ভেদ** (axial-plane foliation)

(খ) **স্তরসম্ভেদ** (bedding foliation)।

অক্ষতলীয় সম্ভেদ বলির অক্ষতলের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সমান্তরাল হয়। স্তরসম্ভেদ বলিত স্তরের বেডিং-এর সমান্তরাল হয়। মনে রাখা দরকার যে, অক্ষতলীয় সম্ভেদ বলির অক্ষতলের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সমান্তরাল হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সম্ভেদ অক্ষতলের সাথে অল্প-

প্লেট্—7 : মাইকা-শিস্ট্-এর বলিত সম্ভেদের অক্ষতলের সমান্তরালে কুঞ্চন-সম্ভেদ (crenulation cleavage)। (উদয়পুর, রাজস্থান ; ডাঃ অসিতবরণ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

স্বল্প কোণ করতেও পারে। বলা বাহুল্য, যেখানে বলিবাহুতে 'সম্ভেদের প্রতিসরণ' (refraction of cleavage) দেখা যায়, সেখানে দৃঢ় এবং অদৃঢ় উভয় স্তরেই সম্ভেদতলগুলি একই সাথে বলির অক্ষতলের সঙ্গে পুরোপুরি সমান্তরাল হতে পারে না।

স্লেট্ এবং ফিলাইট্ পথের বেডিং-এর সাথে তির্যক্ ভঙ্গীতে যে সম্ভেদ থাকে তাকে অনেক সময়ে **স্লেট্-জাতীয় সম্ভেদ** (slaty cleavage) বলা হয়। সম্ভেদের জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এগুলিকে অক্ষ-তলীয় সংম্ভেদ হিসেবেই ধরা যায়।

সম্ভেদযুক্ত শিলা পুনর্বার বিরূপিত হলে সম্ভেদতলগুলি বলিত হতে পারে। সাধারণতঃ সম্ভেদতলে যে-ক্ষুদ্রায়তনের (কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক সেণ্টিমিটার) বলি দেখা যায় সেগুলিকে কুঞ্চন (crenulation) বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কুঞ্চনগুলির অক্ষতলের সাথে মোটামুটিভাবে সমান্তরালে একটি নতুন সম্ভেদের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সম্ভেদকে **কুঞ্চন-সম্ভেদ** (crenulation cleavage) বলা হয়। অর্থাৎ, একটি প্রাচীনতর সম্ভেদ কুঞ্চিত হয়ে বা ক্ষুদ্রায়তনে বলিত হয়ে, তার অক্ষতলের সমান্তরালে যে নতুন সম্ভেদের সৃষ্টি করে তাকেই কুঞ্চন-সম্ভেদ বলে। সুতরাং এক হিসেবে কুঞ্চন-সম্ভেদ এক বিশেষ ধরনের অক্ষতলীয় সম্ভেদ (প্লেট্-7)।

স্তরসম্ভেদ ও অক্ষতলীয় সম্ভেদের প্রভেদ নির্ণয়

কোন একটি উদ্ভেদে (outcrop) সম্ভেদটি স্তরসম্ভেদ না অক্ষতলীয় সম্ভেদ সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজে বোঝা যায়। কিন্তু সমনত (isoclinal) বলির বাহুতে (limb) অক্ষতলীয় সম্ভেদও স্তরের সমান্তরাল হয়, এক্ষেত্রে বলিবাহুর নিরীক্ষা থেকে বোঝা সম্ভব নয় যে গঠনটি স্তর-সম্ভেদ না অক্ষতলীয় সম্ভেদ। একমাত্র বলিগ্রন্থির নিরীক্ষা থেকেই এই প্রভেদ নির্ণয় সম্ভবপর। বলা বাহুল্য, গঠনটি স্তরসম্ভেদ হলে গ্রন্থির বাঁক বরাবর সম্ভেদটিও বাঁক নেবে (চিত্র 64-ক)। পক্ষান্তরে, অক্ষতলীয় সম্ভেদ গ্রন্থি অঞ্চলের স্তরগুলিকে আড়াআড়িভাবে কেটে চলে যাবে (চিত্র 64-খ)।

সম্ভেদের প্রতিসরণ

অক্ষতলীয় সম্ভেদ মোটামুটিভাবে বলির অক্ষতলের সমান্তরাল হলেও সব জায়গায় পুরোদস্তুর সমান্তরাল না হতেও পারে। যেখানে দৃঢ় এবং অদৃঢ় (competent and incompetent) উভয় স্তরেই সম্ভেদের সৃষ্টি
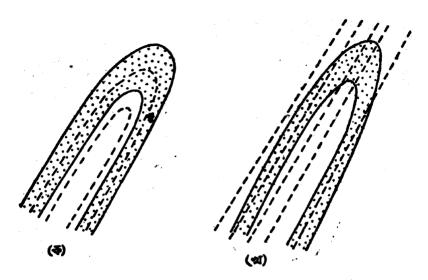
চিত্র - 64 : সমনত বলিতে স্তরসম্ভেদ ও অক্ষতলীয় সম্ভেদের পার্থক্য।

হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে স্তরের বেডিং-এর সাথে সম্ভেদের কোণ দৃঢ় স্তরে বড় এবং অদৃঢ় স্তরে ক্ষুদ্রতর (চিত্র 65-ক)। স্তরের দৃঢ়তার পরিবর্তনের সাথে সম্ভেদের ভঙ্গীর এই পরিবর্তন হওয়াকে 'সম্ভেদের প্রতিসরণ' (refraction of cleavage) বলা হয়। সাধারণতঃ এ-প্রতিসরণের ফলে (Ghosh, 1966 এবং Ramberg and Ghosh, 1968 দ্রষ্টব্য) দৃঢ়স্তরের বলির দুই বাহুর সম্ভেদতলগুলি বলির ক্রোড়ের দিকে অভিসারী (convergent) হয় এবং অদৃঢ় স্তরের সম্ভেদতলগুলি বলির উত্তল দিকে অভিসারী হয় (চিত্র 65-খ)।

বৃহদায়তন বলির জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে অক্ষতলীয় সম্ভেদের প্রয়োজনীয়তা

অক্ষতলীয় সম্ভেদের ভঙ্গী থেকে এবং স্তর ও সম্ভেদের পারস্পরিক জ্যামিতিক সম্পর্ক থেকে বৃহদায়তন বলির জ্যামিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মতো কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে (Wilson, 1946 দ্রষ্টব্য)।

(ক) বৃহদায়তন বলির অক্ষের বা অক্ষতলের ভঙ্গী সরাসরিভাবে মাপা যায় না, যদি ক্ষুদ্রায়তন বা মধ্যমায়তন বলির নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়
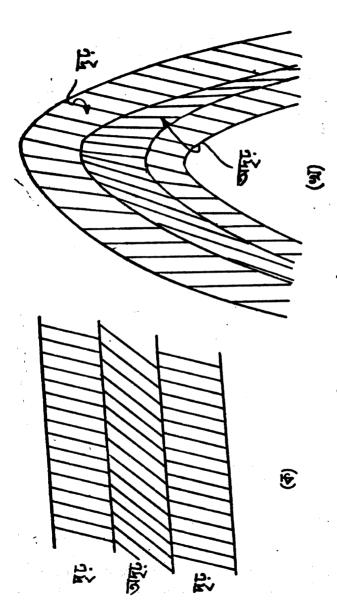
চিত্র - 65 : সম্ভেদের প্রতিসরণ।

যে কোন একটি সম্ভেদ অক্ষতলীয় সম্ভেদ, তাহলে বৃহদায়তন বলির বিভিন্ন অংশে সম্ভেদের ভঙ্গী নির্ণয় করলে তার থেকে মোটামুটিভাবে বোঝা যায় যে বৃহদায়তনের বলির অক্ষতলের ভঙ্গীটি কি রকম। অবশ্য এ পদ্ধতিটি পুরোপুরি নির্ভুল নয়, কারণ ক্ষুদ্রবলির ও বৃহৎবলির অক্ষতল যে পুরোপুরি সমান্তরাল হবে এমন নাও হতে পারে। তবে অক্ষতলের ভঙ্গী সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিশ্চয়ই এ পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভব। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অক্ষতলীয় সম্ভেদ মোটামুটি অনুভূমিক থাকলে বৃহদায়তনের গঠনটিকে শায়িত বলি (recumbent fold) হিসেবে চেনা যাবে; আবার অনুরূপভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্ভেদ উল্লম্ব হলে বৃহদায়তনের বলিকে অবশ্যই খাড়াই বলি (upright fold) হিসেবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

(খ) অক্ষতলীয় সম্ভেদ এবং বেডিং-এর ছেদরেখা বলিগ্রন্থি অথবা বলি-অক্ষের সমান্তরাল। অতএব বৃহদায়তন বলির উদ্ভেদে বিভিন্ন জায়গায় সম্ভেদ ও বেডিং-এর ছেদরেখার ভঙ্গী থেকে বৃহৎবলির অক্ষের ভঙ্গী নির্ণয় করা সম্ভব।

(গ) স্তর এবং অক্ষতলীয় সম্ভেদ যে উদ্ভেদে সমকোণে থাকে সে জায়গাটিকে সহজেই বলির গ্রন্থি হিসেবে চেনা যায়।

(ঘ) স্তরবিন্যাসের তুলনায় সম্ভেদের নতির মান বেশি হলে বোঝা যায় যে স্তরটি বলির স্বাভাবিক বাহুতে (normal limb) অবস্থিত (চিত্র 66-ক); অর্থাৎ স্তরটি বলিত হয়ে বিপর্যস্ত (overturned) হয়নি। অপর পক্ষে, স্তরবিন্যাসের তুলনায় সম্ভেদের নতির মান ক্ষুদ্রতর হলে বোঝা যাবে যে স্তরটি বিপর্যস্ত (overturned) হয়েছে (চিত্র 66-ক)। বলা বাহুল্য, অক্ষতলীয় সম্ভেদ উল্লম্ব (vertical) থাকলে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বলির কোন বাহুই বিপর্যস্ত হয়নি (চিত্র 66-খ)।

(ঙ) সম্ভেদের ওপর বেডিং-এর ছেদরেখার পিচ (pitch) মোটামুটি-ভাবে 90 ডিগ্রির মত হলে (অর্থাৎ, ছেদরেখাটি সম্ভেদের নতির দিকে থাকলে), বলিটি প্রণতবলি (reclined fold) হিসেবে চেনা যায়।

সম্ভেদের উদ্ভব

এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে শিলার রূপান্তর (metamorphism) এবং শিলার বিরূপণ (deformation) এই উভয় প্রক্রিয়ার সংযোগে সম্ভেদের সৃষ্টি হয়। প্রথমে দেখা যাক শিলাগঠনের কি ধরনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে এ-সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। শেল্ বা কাদাপাথরে

স্বাভাবিক বাহু

বিপর্যস্ত বাহু

ক)

(খ)

চিত্র-66: (ক) বিপর্যস্ত বলির স্বাভাবিক বাহুতে অক্ষতলীয় সম্ভেদের নতি বেডিং-এর নতির চেয়ে বেশী; বিপর্যস্ত বাহুতে বেডিং-এর নতি বেশী। (খ) অক্ষতলীয় সম্ভেদ উল্লম্ব হলে বলির দুটি বাহুই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে থাকে।
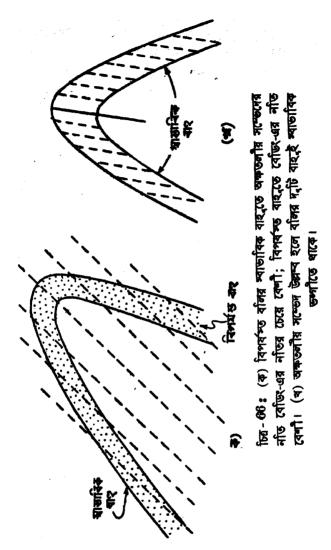
কোন সম্ভেদ্ দেখা যায় না। কিন্তু শেল্ রূপান্তরিত হয়ে যখন স্লেট্ হয় তখন তাতে সম্ভেদের সৃষ্টি হয়। আবার রূপান্তরের মাত্রা বেশি হলে শেল্ বা স্লেট্ থেকে ফিলাইট্ ও মাইকা শিস্ট্-এর উদ্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে রূপান্তরজাত মণিকের চ্যাপটা দানাগুলি সমান্তরালভাবে থেকে সম্ভেদের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ পূর্বাবস্থিত

দীর্ঘ মণিককণাগুলি নিছক ঘুরে গিয়েই সম্ভেদের সৃষ্টি করে না; রূপান্তরের সময়ে নতুন বা পুনর্জাত মণিকের দীর্ঘ দানাগুলি সমান্তরাল ভঙ্গীতে কেলাসিত (crystallized) হয়েও সম্ভেদ্ সৃষ্টি করে।

আবার অবিরূপিত (undeformed) বা স্বল্পবিরূপিত শিলায় সম্ভেদ দেখা যায় না। বিরূপণের মাত্রা বেশি হলেই শিলার অভ্যন্তরে সম্ভেদের বিকাশ হয়। অবিরূপিত ও সম্ভেদহীন শেল্‌পাথর থেকে বলিত স্লেট্ বা ফিলাইট্-এ সম্ভেদের ক্রমিক বিকাশ কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায়। উপরন্তু বলির অক্ষতলের সমান্তরালে সম্ভেদের অবস্থিতিতে বিরূপণ ও সম্ভেদসৃষ্টির কার্য-কারণ সম্পর্কই প্রমাণিত হয়।

অক্ষতলীয় সম্ভেদের উৎপত্তি সম্পর্কে দুধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে। একটি তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে শিলার অভ্যন্তরে বৃহত্তম সঙ্কোচক টানের (maximum compressive strain) সমকোণে সম্ভেদের সৃষ্টি হয় (চিত্র 67-ক)। বিকল্প তত্ত্বে বলা হয় যে সম্ভেদতলগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট স্খলনতলের (slip planes) সমান্তরাল (চিত্র 67-খ)।

সমমাত্র বিরূপণের (homogeneous deformation) ফলে একটি বৃত্ত একটি উপবৃত্তে পরিণত হয় (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বলিত শিলার অভ্যন্তরে এইরূপ একটি বিরূপণ উপবৃত্ত কল্পনা করে নেওয়া হলে, প্রথমোক্ত তত্ত্ব অনুসারে প্রস্থচ্ছেদে (cross-section) সম্ভেদ তলগুলি উপবৃত্তের পরাক্ষের (major axis) সমান্তরালে থাকবে (চিত্র 67-ক);

(ক)

(খ)
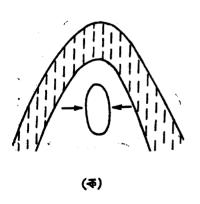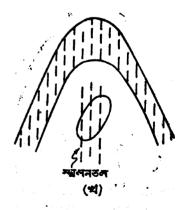
চিত্র - 67 : (ক) সম্ভেদ-সৃষ্টির একটি তত্ত্ব অনুসারে বিরূপণ-উপবৃত্তের ক্ষুদ্রতম অক্ষের সমকোণে অক্ষতলীয় সম্ভেদের সৃষ্টি হয়। (খ) বিকল্প তত্ত্বে বিরূপণ-উপবৃত্তের পরাক্ষের সাথে অক্ষতলীয় সম্ভেদ একটি কোণ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে সম্ভেদের সৃষ্টি হয় স্খলনতলের সমান্তরালে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসারে প্রস্থচ্ছেদে সম্ভেদ তলগুলি স্খলন তলগুলির সমান্তরাল হবে, এবং বিরূপণ উপবৃত্তের (deformation ellipse) পরাক্ষের সঙ্গে একটি কোণের সৃষ্টি করবে (চিত্র 67-খ)। এখন দেখা যাক শিলাগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি এই দুই বিকল্প তত্ত্বের কোন্‌টিকে কিভাবে সমর্থন করে।

(ক) অনেক অঞ্চলে সম্ভেদের সাথে বিভিন্ন কোণে অবস্থিত শিলার শিরা বা vein দেখতে পাওয়া যায়। এই শিরাগুলির উদ্ভব সম্ভেদ সৃষ্টির আগে হয়ে থাকলে এগুলিকে বিরূপিত অবস্থায় দেখা যাবে। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে শিরার বলিগুলি বাক্‌লিং-এর (buckling) ফলে সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু যে শিরাগুলি সম্ভেদকে মোটামুটিভাবে 90 ডিগ্রিতে কেটে যাচ্ছে, সেগুলিকেই সব থেকে অধিক মাত্রায় বলিত হতে দেখা যায় (প্লেট্-4, প্লেট্-5)। শিরা এবং সম্ভেদের কোণ যত ছোট হয়ে আসে, শিরার বলিত হওয়ার মাত্রাও তত কমে যায়; অর্থাৎ বলির বিস্তার ও তরঙ্গ-দৈর্ঘের অনুপাত (amplitude wavelength ratio) কমে আসে। আবার, যে শিরাগুলি সম্ভেদের সমান্তরাল বা সম্ভেদের সাথে অল্প কোণে অবস্থিত, সেগুলিতে বাক্‌লিং ফোল্ড্-এর সৃষ্টি হয় না (প্লেট্-4); পক্ষান্তরে, সেগুলিতে বুদিনাজ্ দেখা যায়।

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে সম্ভেদের সমকোণে শিলার সঙ্কোচন সবচেয়ে বেশি হয়েছে, এবং সম্ভেদের সমান্তরালে শিলার সম্প্রসারণ হয়েছে। অর্থাৎ এ বৈশিষ্ট্য সম্ভেদের উদ্ভবসম্পর্কীয় প্রথম তত্ত্বটিকেই সমর্থন করে।

(খ) সম্ভেদযুক্ত শিলায় যখন বিরূপিত উপল (deformed pebbles) পাওয়া যায়, তখন দেখা যায় যে উপলগুলি চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে (প্লেট্-10)। সাধারণতঃ এই চ্যাপ্টা উপলের ক্ষুদ্রতম অক্ষটি সম্ভেদের সমকোণে থাকে। আবার, কোন কোন লাইম্‌স্টোন্-এ মাছের ডিমের মত ছোট ছোট গোল দানা থাকে। এগুলিকে উলাইট্ (oolite) বলে। বিরূপণের ফলে দানাগুলি চ্যাপ্টা হয়ে সম্ভেদের সমান্তরাল হয়ে যায় (Cloos, 1947)। অনুরূপভাবে সম্ভেদযুক্ত শিলায় মণিকের দানা, জীবাশ্ম (fossil) ইত্যাদিকেও বিরূপিত হতে দেখা যায়। সম্ভেদযুক্ত শিলায় বিরূপিত উপল, উলাইট্ ইত্যাদির গঠনবৈশিষ্ট্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বৃহত্তম সঙ্কোচক টানের (maximum compressive strain) সমকোণে সম্ভেদের সৃষ্টি হয়।

অবশ্য শিলার অভ্যন্তরে বিরূপিত বস্তুর আকৃতি থেকে বিরূপণের

মান ও প্রধান অক্ষগুলির ভঙ্গী নির্ণয়ের পদ্ধতি দুরূহ (Ghosh and Sengupta, 1973 দ্রষ্টব্য)। প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় এ পদ্ধতির বর্ণনা অনাবশ্যক। তবে, এখানে সব থেকে সহজ পরিস্থিতিটির বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। কন্‌গ্লোমারেট্‌-এ উপলগুলির এবং উপলবিযুক্ত অংশগুলির দৃঢ়তা (competence) যদি সমান হয়, এবং উপলগুলির অবিরূপিত আকৃতি যদি গোলাকার হয়ে থাকে, তাহলে বিরূপণের পরে উপলগুলির আকৃতি হবে উপগোলকের (ellipsoid) মতো। এক্ষেত্রে বিরূপিত উপলগুলি সমগ্র কন্‌গ্লোমারেট্‌-এর বিরূপণ উপগোলকের (deformation ellipsoid) নির্দেশক হবে। সুতরাং উপলের ক্ষুদ্রতম অক্ষ সম্ভেদের সমকোণে থাকলে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাবে যে বৃহত্তম সঙ্কোচক টানের সমকোণে সম্ভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) স্খলনতলের সমান্তরালে সম্ভেদের সৃষ্টি হতে হলে বলিগুলিকে অবশ্যই স্খলনজনিত বলি (slip fold) হতে হবে। সেক্ষেত্রে বলির আকৃতি হবে সমরূপী বলির (similar fold) মতো। পুরোপুরি সমরূপী বলি সচরাচর দেখা যায় না; যে সব বলি সচরাচর আমরা দেখি সেগুলি প্রায় সবই বঙ্কণজনিত বলি (flexure fold or flexural-slip fold)।

সুতরাং ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে অন্ততঃ-পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিলার অভ্যন্তরে যেদিকে সবচেয়ে বেশি সঙ্কোচন হয়েছে তার সমকোণে সম্ভেদের সৃষ্টি হয়।

শিলাস্তরে একবার সম্ভেদের সৃষ্টি হলে সেই সম্ভেদতলে পরে স্খলন হওয়া অবশ্যই অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের স্খলন হওয়ায় স্তরবিন্যাস ঈষৎ বিচ্ছেদ দেখা যেতে পারে (প্লেট্‌-৪)।

(সম্ভেদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতগুলি আরও বিস্তারিতভাবে জানবার জন্যে Leith, 1905, 1913; Becker, 1907; Wilson, 1946; Fairbairn, 1949; Gonzalez-Bonorino, 1960; Maxwell, 1962; Turner and Weiss, 1963; এবং Dietrich, 1969 দ্রষ্টব্য।)

প্লেট্—৪ : রাজস্থানের উদয়পুর অঞ্চলে ফিলাইট্-এ অক্ষতলীয় সম্ভেদের সমান্তরালে স্খলন। স্খলনের ফলে ক্ষুদ্রায়তনের চ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলে অন্যান্য বৈশিষ্ট থেকে বোঝা যায় যে বৃহত্তম সঙ্কোচনের সমকোণে সম্ভেদটির সৃষ্টি হয়েছে। স্খলন হয়েছে সম্ভেদসৃষ্টির পরে। (ডাঃ অসিতবরণ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)
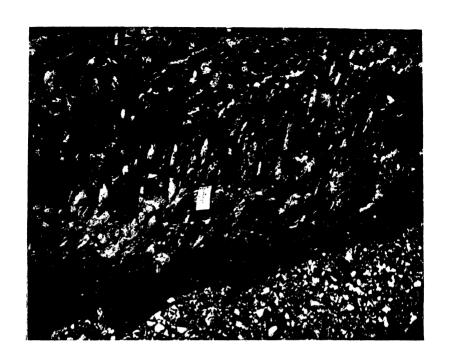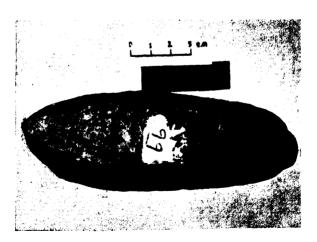
প্লেট্—10 : সিংভূম শিয়ার্ জোন্-এ (Singhbhum Shear Zone) বিরূপিত উপলের রৈখিক গঠন। নীচে উদ্ভেদ থেকে খুলে আনা একটি বিরূপিত উপলকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। (সাম্‌রাম, সিংভূম)

পরিচ্ছেদ ১৪

রৈখিক গঠন

রৈখিক গঠনের প্রকারভেদ

শিলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের রৈখিক গঠন দেখা যায় (Cloos, 1946 দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে যে গঠনগুলি ক্ষুদ্রায়তনে শিলার সর্বত্রই দেখা যায় সেগুলিকে বিশেষভাবে গঠনরেখা বা লিনিয়েশন্ (lineation) বলে। এ ছাড়াও পাথরে অন্যান্য রৈখিক গঠন থাকে যেগুলি বৃহত্তর পরিমাপে দেখা যায় অথবা যেগুলি পাথরটির কোন বিশেষ পৃষ্ঠেই সীমাবদ্ধ। এই রৈখিক গঠনগুলিকে গঠনরেখা বা লিনিয়েশন্ না বলাই বাঞ্ছনীয়।

রূপান্তরিত শিলায় নিম্নলিখিত গঠনরেখাগুলি সচরাচর দেখা যায়।

(১) মণিকরেখা (mineral lineation)

কোন কোন রূপান্তরিত শিলায় মণিকের দানাগুলি অথবা কেলাসসমূহ একদিকে দীর্ঘ হয়। এই দীর্ঘ দানাগুলি যদি শিলার অভ্যন্তরে মোটামুটিভাবে সমান্তরাল অবস্থায় থাকে তাহলে শিলাটিতে একটি রৈখিক গঠনের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৬৪-ক)। এ-গঠনটিকে মণিকরেখা বলা হয়। হর্নব্লেন্ড্ শিস্ট্-এর হর্নব্লেন্ড্-এর দীর্ঘ দানাগুলি এই রকম মণিকরেখার সৃষ্টি করে। আবার কোন কোন ফিলাইট্ বা মাইকা শিস্ট্-এর অভ্রের চ্যাপ্টা ও লম্বা দানাগুলি মোটামুটিভাবে সমান্তরালে থেকে একই সাথে সম্ভেদ এবং মণিকরেখার সৃষ্টি করতে পারে (চিত্র ৬৪-ক)। যে-শিলায় সম্ভেদ ও মণিকরেখা দুই-ই দেখা যায়, সেখানে মণিকরেখা সব সময়েই সম্ভেদের সমান্তরাল হয়।

(২) অনেকগুলি দানার দীর্ঘ গুচ্ছসমূহ (elongate clusters of grains)।

এই দীর্ঘ গুচ্ছগুলি সমান্তরালভাবে থেকে একটি রৈখিক গঠন রচনা করে। এক একটি গুচ্ছের মধ্যে দানাগুলি সমান্তরালভাবে থাকতে পারে অথবা এলোমেলো ভঙ্গীতেও থাকতে পারে (চিত্র ৬৪-গ)।

(৩) অক্ষতলীয় সম্ভেদ ও স্তরের ছেদরেখা (চিত্র ৬৪-খ)।

(৪) সাধারণ সম্ভেদ ও কুণ্ডন-সম্ভেদের ছেদরেখা।

(৫) কুঞ্চিত সম্ভেদতলে কুণ্ডনের গ্রন্থিরেখা (চিত্র ৬৪-ঘ)।
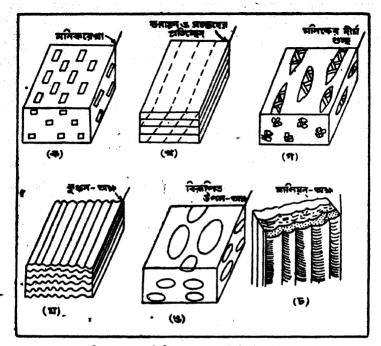
চিত্র - 68 : বিভিন্ন ধরনের রৈখিক গঠন।

(৬) বিরূপিত উপল, উলাইট্ (Oolite) বা জীবাশ্মের দীর্ঘ অক্ষসমূহ (চিত্র 68-ঙ)।

এছাড়া যে রৈখিক গঠনগুলিকে সাধারণতঃ বৃহত্তর পরিমাপে দেখা যায় অথবা কতকগুলি স্বতন্ত্র পৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ হিসেবে দেখা যায় সেগুলি হোল :—

(৭) স্তর বা সম্ভেদতলে মধ্যমায়তন বলির গ্রন্থিরেখা।

(৮) মালিয়ন্ এবং রডিং (mullions and rodding)।

কোন কোন অঞ্চলে বিরূপিত শিলার পৃষ্ঠে মসৃণ স্তম্ভাকৃতি একধরনের গঠন দেখা যায়। এগুলিকে মালিয়ন্ বলে (চিত্র 68-চ)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মালিয়ন্‌গুলি নেহাৎই ক্ষুদ্রায়তনে বা মধ্যমায়তনে বলিত স্তর বা বলিত সম্ভেদের উন্মুক্ত পৃষ্ঠ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মালিয়ন্ বলিরই নামান্তর। আবার কোন কোন অঞ্চলে একটি দৃঢ় স্তরকে আড়াআড়িভাবে সম্ভেদতল-গুলি কেটে যাওয়ার ফলে স্তরটি কতকগুলি স্বতন্ত্র, দীর্ঘ ও সমান্তরাল স্তম্ভাকার অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এগুলিকে ক্লিভেজ্ মালিয়ন্ বলে (Wilson, 1953)।

(৯) বুদিন্-অক্ষ।

বিরূপিত শিলায় ভঙ্গুর এবং সম্প্রসার্য (ductile) শিলার স্তর পর পর থাকলে অনেক সময় দেখা যায় যে ভঙ্গুর স্তরটি দীর্ঘ টুকরোতে ভেঙে গিয়েছে, এবং সম্প্রসার্য স্তরগুলি ভগ্ন অংশের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে গিয়েছে। এধরনের গঠনকে (চিত্র 63 এবং চিত্র 69-ক) বুদিনাজ্

(ক)

(খ)
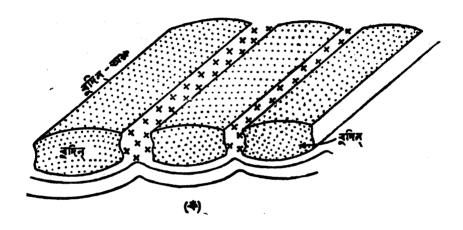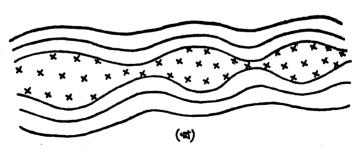
চিত্র-69: (ক) বুদিনাজ। (খ) পিন্চ্-এন্ড্-সোয়েল্ গঠনের প্রস্থচ্ছেদ।

(boudinage) বলে। বুদিনাজ্-এর অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় যে স্তর-বিন্যাসের সমান্তরালে শিলার সম্প্রসারণ হয়েছে (অথবা স্তরবিন্যাসের সমকোণে সঙ্কোচন হয়েছে)। বুদিনাজ্-এর ফলে সাধারণতঃ ভঙ্গুর স্তরটি যে খণ্ডগুলিতে বিভক্ত হয় সেগুলির প্রত্যেকটিকে এক-একটি

বুদিন্ (boudin) বলে (প্লেট্-9)। এই বুদিন্গুলির দীর্ঘ অক্ষকে বুদিন্-অক্ষ (boudin axis) বলা হয় (চিত্র 69-ক)। প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন স্তরের বুদিন্গুলির আকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। প্রস্থচ্ছেদে কোন বুদিন্-এর আকৃতি হয় আয়তক্ষেত্রের মতো, আবার কোন বুদিন্ লেন্স্-এর মতো সরু হয়ে আসে। দুটি বুদিন্-এর মাঝখানে অনেক ক্ষেত্রেই থাকে ভেইন্ কোয়ার্টস্ বা পেগ্মাটাইট্-এর পিণ্ড।

অবশ্য বুদিনাজ্-এর ফলে সব সময়েই রৈখিক গঠনের সৃষ্টি হয় না। যখন একটি ভঙ্গুর স্তর স্তরবিন্যাসের সমান্তরালে চতুর্দিকেই সম্প্রসারিত হয়, তখন স্তরটি ভেঙে গিয়ে চৌকো বা অসমান অংশে বিভক্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে বুদিন্গুলির কোন দীর্ঘ অক্ষ না থাকতেও পারে।

স্তরের সম্প্রসারণের ফলে বুদিনাজ্-এর পরিবর্তে পিঞ্চ এণ্ড্ সোয়েল্ গঠনেরও (pinch and swell structures) সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র 69-খ)। এ গঠনের সৃষ্টি হয় দৃঢ় এবং সম্প্রসার্য (competent and ductile) স্তরে। এধরনের স্তর যখন অদৃঢ় (incompetent) স্তরের সঙ্গে একসাথে থাকে তখন সম্প্রসারণের ফলে দৃঢ় স্তরটি জায়গায় জায়গায় সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় (চিত্র 69-খ)। দৃঢ় স্তরের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে এই সঙ্কীর্ণ অঞ্চলগুলি একটি রৈখিক গঠনের সৃষ্টি করতে পারে।

(১০) স্লিকেন্সাইড্

স্খলনতল (slip plane) বা চ্যুতিতলের সমান্তরালে শিলার অভ্যন্তরে যে মসৃণ ও আঁচড়-কাটা পৃষ্ঠগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে স্লিকেন্সাইড্ (slickenside) বলে। স্লিকেন্সাইড্-এর সমান্তরাল আঁচড়গুলিকে একটি রৈখিক গঠন বলা যায়।

গাঠনিক বিশ্লেষণে রৈখিক গঠনসমূহের তাৎপর্য

শিলাসম্ভেদ, স্খলনতল, সন্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন সমতলীয় গঠনগুলি যেমন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়, তেমনি বিভিন্ন রৈখিক গঠনগুলির সৃষ্টির প্রক্রিয়াও বিভিন্ন। অতএব শিলাগঠনের বিশ্লেষণে রৈখিক গঠনগুলির বিভিন্ন তাৎপর্য থাকে। যেমন, কোন একটি বিশেষ গঠন থেকে হয়তো স্খলনের দিক্ নির্ণয় করা যেতে পারে, কিন্তু সেই গঠনটি থেকে হয়তো বিরূপণের প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রৈখিক গঠন থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পেতে পারি। গাঠনিক বিশ্লেষণে এ-তথ্যগুলির মোটামুটি চার ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়।

(১) রৈখিক গঠন থেকে বৃহদায়তন বলির অক্ষের ভঙ্গী নির্ণয়

বৃহদায়তন বলির জ্যামিতি নির্ণয়ের প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তনের বলির গ্রন্থিরেখাগুলি সাধারণতঃ বৃহদায়তন বলি-অক্ষের সাথে মোটামুটিভাবে সমান্তরাল হয়। অনুরূপভাবে কুঞ্চনের অক্ষের (pucker axis) ভঙ্গী থেকে সম্ভেদের ওপর গঠিত বৃহদায়তনের বলির অক্ষের ভঙ্গী নির্দেশ করা যেতে পারে। আবার, আগেই বলা হয়েছে যে অক্ষতলীয় সম্ভেদ ও বৌডিং-এর ছেদরেখাগুলি বলি-অক্ষের সমান্তরাল হয়। মালিয়ন্ এবং রডিং-ও সাধারণতঃ বলি-অক্ষের সমান্তরাল হয়। পক্ষান্তরে মণিকরেখা, বিরূপিত উপলের দীর্ঘ অক্ষ অথবা বুদিন্-এর অক্ষগুলি বলি-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে অথবা বলি-অক্ষের সাথে সমকোণেও থাকতে পারে।

(২) রৈখিক গঠন থেকে শিলার বিরূপণের দিক্ নির্ণয়

বুদিন্-অক্ষের ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে এই অক্ষের সমকোণে স্তরের ওপর শিলার সম্প্রসারণ হয়েছে। বুদিন্গুলি বলি-অক্ষের সমান্তরাল হবে না বলি-অক্ষের সমকোণে থাকবে সেটা নির্ভর করবে বলিটির বিরূপণের প্রকৃতির ওপর। যদি বলির গ্রন্থিরেখার সমান্তরালে শিলার বৃহত্তম সাম্প্রসারণ হয়ে থাকে, তাহলে বুদিন্-অক্ষগুলি গ্রন্থি-রেখার সমকোণে থাকবে। আবার, গ্রন্থিরেখার সমকোণে সবচেয়ে বেশী সম্প্রসারণ হলে বুদিন্-অক্ষগুলি বলি-অক্ষের সমান্তরাল হবে। ,

অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে বিরূপিত উপল, উল্যাইট্ বা জীবাশ্মের দীর্ঘ অক্ষগুলির দিকে শিলার সম্প্রসারণ হয়েছে, এবং ক্ষুদ্রতম অক্ষের দিকে শিলার সঙ্কোচন হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এক্ষেত্রেও বলির গ্রন্থির সমান্তরালে বৃহত্তম সম্প্রসারণ হলেই বিরূপিত বস্তুর দীর্ঘ অক্ষগুলি বলি-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে; গ্রন্থিরেখার সমকোণে বৃহত্তম সম্প্রসারণ হলে বিরূপিত বস্তুটির দীর্ঘ অক্ষও মোটামুটিভাবে বলি-গ্রন্থির সমকোণে থাকবে।

অনেক অঞ্চলে বিরূপিত উপলের (প্লেট-10) দীর্ঘ অক্ষগুলির সাথে শিলার মণিকরেখাগুলিও মোটামুটিভাবে সমান্তরাল হয়। যেমন, বিহারের সিংভূম শিয়ার্ জোন্-এ (Dunn and Dey, 1942) দেখা যায় যে বিরূপিত উপলের দীর্ঘ অক্ষগুলির সাথে এবং প্রণত বলির (reclined fold) গ্রন্থিরেখার সাথে শিলার মণিক রেখাও সমান্তরাল। এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মণিকরেখাগুলি শিলার বৃহত্তম সম্প্রসারণের অক্ষের সমান্তরাল।

(৩) রৈখিক গঠনের ভঙ্গী থেকে শিলার সরণের (movement) দিক্ নির্ণয়

স্লিকেন্‌সাইড্‌-এর ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে এগুলির সমান্তরালে শিলার স্খলন (slip) হয়েছে। আবার ফ্লেক্সারাল্‌-স্লিপ্‌ ফোল্ড্‌-এর সৃষ্টির সময়ে একটি স্তরের ওপর আর একটি স্তর স্খলিত হওয়ার ফলে স্তরের পৃষ্ঠে আঁচড়ের সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র 61-ক)। এগুলি বক্রণজনিত স্খলনের (flexural slip) দিক্ নির্দেশ করে।

শিলাস্তরে সরণের প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্যে গাঠনিক ভূবিদ্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে a, b এবং c-এই তিনটি অক্ষকে নির্দিষ্ট করা হয়। কতকগুলি সমান্তরাল তলের ওপর স্খলন হলে, স্খলনের দিক্‌টিকে a-অক্ষ বলা হয়। b-অক্ষ থাকে স্খলনতলের ওপর a-অক্ষের সমকোণে। স্খলনতলটির সমকোণে থাকে c-অক্ষ। যে গঠনরেখাগুলি a-অক্ষের সমান্তরাল সেগুলিকে a-lineation বলা হয়। অনুরূপভাবে যে গঠনরেখা b-অক্ষের সমান্তরাল সেটিকে b-lineation বলা যেতে পারে।

(৪) অনেক অঞ্চলেই দেখা যায় যে শিলাস্তরগুলি বিভিন্ন সময়ে বিরূপিত হয়েছে, আগেকার বলির ওপর নতুন দিকে অন্য বলি আরোপিত হয়েছে, আগেকার সম্ভেদ কুঞ্চিত হয়ে নতুন সম্ভেদের সৃষ্টি করেছে, অথবা পুরনো রৈখিক গঠন দ্বিতীয়বার বিরূপণের ফলে বেঁকে গিয়েছে। উপর্যুপরি বিরূপণের ফলে শিলাগঠনে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা দেখা যায় সেগুলি সাধারণভাবে বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে যে-অঞ্চলে উপর্যুপরি বিরূপণ হয়েছে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই রৈখিক গঠনের ভঙ্গী বিশ্লেষণ করে বিরূপণের পারম্পর্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(বুদিনাজ্‌ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্যে Cloos, 1947; Ramberg, 1955; Rast, 1956; Wilson, 1961 এবং Strömgard, 1973 দ্রষ্টব্য। উপল, উলাইট্‌ ইত্যাদির বিরূপণ সম্পর্কে আরও জানবার জন্যে Cloos, 1947; Brace, 1955; Flinn, 1956; Ramsay, 1967; Hossack, 1968; Gay, 1969; Elliot, 1970; Oertel, 1970 এবং Ghosh and Sengupta, 1973 দ্রষ্টব্য। মালিয়ন্‌ সম্বন্ধে Wilson, 1953, 1961; Ramsay, 1967; Mukhopadyay, 1972 দ্রষ্টব্য।)

পরিচ্ছেদ ১৫

চ্যুতি (Faults)

চ্যুতির সংজ্ঞা ও চ্যুতিজনিত সরণ (movement)

পীড়নের (stress) মান একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে ভঙ্গুর পদার্থে ফাটলের সৃষ্টি হয়। শিলাস্তরে দু'ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে সম্প্রসারক ফাটল (tension fracture) ও ছেদক ফাটল (shear fracture)। যে ছেদক ফাটলের একপাশের শিলা (অন্যপাশের তুলনায়) ফাটলের সমান্তরালভাবে স্থানান্তরিত হয় তাকে স্রংস বা চ্যুতি বলে।

চ্যুতির নীচের শিলাস্তূপকে অধোস্তূপ অথবা ফুট্ ওয়াল (foot wall) ও ওপরের শিলাস্তূপকে উর্ধ্বস্তূপ অথবা হ্যাঙিং ওয়াল্ (hanging wall) বলে। ভূমিপৃষ্ঠে চ্যুতির উন্ভেদ বা ছেদরেখাকে চ্যুতিরেখা (fault line, fault trace) বলে (চিত্র 70)।

চ্যুতির ফলে শিলাস্তূপের সরণ (movement) দু'ধরনের হতে পারে।
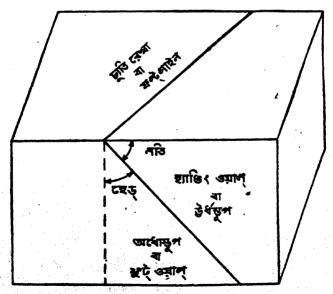
চিত্র - 70 : চ্যুতির জ্যামিতিক বর্ণনার কয়েকটি উপাদান।

নীচের অংশের তুলনায় উপরের অংশটি ঘূর্ণিত হলে চ্যুতিটিকে রোটেশনাল্ ফল্ট বা ঘূর্ণনজনিত চ্যুতি বলে (চিত্র 71)। ঘূর্ণিত না হয়ে শিলাস্তূপ সরলরেখায় স্থানান্তরিত হলে চ্যুতিটিকে ট্রান্স্লেশনাল্ ফল্ট্ বা চলনজনিত চ্যুতি বলে।
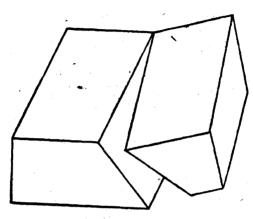
চিত্র - 71 : ঘূর্ণনজনিত চ্যুতি।

চ্যুতির ভঙ্গী তার নতি (dip) এবং নতির দিক্‌নির্দেশ দ্বারা, অথবা চ্যুতির নতি ও স্ট্রাইক্ দ্বারা নির্ণীত হয়; তবে, কোন কোন সময়ে নতি বা ডিপ্-এর পরিবর্তে নতির পূরক কোণ (complementary angle) হেড্-এর (hade) ব্যবহার করা হয় (চিত্র 70)।

ধরা যাক্, চ্যুতি সৃষ্টি হওয়ার আগে চ্যুতিতলের উভয় পার্শ্বে পরস্পরের সংলগ্ন দুটি বিন্দু ছিল। চ্যুতি সৃষ্টি হওয়ার পরে এই দুটি বিন্দু পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবে। এখন এই দুই বিন্দুর যোজক রেখাংশটিকে প্রকৃত স্খলন বা নেট্-স্লিপ্ বলা হয় (চিত্র 72)। নেট্-স্লিপ্ স্খলনের মোট পরিমাণ ও স্খলনের দিক্‌নির্দেশ করে। 72-চিত্রে PP′ রেখাটি নেট্-স্লিপ্। প্রকৃত স্খলন বা নেট্-স্লিপ্-এর বর্ণনার জন্যে স্খলনের মান এবং ভঙ্গী দুটিই নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। নেট্-স্লিপ্-এর ভঙ্গী সাধারণতঃ চ্যুতিতলের ওপর নেট্-স্লিপের পিচ্ বা রেক্ (pitch or rake) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় (পিচ্ ও রেক্ সমার্থক)।

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্-এর সমান্তরালে নেট্-স্লিপের উপাংশকে (component) স্ট্রাইক্-স্লিপ্ অথবা স্ট্রাইক্-স্খলন বলে। অনুরূপভাবে চ্যুতি-তলের ডিপ্ বা নতির সমান্তরালে নেট্-স্লিপের উপাংশকে ডিপ্-স্লিপ্
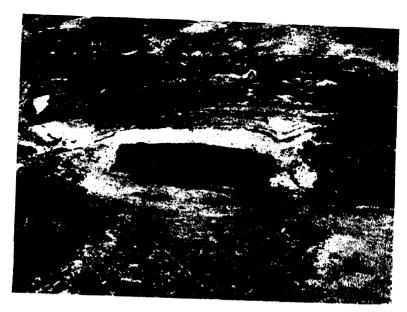
প্লেট্—9 : গ্র্যানিট্-নাইস্-এর ভেতরে এ্যাম্ফিবোলাইট্-এর বুদিন্। (জসিডি, বিহার)

প্লেট—11 : ক্যাল্ক্ নাইস্-এ মালিয়ন (mullion) ; (জাসাখেরা, উদয়পুর জেলা, রাজস্থান)

বা নতি-স্খলন বলে (চিত্র 72)। আবার নেট্-স্লিপের উল্লম্ব উপাংশকে থ্রো (throw) বলা হয় এবং ডিপ্-স্লিপের অনুভূমিক উপাংশকে হীভ্ (heave) বলা হয় (চিত্র 72)।
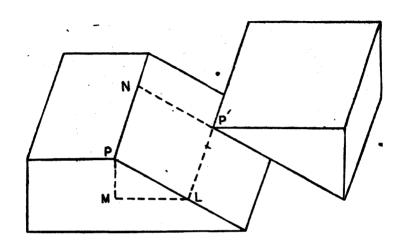
চিত্র - 72 : PP′ = নেট্-স্লিপ্; PN = স্ট্রাইক্-স্লিপ্ উপাংশ; PL = ডিপ্-স্লিপ্ উপাংশ; PM = থ্রো; ML = হীভ্।

চ্যুতির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

চ্যুতির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে।

(ক) নেট্-স্লিপের ভঙ্গীর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :—

(১) স্ট্রাইক্-স্খলন চ্যুতি (strike slip fault)

নেট্-স্লিপের ভঙ্গী অনুভূমিক হলে অর্থাৎ নেট্-স্লিপ্ চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সমান্তরাল হলে, চ্যুতিটিকে নতি-স্খলন চ্যুতি অথবা স্ট্রাইক্-স্লিপ্ চ্যুতি বলা হয় (চিত্র 73, চিত্র 74 এবং চিত্র 77)।

মানচিত্রে স্তরের বিচ্ছেদ থেকে দু'ধরনের স্ট্রাইক্-স্খলন চ্যুতির পার্থক্য করা যায়। চ্যুতিরেখার সমান্তরালে মুখ করে দাঁড়ালে, যদি ডানদিকের শিলাস্তূপ সামনে এসেছে বলে মনে হয় তাহলে চ্যুতিটিকে ডান-হাতি স্ট্রাইক্-স্খলন চ্যুতি (dextral struke-slip fault) বলা হয় (চিত্র 74-খ)। যদি মনে হয় বাঁদিকের শিলাস্তূপ সামনের দিকে সরে এসেছে তাহলে

চিত্র - 73 : অনুভূমিক স্তরে স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি।
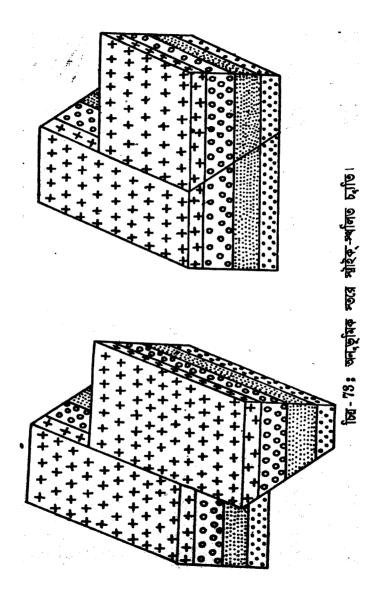
চ্যুতিটিকে বাঁ-হাতি স্ট্রাইক্-স্খলন চ্যুতি (sinistral strike-slip fault) বলা হয় (চিত্র 74-ক)।
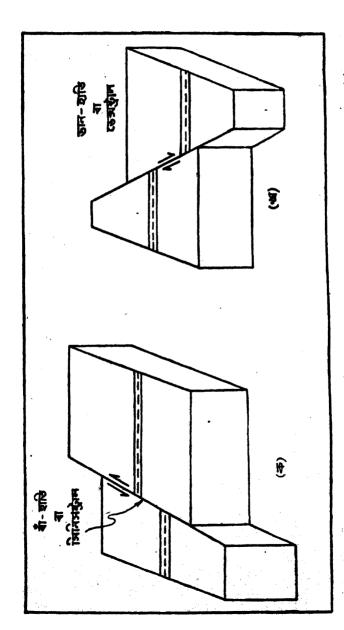
চিত্র-74: (ক) ডান-হাতি (dextral) এবং (খ) বাঁ-হাতি (sinistral) চ্যুতি। চ্যুতিরেখা স্ট্রাইকের সাথে কোণাকুণি থাকায় এগুলিকে তির্যক্ চ্যুতি বলা চলে।

(২) নতি-স্খলন চ্যুতি (dip-slip fault)

চ্যুতিতলের ওপর প্রকৃত স্খলন বা নেট্-স্লিপের পিচ্ (বা রেক্) 90° হলে চ্যুতিটিকে নতি-স্খলন চ্যুতি (dip-slip fault) বলা হয় (চিত্র 75)। অর্থাৎ, এধরনের চ্যুতিতে চ্যুতিতলের নতির দিকে প্রকৃত স্খলন হয়।

চিত্র - 75 : নতি-স্খলিত স্ট্রাইক-চ্যুতি (dip-slip strike fault)।
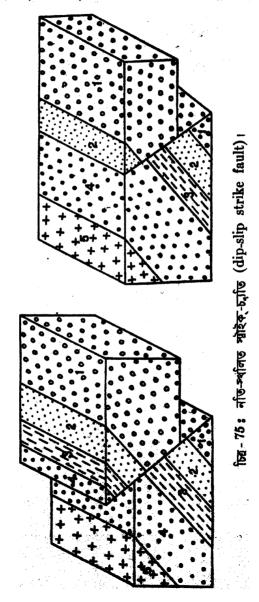
(৩) তির্যক্-স্খলন চ্যুতি (olbique-slip fault)

চ্যুতিতলের ওপর প্রকৃত স্খলনের পিচ্ 0° এবং 90°-এর মধ্যে থাকলে চ্যুতিটিকে তির্যক্-স্খলন চ্যুতি (oblique-slip fault) বলা হয় (চিত্র 72)। অর্থাৎ, এধরনের চ্যুতিতে প্রকৃত স্খলন (net-slip) স্ট্রাইক্ এবং নতি কোনটিরই সমান্তরাল হয়।

(৪) প্রতিচ্ছেদ-স্খলন চ্যুতি (trace-slip fault)

চ্যুতিতল এবং স্তরতলের ছেদরেখার সমান্তরালে নেট্-স্লিপ্ বা প্রকৃত স্খলন থাকলে চ্যুতিটিকে প্রতিচ্ছেদ-স্খলন চ্যুতি বলা হয় (চিত্র 73)।

(খ) চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সাথে স্তরবিন্যাসের স্ট্রাইক-এর কোণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

(১) স্ট্রাইক্ চ্যুতি (strike fault)

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্ স্তরসমূহের স্ট্রাইক্-এর সমান্তরাল হলে চ্যুতিটিকে স্ট্রাইক্চ্যুতি বলে (চিত্র 76)। বেডিং-চ্যুতি একটি বিশেষ ধরনের স্ট্রাইক্চ্যুতি।
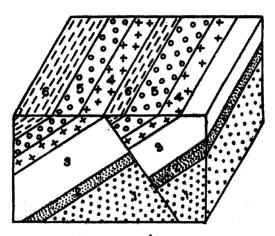
চিত্র - 76 : স্ট্রাইক-চ্যুতির ফলে স্তরের পুনরাবৃত্তি ও অবলুপ্তি। এক্ষেত্রে চ্যুতিরেখার গায়ে 5-নং স্তরটি উদ্ভেদে অবলুপ্ত হয়েছে।

(২) নতি চ্যুতি (dip fault)

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্ স্তরসমূহের স্ট্রাইকের সমকোণে থাকলে চ্যুতিটিকে নতি-চ্যুতি বলে (চিত্র 77, 78)।

চিত্র - 77 : স্ট্রাইক্-স্খলিত নতি-চ্যুতি (strike-slip dip-fault)।
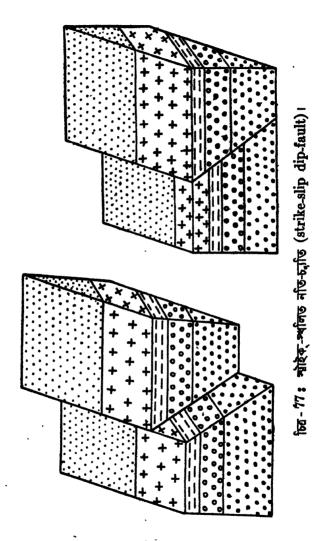
(৩) **তির্যক্ চ্যুতি** (oblique fault)

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্ স্তরসমূহের স্ট্রাইকের সাথে কোণাকুণিভাবে থাকলে চ্যুতিটিকে তির্যক্ চ্যুতি বলা হয় (চিত্র 74-খ)।

চিত্র - 78 : নতস্তরে নতি-স্খলিত নতি-চ্যুতি (dip-slip dip-fault)।
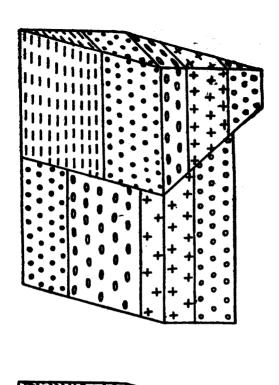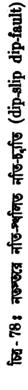
(গ) চ্যুতির স্ট্রাইকের সাথে বলির অক্ষতলীয় ছেদের (axial trace) কোণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

(১) অনুদৈর্ঘ্য চ্যুতি (longitudinal fault)

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্ বলির অক্ষতলীয় ছেদের সমান্তরাল হলে চ্যুতিটিকে অনুদৈর্ঘ্য চ্যুতি বলে (চিত্র 79-ক)।

(২) প্রস্থ-চ্যুতি (transverse fault) :

চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্ বলির অক্ষতলীয় ছেদের সাথে আড়াআড়িভাবে থাকলে চ্যুতিটিকে প্রস্থ-চ্যুতি (transverse fault) বলা হয় (চিত্র 79-খ)।

চিত্র - 79 : অনুদৈর্ঘ্য চ্যুতি ও প্রস্থচ্যুতি।

(ঘ) চ্যুতিসমষ্টির জ্যামিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগঃ
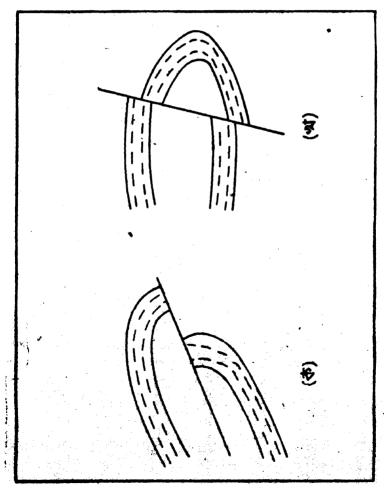
(১) সমান্তরাল চ্যুতি (parallel fault) :

কোন কোন অঞ্চলের চ্যুতিতলগুলির মোটামুটিভাবে পরস্পরের সমান্তরাল থাকলে চ্যুতিগুলিকে সমান্তরাল চ্যুতি বলা হয় (চিত্র ৪0-ক)।

(২) অরীয় চ্যুতি (radial fault) :

চ্যুতিসমূহ বিভিন্ন দিক থেকে একটি কেন্দ্রবিন্দু বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দিকে অভিসারী (convergent) হলে চ্যুতিগুলিকে অরীয় চ্যুতি বলে (চিত্র ৪0-ঘ)।
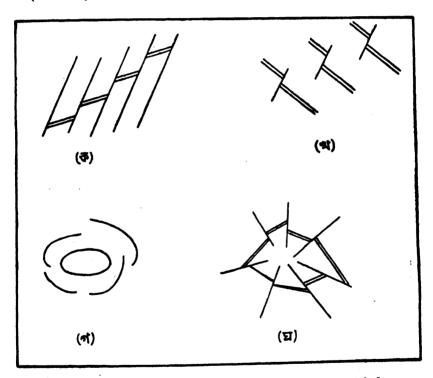
চিত্র - ৪0 : (ক) সমান্তরাল চ্যুতি, (খ) আঁনেশেলোঁ চ্যুতি (en échelon fault), (গ) পরিধি চ্যুতি, (ঘ) অরীয় চ্যুতি।

(৩) পরিধি-চ্যুতি (peripheral fault)

চ্যুতিসমূহ কোন কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চারিধারে বৃত্তের চাপের আকারে থাকলে, চ্যুতিগুলিকে পরিধি-চ্যুতি বলা হয় (চিত্র ৪0-গ)।

(৪) আঁনেশেলোঁ ফল্ট্ (en echelon fault)

চ্যুতিরেখাগুলি সমান্তরাল হলে এবং সিঁড়ির ধাপের মতো বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে চ্যুতিগুলিকে আঁনেশেলোঁ চ্যুতি বলা হয় (চিত্র 80-খ)।

(ঙ) চ্যুতিতলের নতির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

(১) উচ্চ নতির চ্যুতি (high angle fault)ঃ

চ্যুতিতলের নতির মান 45°-এর চেয়ে বেশী।

(২) নিম্ন নতির চ্যুতি (low angle fault)ঃ

চ্যুতিতলের নতির মান 45°-এর চেয়ে কম।

মানচিত্রে ও প্রস্থচ্ছেদে চ্যুতস্তরের বর্ণনা

(ক) স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি

অনুভূমিক স্তরে স্ট্রাইক্স্খলিত চ্যুতি থাকলে, চ্যুতিতলের স্ট্রাইক্ এবং নতি যা-ই হোক্ না কেন, চ্যুতিতল ও স্তরবিন্যাসের ছেদরেখা সব-সময়ই অনুভূমিক হবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ছেদরেখাটি চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সমান্তরাল হবে। তাই মানচিত্র বা প্রস্থচ্ছেদে স্তরের কোনরকম বিচ্ছেদ (separation) বা পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে না (চিত্র 73)। নতস্তরে স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি থাকলে সমভূমির মানচিত্রে স্তরের বিচ্ছেদ অবশ্যই নেট্-স্লিপের সমান হবে। তবে, এক্ষেত্রে চ্যুতিতলের উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদেও স্তরের বিচ্ছেদ দেখা যাবে (চিত্র 77)। প্রস্থচ্ছেদের এই বিচ্ছেদ থেকে যদি মনে করা হয় যে চ্যুতিতলের নতির দিকেও কিছুটা স্খলন হয়েছে তাহলে ভুল হবে। বলাবাহুল্য, স্ট্রাইক্-স্খলিত স্ট্রাইক্-চ্যুতিতে মানচিত্রে বা প্রস্থচ্ছেদে কোনরকম স্তরবিচ্ছেদ দেখা যাবে না (চিত্র 81)। সাধারণতঃ অবনত বলির স্তরে স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি থাকলে মানচিত্র এবং প্রস্থচ্ছেদ উভয়তলেই স্তরবিচ্ছেদ দেখা যাবে।

(খ) নতি-স্খলিত চ্যুতি

নতি-স্খলিত চ্যুতির স্ট্রাইকের সমকোণের প্রস্থচ্ছেদে স্তরবিচ্ছেদ দেখা যাবে এবং এই বিচ্ছেদের মান নেট্-স্লিপ্-এর সমান হবে (চিত্র 78)। নত স্তরে নতি-স্খলিত স্ট্রাইক-চ্যুতি থাকলে মানচিত্রে স্তরবিচ্ছেদের (separation of beds) পরিবর্তে চ্যুতি রেখার দু'পাশে একই স্তরের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাবে, অথবা চ্যুতিরেখার গায়ে এক বা একাধিক স্তর উদ্ভেদের পরম্পরা থেকে বাদ পড়ে যাবে (চিত্র 75)। নতিস্খলিত নতি-

চিত্র - ৪1 ঃ স্ট্রাইক্-স্খলিত স্ট্রাইক্-চ্যুতির ফলে মানচিত্র বা প্রস্থচ্ছেদে কোন স্তরবিচ্যুতি দেখা যায় না, কারণ এক্ষেত্রে চ্যুতিতল এবং স্তরের ছেদরেখার সমান্তরালে স্খলন হয়েছে।
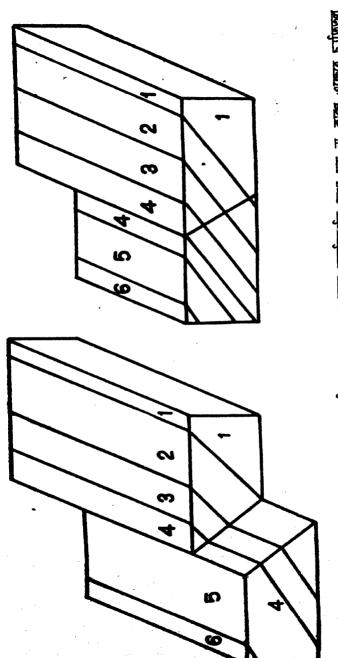
চ্যুতিতে অথবা নতিস্খলিত তির্যক্‌চ্যুতিতে সমভূমির সমান্তরালে কোনরকম স্খলন না ঘটলেও সমভূমির মানচিত্রে স্তরবিচ্ছেদ দেখা যাবে। অবনত বলির স্তরে নতিস্খলিত চ্যুতি থাকলে মানচিত্র ও প্রস্থচ্ছেদ উভয়-তলেই স্তরবিচ্ছেদ দেখা যাবে। নতিস্খলিত প্রস্থচ্যুতিতে যে পাশের শিলাস্তূপ ওপরে উঠে গিয়েছে সেইদিকের উন্ভেদে এ্যান্টিফর্মীয় বলির ক্রোড়ের প্রস্থ বৃদ্ধি পাবে এবং সিন্‌ফর্মীয় বলির ক্রোড়ের প্রস্থ হ্রাস পাবে।

(গ) তির্যক-স্খলিত চ্যুতি

বলা বাহুল্য তির্যক-স্খলিত চ্যুতির মানচিত্র এবং প্রস্থচ্ছেদ উভয়তলেই স্খলনের উপাংশ (component of slip) থাকবে। তবে মানচিত্র এবং প্রস্থচ্ছেদের স্তরবিচ্ছেদ কোনটিই নেট্‌-স্লিপের সমান হবে না। উপরন্তু তির্যক-স্খলিত চ্যুতির মানচিত্রে স্তরের বিচ্ছেদ স্খলনের বিপরীতও হতে পারে (চিত্র ৪২)। চিত্র ৪২-এ ডানদিকের শিলাস্তূপ পেছনের দিকে ও নীচের দিকে সরে গিয়েছে, কিন্তু মানচিত্রের বিচ্ছেদ থেকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বাঁদিকের শিলাস্তূপটিই পেছনের দিকে সরে গিয়েছে।

নেট্‌-স্লিপ্‌ নির্ণয়

ওপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে মানচিত্রে সমান্তরাল স্তরসমষ্টির বিচ্ছেদ থেকে নেট্‌-স্লিপ-এর মান ও ভঙ্গী নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নেট্‌-স্লিপের ভঙ্গী বিভিন্ন হলেও মানচিত্রে স্তরবিচ্ছেদ একই ধরনের হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যুতিতলের ওপরে চ্যুতির সরণজনিত দাগ বা স্লিকেন্‌-সাইড্‌ দেখা যায়। স্লিকেন্‌-সাইডের থেকে নেট্‌ স্লিপ-এর ভঙ্গী বোঝা যায়। অর্থাৎ স্লিকেন্‌-সাইড্‌-এর সমান্তরালেই চ্যুতির স্খলন হয়। স্তরের ভঙ্গী, চ্যুতিতলের ভঙ্গী, স্খলনের ভঙ্গী এবং সমভূমির মানচিত্রে স্তরবিচ্ছেদের মান জানা থাকলে নেট্‌-স্লিপের মান নির্ণয় করা সম্ভব।

স্লিকেন্‌-সাইড্‌-এর ভঙ্গী জানা না থাকলেও নেট্‌ স্লিপের ভঙ্গী ও মান নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীর একাধিক স্তর বা ডাইক্‌ থাকা প্রয়োজন। মানচিত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীর একাধিক সমতলের বিচ্ছেদ জানা থাকলে এবং সমতলগুলির ও চ্যুতিতলের ভঙ্গী জানা থাকলে নেট্‌ স্লিপ্‌-এর ভঙ্গী ও মান নির্ণয় করা সম্ভব।
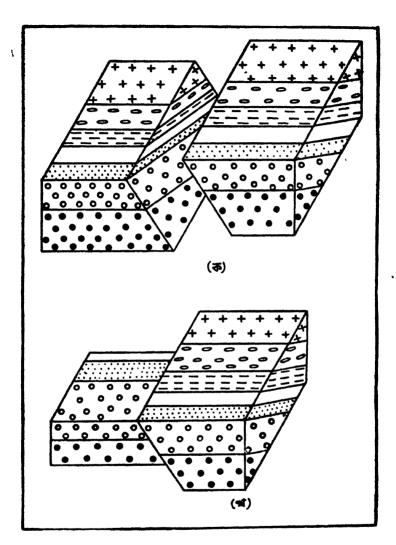
চিত্র - ৪৫ঃ তির্যক্-স্খলিত চ্যুতি।

শিলাস্তরে চ্যুতির অবস্থিতির প্রমাণ

ক্ষুদ্রায়তনে বা মধ্যমায়তনে শিলাস্তরে চ্যুতির অবস্থিতি সাধারণতঃ সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু বৃহদায়তনে চ্যুতির অবস্থিতি প্রমাণ করা সব সময় সহজ নয়। বৃহদায়তনে চ্যুতির অবস্থিতি প্রমাণ করতে হলে

অবশ্য প্রথমেই শিলাসমূহের গাঠনিক মানচিত্র রচনা করা প্রয়োজন। শিলাস্তরে চ্যুতি চেনার বিভিন্ন উপায় আছে (Billings, 1954; LéRoyetal, 1950)। চ্যুতির প্রকারভেদে চ্যুতিতলের বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন হয়। কোন কোন চ্যুতির স্খলন একটিমাত্র তলের (plane) ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কোন কোন চ্যুতির স্খলন একটি সংকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলি তলে ছড়িয়ে থাকে।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে চ্যুতির অবস্থিতি প্রমাণ করা সম্ভব:—

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চ্যুতির ফলে স্তরের বিচ্ছেদ দেখা যায়। মানচিত্র রচনার সময় এই স্তরবিচ্ছেদ থেকে চ্যুতির অবস্থিতি প্রমাণ করা যায়। ধরা যাক্, মানচিত্র রচনার সময় দেখা গেল মাইকাশিস্ট্ শিলার ভেতরে কোয়ার্ট্জাইট্-এর স্তর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্ট্রাইক্ অনুসারে প্রলম্বিত হয়েছে (চিত্র 83-খ)। A এবং B বিন্দুতে এসে দেখা গেল স্তরদুটি মাইকাশিস্ট্-এর গায়ে এসে আপাতদৃষ্টিতে শেষ হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনার কথাই মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, সত্যিই পাললিক ফেসিজ্-এর (sedimentary facies) পরিবর্তনের জন্যে কোয়ার্ট্জাইটের স্তরগুলি A এবং B বিন্দুতে এসে সরু হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, চ্যুতির ফলে স্তরদুটি অন্যত্র সরে যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে স্তরদুটি C এবং D বিন্দু থেকে পুনরায় প্রলম্বিত হয়েছে, তাহলে, চ্যুতির অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং A, C, B, D বিন্দুগুলি যোগ করে চ্যুতিরেখাটি অঙ্কন করা সম্ভব হবে। এই রেখাটি সমভূমির ওপর চ্যুতিতলের ছেদরেখা (চিত্র 83-খ)।

মানচিত্র অথবা শিলাউদ্ভেদে একটি রেখার গায়ে একই স্তরের বিচ্ছেদ দেখা গেলে চ্যুতির উপস্থিতি সহজেই প্রমাণিত হয়। নতি-চ্যুতি অথবা তির্যক চ্যুতিতে এধরনের বিচ্ছিন্নতা পাওয়া যায়। কিন্তু চ্যুতিরেখার কোন একপাশের স্তরের স্ট্রাইক্ যদি চ্যুতিতলের স্ট্রাইকের সমান্তরাল হয়, তাহলে স্তরের বিচ্ছিন্নতা থেকে চ্যুতির উপস্থিতি প্রমাণ করতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ক্রমবিচ্ছেদের (unconformity) ফলেও হতে পারে। এক্ষেত্রে বিচ্ছেদতলটি (surface of discontinuity) ক্রমবিচ্ছেদের ফলে না চ্যুতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেটা নির্ণয় করা প্রয়োজন (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(২) আগেই বলা হয়েছে যে স্ট্রাইক্-চ্যুতিতে চ্যুতিরেখার দু'পাশে একই স্তরের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যেতে পারে, অথবা চ্যুতিরেখার গায়ে এক
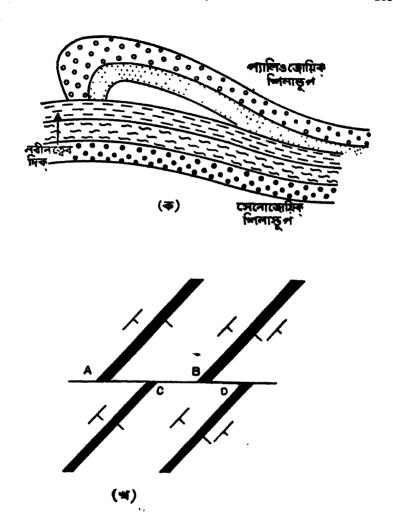
চিত্র - 43 : (ক) অধিরোপণ চ্যুতির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নবীনতর শিলাস্তূপের ওপরে প্রাচীনতর শিলা উঠে আসতে পারে। (খ) স্তরবিচ্ছেদ থেকে চ্যুতিরেখা অঙ্কন।

বা একাধিক স্তর উন্মেদের স্তরপরম্পরা থেকে বাদ পড়তে পারে। এই পুনরাবৃত্তি ও স্তরের বাদ যাওয়া থেকেও চ্যুতির অবস্থিতি প্রমাণিত হতে পারে। তবে, এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ বলি থাকার জন্যেও স্তরের পুনরাবৃত্তি হতে পারে; আবার কোন বিশেষ

স্তর ক্রমবিচ্ছেদের জন্যে স্তরপরম্পরা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। সমভূমিতে একটি রেখার দু'ধারের স্তরের পুনরাবৃত্তি যখন বলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না (চিত্র 76), সেক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিটি একমাত্র চ্যুতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই সম্ভব। 47-ক চিত্রে 1 নং স্তরের দু'পাশে 2 এবং 3 নং স্তরের প্রতিসম (symmetrical) পুনরাবৃত্তি বলির জন্য হয়েছে, কিন্তু 76 চিত্রে 4, 5, 6 নং স্তরের অপ্রতিসম (asymmetrical) পুনরাবৃত্তি একমাত্র চ্যুতির ফলেই সম্ভব।

(৩) আগেই বলা হয়েছে কোন কোন চ্যুতির স্খলন একটিমাত্র তলে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি সংকীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অনেকগুলি সমান্তরাল তলে ছড়িয়ে থাকে। সাধারণতঃ ভূত্বকের গভীরাঞ্চলে শিলাস্তূপ স্খলিত হলে এই ধরনের চ্যুতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে চ্যুত অঞ্চলটি জুড়ে মাইলোনাইট্ (mylonite) নামে একধরনের শিলা পাওয়া যেতে পারে। মাইলোনাইট্-এর অবস্থিতি থেকে চ্যুতি চেনা যায়। চ্যুতির ফলে শিলার দানাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়ে একদিকে প্রলম্বিত হয় এবং শিলা সম্ভেদের মত এক ধরনের গঠনের সৃষ্টি করে। সেই বিশেষ ধরনের শিলাকে মাইলোনাইট্ বলে। তবে, চ্যুতির ফলে সব সময় মাইলোনাইট্-এর সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ অধিকাংশ চ্যুতিতলে মাইলোনাইট্ পাওয়া যায় না।

(৪) চ্যুতির ফলে শিলার দানা (grain) বা মণিকের (mineral) সমষ্টিগুলি ভেঙে গিয়ে মাইলোনাইটের পরিবর্তে অন্য ধরনের গঠনও দিতে পারে। ফল্ট্ ব্রেক্শিয়ার (fauit breccia) উপস্থিতি থেকেও চ্যুতি চেনা যেতে পারে। মাইলোনাইটের মত ফল্ট্ ব্রেক্শিয়াতেও শিলার অন্তঃস্থ মণিকসমষ্টিকে চূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে মাইলোনাইটের মত ফল্ট্ ব্রেক্শিয়ার চূর্ণসমষ্টিগুলি একদিকে প্রলম্বিত থাকে না বা সম্ভেদ-জাতীয় গঠনের সৃষ্টি করে না। ফল্ট্ ব্রেক্শিয়ার মণিকসমষ্টির বিচূর্ণ অংশগুলির গঠন কিছুটা কোণাচে (angular) হয়। অনেক সময়ে ফল্ট্ ব্রেক্শিয়ার বিচূর্ণিত অংশে ভেইন্ কোয়ার্ট্জ্ (vein quartz) বা অন্য কোন মণিকের শিরা বা পিণ্ড দেখা যায়।

কোন কোন চ্যুতিতলে গুঁড়িয়ে যাওয়া শিলাগুলি শুকনো কাদার মতো দেখতে হয়, এদের বলা হয় গুজ্ (gauge)। মাইলোনাইট্ বা ফল্ট্ ব্রেক্শিয়ার চেয়ে গুজ্-এর সংহতি (coherence) অনেক কম।

(৫) একটি শিলাস্তূপ অন্য একটি শিলাস্তূপের ওপর স্খলিত হওয়ার সময় ঘর্ষণের ফলে চ্যুতিতলটিতে আঁচড়ের মতো সরু সরু

সমান্তরাল দাগের সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের মসৃণ, আঁচড় কাটা চ্যুতিতলকে স্লিকেন্‌সাইড্‌ (slickenside) বলে। স্লিকেন্‌সাইড্‌ থেকে শুধু চ্যুতির অবস্থিতিই প্রমাণিত হয় না, আঁচড়গুলির ভঙ্গী থেকে স্খলনের ভঙ্গীও নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যেমন, স্লিকেন্‌সাইডের আঁচড়-গুলি অনুভূমিক হলে বোঝা যায় যে চ্যুতিটি স্ট্রাইক্‌-স্লিপ্‌ চ্যুতি।

(৬) ভঙ্গিল পর্বতমালার গঠনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই একটি শিলা-স্তূপ অন্য শিলার ওপর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত স্খলিত হয়। এ ধরনের চ্যুতিকে ওভারথ্রাস্ট্‌ ফল্ট্‌ অথবা অধিরোপণ চ্যুতি বলে। অনেক সময়েই এই চ্যুতিগুলির তলে মাইলোনাইট্‌, ব্রেক্‌শিয়া বা স্লিকেন্‌সাইড্‌ পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবীন শিলাস্তূপের ওপর প্রাচীনতর শিলার অবস্থান থেকে ওভারথ্রাস্ট্‌-এর উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। অবশ্য একটি ক্রমবিচ্ছেদের তল পুরোপুরি উলটিয়ে গিয়েও এ ধরনের গঠন সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং শিলাস্তূপ দুটির বিচ্ছেদ তলটি (surface of separation) আন্‌কন্‌ফর্মিটি বা ক্রমবিচ্ছেদ নয় এমন প্রমাণ থাকলেই তলটিকে চ্যুতিতল হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে। উদাহরণতঃ, 43-ক চিত্রের বিচ্ছেদ তলটি একমাত্র চ্যুতির ফলেই সৃষ্টি হতে পারে, কারণ সেনোজোয়িক্‌ শিলাস্তরের কারেণ্ট্‌ বেডিং থেকে বোঝা যায় যে সেনোজোয়িক্‌ ও প্যালিওজোয়িক্‌ শিলার বিচ্ছেদ তলটি উলটিয়ে যায় নি। অবশ্য, মনে রাখা দরকার যে ওভারথ্রাস্ট্‌ ফল্ট্‌ মাত্রেই যে নবীন শিলার ওপর প্রাচীন শিলার অবস্থান হয় এমন কোন কথা নেই।

(৭) যখন সমুদ্রতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্তরীভূত শিলার সৃষ্টি হতে থাকে, তখন অনেক সময়েই দেখা যায় যে সব জায়গায় একধরনের পলি পড়ছে না। একই সময়ে সমুদ্রতলের বিভিন্ন ধরনের পাললিক শিলার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে বলা হয় যে পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের পাললিক শিলাগুলি বিভিন্ন পাললিক ফেসিজ্‌-এর (facies) অন্তর্গত। ওভারথ্রাস্ট্‌ ফল্ট্‌-এর ফলে বহুদূরের, এবং পুরোপুরি আলাদা ফেসিজ্‌-এর, সমকালীন শিলাস্তরগুলি পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। সমকালীন শিলাস্তরের পাললিক ফেসিজ্‌গুলির এই ধরনের অস্বাভাবিক সংস্থান থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যুতির (বিশেষ করে ওভারথ্রাস্ট-এর) উপস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে।

(৮) স্তরের বিচ্ছিন্নতা, স্তরের অবলুপ্তি, অথবা চ্যুতিতলে মাই-লোনাইট্‌, স্লিকেন্‌সাইড্‌ ইত্যাদি ক্ষুদ্রায়তন গঠনসমূহের উপ-স্থিতি থেকে সরাসরিভাবে চ্যুতির অবস্থিতি প্রমাণিত হলেও, সবক্ষেত্রে

এ ধরনের সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, কোন কোন অঞ্চলে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলি থেকে পরোক্ষভাবে স্তরের স্খলন প্রমাণ অথবা অনুমান করা সম্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর না করে একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের সাহায্যে নেওয়াই শ্রেয়।

কোন কোন অঞ্চলের চ্যুতিতলে ও সংলগ্ন শিলাস্তরে সিলিসিফিকেশন্ (silicification) হয় অথবা চ্যুত অঞ্চল জুড়ে মিনারেলিজেশন্ (mineralization) দেখা যায়। আবার কোথাও চ্যুতি রেখার গায়ে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। চ্যুতি ছাড়াও এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হতে পারে। তবে কোন অঞ্চলে এ ধরনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় থাকলে চ্যুতির উপস্থিতি অনুমান করা যেতে পারে।

কখনও দেখা যেতে পারে যে ভঙ্গিল পর্বতমালার পাদদেশে নবীন পলিগঠিত সমভূমি একটি পরিষ্কার রেখায় পর্বতমালাটিকে তির্যক্‌ভাবে কেটে গিয়েছে। অর্থাৎ, পর্বতমালার বলির ট্রেন্ড্ অথবা স্তরের স্ট্রাইক্-গুলি কোনাকুনিভাবে সমভূমির গায়ে এসে মিশেছে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ পর্বতমালার পাদদেশে চ্যুতির ফলে সৃষ্টি হয়।

মহাসমুদ্রের তলদেশে যে মগ্ন শৈলশিরা (ridges) থাকে সেগুলির মানচিত্র গঠনের সময় প্রায়ই দেখা যায় যে, শৈলশিরাগুলি মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে সরে গিয়েছে। এখানে স্তরবিচ্ছেদ দেখা না গেলেও শৈলশিলার বিচ্ছেদ থেকে চ্যুতির অবস্থিতি অনুমান করা সম্ভব। স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতির (strike-slip fault) ফলে স্থলভূমির নদীর গতিপথেও এ ধরনের বিচ্ছেদ দেখা যেতে পারে।

কোন কোন অঞ্চলে চ্যুতিরেখার ওপর ভূমিরূপের বা ভূসংস্থানের (topography) এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেগুলি চ্যুতির অবস্থিতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণতঃ চ্যুতিরেখার গায়ে কোন কোন অঞ্চলে ঋজু এবং খাড়াই ঢাল (slope) সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ ধরনের ঢালকে স্কার্প্ (scarp) বলে। বিভিন্ন ভাবে স্কার্প্-এর সৃষ্টি হতে পারে। চ্যুতির ফলে একদিকের জমি ওপরে বা নীচে নেমে গেলে চ্যুতি-তলটি ভূপৃষ্ঠে স্কার্প্ হিসাবে দেখা যেতে পারে। এ ধরনের স্কার্প্-কে ফল্ট্-স্কার্প্ বলা হয়। আবার চ্যুতির ফলে চ্যুতিরেখার দু'পাশের শিলাস্তর অসমানভাবে ক্ষয়ে গিয়েও স্কার্পের সৃষ্টি করতে পারে। চ্যুতির ফলে যে স্তরবিন্যাস হয় তা'তে চ্যুতিরেখার দুপাশে বিভিন্ন প্রকৃতির স্তরের সমাবেশ হতে পারে, এবং সেইজন্য চ্যুতিরেখার দুপাশে ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় বিভিন্ন পরিমাণে হতে পারে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে চ্যুতির ফলে ভূপৃষ্ঠ উঠে বা নেমে গিয়ে স্কার্প এর সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু চ্যুতির অবস্থিতির

জন্যেই চ্যুতিরেখার দু'পাশে অসমান ক্ষয় সম্ভব হয়েছে এবং স্কার্প্-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের স্কার্প্-কে ফল্ট্-লাইন্ স্কার্প্ বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যুতির ফলে চ্যুতিরেখার দু'পাশের ভূমি অসমানভাবে উঠে বা নেমে গিয়েছে, আবার চ্যুতির ফলে চ্যুতিরেখার দু'পাশের ভূমির ক্ষয়ও অসমান হয়েছে। এই ধরনের স্কার্প্-কে কম্পোসিট্ স্কার্প্ (composite scarp) বলা হয় (Billings, 1954)।

মনে রাখা দরকার যে চ্যুতির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত না থেকেও স্কার্প্-এর সৃষ্টি হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে ফিলাইট্ বা স্লেট্-পাথরের খাড়াই শিলাসম্ভেদের (rock cleavage) সমান্তরালে ধস্ নেমেও স্কার্প্-এর সৃষ্টি হতে পারে। অথবা, ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রের খাড়াই পাথুরে তটভূমি স্কার্প্-এর রূপ নিতে পারে। সুতরাং স্কার্প্ থাকলেই চ্যুতি প্রমাণিত হয় না। চ্যুতির প্রমাণের জন্য স্কার্প্-এর সাথে চ্যুতির অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্যও থাকা প্রয়োজন।

অধিকাংশ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ওপরে ভূমিরূপ বা ভূসংস্থান (topography) বহুলাংশেই শিলায় গঠন দ্বারা নির্ণীত হয়। কোন গাঠনিক মানচিত্রের সাথে সেই অঞ্চলের আকাশ চিত্রের (aerial photograph) তুলনা করলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভূমির আকৃতি যেমন কোথাও বলি বা ফোল্ড্-এর দ্বারা প্রভাবিত তেমনি কোথাও আবার চ্যুতির দ্বারা প্রভাবিত। আকাশচিত্রে ভূসংস্থানের বৈশিষ্ট্য থেকে চ্যুতির অবস্থিতি সরাসরিভাবে প্রমাণিত না হলেও গাঠনিক মানচিত্রে চ্যুতিরেখা অঙ্কন অনেক সহজ ও দ্রুত হয়। উদাহরণতঃ ধরা যাক, আকাশচিত্রে ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য থেকে কোন একটি দীর্ঘরেখা বরাবর চ্যুতি হয়েছে এরকম সন্দেহ করা হল। এখন, যদি শিলা উদ্ভেদ (outcrop) পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে এই রেখার একাধিক বিন্দুতে রেখাটির সমান্তরালে চ্যুতি হওয়ার অন্য প্রমাণও আছে তাহলে আকাশচিত্রের সমগ্র দীর্ঘরেখাটিকেই চ্যুতিরেখা হিসাবে মানচিত্রে অঙ্কন করা অনেক দ্রুত এবং সহজ হবে।

চ্যুতির উৎপত্তি এবং শ্রেণীবিভাগ

কোন কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গাঠনিক মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে চ্যুতিরেখাগুলি মোটামুটিভাবে সমান্তরাল আছে। আবার সবগুলি চ্যুতিরেখা সমান্তরাল না হলেও সেগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যে গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে চ্যুতিরেখা-

গুলি মোটামুটিভাবে সমান্তরাল। যেমন, স্কট্ল্যান্ড্-এর হাইল্যান্ড্ অঞ্চলে বহুসংখ্যক চ্যুতির স্ট্রাইক্ সমান্তরাল দেখা যায়। এখানকার মানচিত্রে উত্তর-পূর্বগামী গ্রেট্ গ্লেন্ ফল্ট্, সাদার্ন আপ্ল্যান্ড্ ফল্ট্ প্রভৃতি সবগুলিই সমান্তরাল।

এই ধরনের সমান্তরাল চ্যুতিগোষ্ঠীর উপস্থিতি থেকে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে কিভাবে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমান্তরাল চ্যুতিগুলির সৃষ্টি হল। আমরা জানি যে ভঙ্গুর পদার্থে পীড়নের মান একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে পদার্থটিতে ফাটলের সৃষ্টি হয়। আবার ছেদক ফাটলগুলি (shear fracture) পীড়নের অক্ষগুলির সাথে নির্দিষ্ট কোণ সৃষ্টি করে। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যে-অঞ্চলটিতে একটি সমান্তরাল চ্যুতিগোষ্ঠী (fault system) আছে সেখানে ভূত্বকের অন্তঃস্থ পীড়নের দিক্ও মোটামুটিভাবে সমান ছিল। ভূত্বকের কোন কোন অঞ্চলের চ্যুতিগুলির মধ্যে এই ধরনের সরল সম্পর্ক থাকার ফলে ভূত্বকে চ্যুতির সৃষ্টি সম্পর্কে তত্ত্ব রচনাও সহজ হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের তত্ত্ব রচনায় কিছু কিছু অনুমানের ওপরও নির্ভর করতে হয়েছে। যেমন ই. এম্. এ্যান্ডারসন্ (Anderson, 1951) রচিত তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভূত্বকে পীড়নের তিনটি অক্ষের মধ্যে যে কোন একটি উল্লম্ব (vertical) হবে। বাকী দু'টি অক্ষ স্বভাবতই অনুভূমিক হবে। (এই অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে যে ভূপৃষ্ঠের ওপরে কোন ছেদক পীড়ন নেই; অতএব এই পৃষ্ঠের সমান্তরালে পীড়নের দু'টি প্রধান অক্ষ থাকবে। সুতরাং তৃতীয় অক্ষটি অবশ্যই উল্লম্ব হবে)।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অল্প নীচে কোন বস্তু থাকলে বস্তুটির ওপর সর্বদিক থেকে সমান চাপ পড়ে না। বস্তুটির ওপরে উল্লম্ব দিকে অবশ্যই উপরিস্থিত শিলার ওজনের ফলে চাপ পড়ে; কিন্তু পাশের শিলার চাপ খুব সামান্যই থাকে। এইজন্যে মাটিতে অগভীর গর্ত খুঁড়লে গর্তটি পাশের মাটির চাপে বুজে যায় না। কিন্তু যদি খুব গভীর গর্ত বা রন্ধ্র খোঁড়া হয়, তাহলে পাশের মাটি বা পাথরের চাপে গর্তটি বুজে যায়। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে যত গভীরে যাওয়া যায়, পাশের দিকের চাপ—অর্থাৎ অনুভূমিক পীড়ন তত বেশী হয়। মনে করা যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা গভীরে পাশের চাপ এবং ওপরের চাপ (অর্থাৎ উল্লম্ব এবং অনুভূমিক পীড়ন) সমান সমান হয়ে যায়, যেমন তরল পদার্থের ভেতরে চারদিকের চাপই সমান থাকে। ভূত্বকের ক্ষেত্রে এটা অবশ্য একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি। ভূত্বকে এরকম পরিস্থিতি সর্বত্র না থাকতেও পারে। তবে

ভূত্বকের অভ্যন্তরে এইরকম একটি আদর্শ পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে নিলে, সেই পরিস্থিতি থেকে বস্তুতঃ কোথায় কতটা পার্থক্য হল সেটা প্রকাশ করার সুবিধা হয়। এ্যান্ডারসন্ এই আদর্শ অবস্থাটিকে স্ট্যান্ডার্ড্ স্টেট্ (standard state) বলেছেন। এখন এই স্ট্যান্ডার্ড্ স্টেট্ থেকে তিন ধরনের পার্থক্য হতে পারে। (আগেই বলা হয়েছে যে এ্যান্ডারসন্ ধরে নিয়েছেন যে পীড়নের একটি অক্ষ উল্লম্ব অপর দু'টি অনুভূমিক।)

(১) স্ট্যান্ডার্ড্ স্টেট্-এর তুলনায় সকল অনুভূমিক দিকেই চাপ বাড়তে পারে।

(২) একটি অনুভূমিক দিকে চাপ বাড়তে পারে ও অপর অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরালে চাপ কমতে পারে।

(৩) সকল অনুভূমিক দিকেই চাপ কমতে পারে।

এই তিনটি পরিস্থিতির যে কোনটিতেই বৃহত্তম প্রধান পীড়ন (greatest principal stress) একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে ভঙ্গুর পদার্থে ফাটলের সৃষ্টি হবে। যদি বৃহত্তম প্রধান পীড়নের অক্ষকে σ_1, অন্তঃস্থ (intermediate) প্রধান পীড়নের অক্ষকে σ_2, এবং ক্ষুদ্রতম অক্ষকে σ_3 বলা হয় (চিত্র 84) তাহলে ছেদক ফাটলগুলি σ_2-এর সমান্তরাল হবে এবং σ_1-এর সাথে প্রায় 30° কোণ করবে। তাছাড়া চ্যুতির সরণ (movement) σ_2-এর সমকোণে হবে।

এখন, প্রথম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পীড়নের দু'টি অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরালে চাপের বৃদ্ধি হলেও সাধারণতঃ একদিকের পীড়ন অন্য-দিকটির চেয়ে বেশী হয়। সুতরাং, σ_1 এবং σ_2 অক্ষ দু'টি অনুভূমিক এবং σ_3 উল্লম্ব থাকবে। সুতরাং প্রথম পরিস্থিতিতে ছেদক ফাটলগুলির নতি মোটামুটিভাবে 30°-এর মতো হবে এবং অধোস্তূপ বা ফুট্-ওয়ালের তুলনায় ঊর্ধস্তূপ বা হ্যাঙিং-ওয়াল ওপরের দিকে স্খলিত হবে (চিত্র 84-ক)। অর্থাৎ প্রথম পরিস্থিতিতে অল্প নতি-যুক্ত থ্রাস্ট্ ফল্ট্-এর সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয় পরিস্থিতিটিতে σ_1 এবং σ_3 অক্ষদু'টি অনুভূমিক হবে এবং σ_2 উল্লম্ব হবে। আগেই বলা হয়েছে যে চ্যুতিগুলি সবসময়েই অন্তঃস্থ অক্ষ σ_2-এর সমান্তরাল হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে চ্যুতিতলগুলি উল্লম্ব হবে এবং চ্যুতির সরণ অনুভূমিক হবে (চিত্র 84-খ)। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে উল্লম্ব স্ট্রাইক্ স্লিপ্ চ্যুতি বা রেঞ্চ্ ফল্ট্-এর (wrench fault) সৃষ্টি হবে।

তৃতীয় পরিস্থিতিটিতে স্ট্যান্ডার্ড্-স্টেট্ থেকে সকল অনুভূমিক
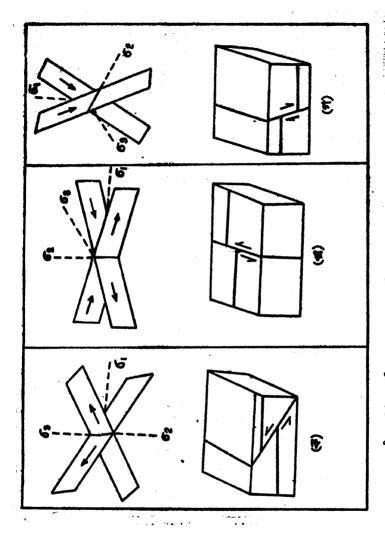
চিত্র - 84ঃ পীড়নের অক্ষের ভঙ্গীর তারতম্য অনুসারে (ক) থ্রাস্ট্ ফল্ট্, (খ) রেঞ্চ্ ফল্ট্ এবং (গ) গ্র্যাভিটি ফল্ট্-এর উৎপত্তি।

দিকে চাপ কমে যাওয়ার জন্যে অভিকর্ষের ফলে বৃহত্তম পীড়নের অক্ষটি σ_1 উল্লম্ব হবে। σ_2 এবং σ_3 অক্ষদুটি অনুভূমিক থাকবে। এক্ষেত্রে চ্যুতিগুলির নতি প্রায় 60° হবে এবং অধোস্তূপের তুলনায় ঊর্ধস্তূপ নীচের দিকে নামবে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিস্থিতিটিতে উচ্চ নতির গ্র্যাভিটি ফল্ট্-এর সৃষ্টি হবে (চিত্র 84-গ)।

এ্যান্ডারসনের তত্ত্ব থেকে দেখা যায় (Anderson, 1951) প্রধানতঃ তিন-ধরনের চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে, যথা থ্রাস্ট্ ফল্ট্, স্ট্রাইক্-স্লিপ্ ফল্ট্ (বা স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি) এবং গ্র্যাভিটি ফল্ট্। এগুলির মধ্যে তত্ত্ব অনুসারে থ্রাস্ট্-ফল্ট্গুলির নতি অল্প হবে, গ্র্যাভিটি ফল্ট্-এর নতি বেশী হবে (প্রায় 60°) এবং স্ট্রাইক্ স্লিপ্ ফল্ট্গুলি উল্লম্ব হবে।

এখন দেখা যাক্ ভূপৃষ্ঠে যে বিভিন্ন ধরনের চ্যুতি দেখা যায় সেগুলির ভঙ্গী এ্যান্ডারসনের তত্ত্বকে কতটা সমর্থন করে। প্রথমেই বলে নেওয়া যায় যে ভূপৃষ্ঠে বহু সংখ্যক চ্যুতির ভঙ্গীই এ্যান্ডারসনের তত্ত্বকে সমর্থন করে। গ্রেট্ ব্রিটেন্-এর প্রধান প্রধান চ্যুতির ভঙ্গী সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এ্যান্ডারসন্ নিজেই দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ থ্রাস্ট্ফল্ট্-এর নতি অল্প হয়, অধিকাংশ গ্র্যাভিটি ফল্ট্-এর নতির মান উচ্চ হয় এবং অধিকাংশ স্ট্রাইক্-স্লিপ্ ফল্ট্-এর ভঙ্গী উল্লম্ব হয়। অনুরূপভাবে সি. কে. লাইথ (Leith, 1913) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র থেকে দেখিয়েছেন যে থ্রাস্ট্ ফল্ট্ বা রিভার্স ফল্ট্-এর (reverse fault) নতির গড় মান 36° এবং গ্র্যাভিটি ফল্ট্ বা নরমাল্ ফল্ট্-এর (normal fault) নতির গড় মান 78°। আবার, নেদারল্যান্ড্-এর কোন এক বিশেষ শিলা গোষ্ঠীর চ্যুতিগুলির ভঙ্গী মেপে স্যাক্স্ (Sax) দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ নরমাল্ ফল্ট্-এর নতি 68°-এর কাছা-কাছি এবং অধিকাংশ রিভার্স্ ফল্ট্এর নতি 22°-এর কাছাকাছি। অন্য-ভাবে, পরীক্ষাগারে কাদার স্তরে কৃত্রিমভাবে চ্যুতি সৃষ্টি করে হান্স্ ক্লুস্ (Hans Cloos) দেখিয়েছেন যে গ্র্যাভিটি ফল্ট্গুলির নতির মান 50°-এর মতন হয়। এছাড়া বালির স্তরের মধ্যে এম্. কে. হুবার্ট্ (M. K. Hubbert, 1951) চ্যুতি সৃষ্টির যে পরীক্ষা করেন তার থেকে দেখা যায় যে থ্রাস্ট্ ফল্ট্গুলির নতির মান গড়ে 25° এবং গ্র্যাভিটি ফল্ট্গুলির নতির মান গড়ে 61°। মোটামুটিভাবে এই তথ্যগুলি এ্যান্ডারসনের তত্ত্বকে সমর্থন করে।

এ্যান্ডারসনের তত্ত্ব বহুসংখ্যক চ্যুতির ভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করলেও সব-জায়গার চ্যুতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। অর্থাৎ, এই তত্ত্বটি মোটামুটি-ভাবে ঠিক হলেও এর ব্যতিক্রমের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এ্যান্ডারসনের তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে একটি প্রধান পীড়নের অক্ষ উল্লম্ব থাকবে, বাকী দু'টি অনুভূমিক হবে। কিন্তু যেখানে এই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম হবে সেখানে আর এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করা যাবে না। বিকল্প তত্ত্বে ধরে নেওয়া যায় যে পীড়নের একটি মাত্র প্রধান অক্ষ অনুভূমিক হবে এবং

বাকী অক্ষ দু'টির কোনটিই অনুভূমিক বা উল্লম্ব না-ও হতে পারে। উপরন্তু, উল্লম্ব বা অনুভূমিক দিকে পীড়নের মান ক্রমে ক্রমে কমে বা বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে পীড়নের অক্ষগুলির ভঙ্গীও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং কোন একটি বিশেষ চ্যুতিতলের ভঙ্গীরও ক্রমিক পরিবর্তন হতে পারে। হাফ্‌নার (Hafner, 1951) রচিত এই বিকল্প তত্ত্বে পীড়নের অক্ষের ভঙ্গী অনুসারে থ্রাস্ট্ ফল্ট্-এর নতির মান অল্প বা বেশী দুইই হতে পারে। আবার কোন কোন অঞ্চলে যে বক্র-চ্যুতিতল দেখা যায়, এই বিকল্প তত্ত্বে তার ব্যাখ্যাও সম্ভব।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই তত্ত্বগুলিতে পীড়নের প্রধান অক্ষের (principal axis of stress) সাথে চ্যুতির ভঙ্গীর কথা বলা হলেও, ভূত্বকে পীড়নের বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি কেন হয় এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

এ্যাণ্ডারসনের তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় যে মোটামুটিভাবে ভূত্বকে পীড়নের অক্ষগুলির বিন্যাস তিনধরনের হতে পারে। এই তিনধরনের পীড়নের ফলে চ্যুত শিলার ফুট-ওয়ালের তুলনায় হ্যাঙিং-ওয়ালের স্খলনের ভঙ্গী এবং দিক্ বিভিন্ন হয়।

(১) অধোস্তূপের তুলনায় ঊর্ধ্বস্তূপটি ওপরের দিকে উঠে গেলে চ্যুতিটিকে রিভার্স ফল্ট্ অথবা থ্রাস্ট্ ফল্ট্ বলা হয়।

(২) হ্যাঙিং-ওয়াল-এর তুলনায় ফুট্-ওয়াল নীচে নেমে এলে চ্যুতি-টিকে নরমাল্ ফল্ট্ বা গ্র্যাভিটি ফল্ট্ বলা হয়।

(৩) নেট্ স্লিপের দিক্ অনুভূমিক হলে চ্যুতিটিকে স্ট্রাইক্-স্লিপ্ ফল্ট্ বা রেঞ্চ্ ফল্ট্ বলা হয়।

এ শ্রেণী বিভাগে তির্যক্-স্খলিত চ্যুতি বা ওব্লিক্ স্লিপ্ ফল্ট্ গুলিকে আলাদা কোন শ্রেণীতে ফেলা হয় না। চ্যুতিতলের ওপর নেট্ স্লিপ্-এর পিচ্ 45°-এর কম হলে চ্যুতিটিকে স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি (strike-slip fault) বলা হয়, এবং পৃথক ভাবে বলে দেওয়া হয় যে চ্যুতিটির একটি নতি-স্খলনের (dip-slip) উপাংশ (component) আছে। অনুরূপভাবে কোন তির্যক্-স্খলিত চ্যুতির নেট্ স্লিপ্-এর পিচ্ 45°-এর বেশী হলে চ্যুতিটিকে নরমাল্ অথবা রিভার্স ফল্ট্ বলা হয়, এবং পৃথক্ ভাবে বলে দেওয়া হয় যে নেট্ স্লিপের একটি স্ট্রাইক্-স্খলনের (strike-slip) উপাংশ আছে।

পরিচ্ছেদ ১৬

সন্ধি (Joints)

ভূমিকা

শিলার যে চিড় বা ফাটলের ওপরের কোনরকম সরণ (movement) হয়নি, বা যে চিড় বা ফাটলের উপরে নামমাত্র সরণ হয়েছে, সেগুলিকে সন্ধি বলে। উদ্ভেদের সমস্ত শিলাতেই কোন বা কোন রকম সন্ধি দেখা যায়। কোন কোন সন্ধি শিলার বিরূপণজাত গঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, আবার কোন কোন সন্ধি অবিরূপিত শিলাতেও পাওয়া যায়। শিলার গাঠনিক ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সন্ধির সৃষ্টি হতে পারে। নরম বা অল্প জমাট-বাঁধা পলিতেও সন্ধির সৃষ্টি হতে পারে, আবার রূপান্তরিত ও বিরূপিত শিলার বিরূপণের অন্তিম পর্যায়েও সন্ধির সৃষ্টি হতে পারে।

সন্ধির জ্যামিতিক শ্রেণীবিভাগ

কোন কোন সন্ধিতল সমতলীয় হয় এবং সন্ধিগুলি পরস্পরের সমান্তরাল হয়। এ ধরনের সন্ধিকে কেউ কেউ সুসম্বন্ধ সন্ধি (systematic joints) বলেন। আবার কোন কোন সন্ধিতল বক্র হয় এবং এলোমেলো ভঙ্গীতে থাকে। এগুলোকে অসম্বন্ধ সন্ধি (unsystematic joints) বলা চলে (Hodgson, 1961a)।

বেডিং বা স্তরবিন্যাসের সমান্তরালে যে সন্ধিগুলি থাকে তাদের স্তর-সন্ধি (bedding joints) বলা হয়। স্তরের স্ট্রাইকের সমান্তরালে যে সন্ধিগুলি থাকে সেগুলিকে স্ট্রাইক্-সন্ধি (strike joints) বলা হয়।

যে সন্ধির স্ট্রাইক্ স্তরের স্ট্রাইকের সাথে মোটামুটিভাবে সমকোণে থাকে সেটিকে নতি-সন্ধি (dip joints) আখ্যা দেওয়া হয়। স্তরের স্ট্রাইকের সাথে সন্ধির স্ট্রাইক্ তির্যক্‌ভাবে থাকলে সন্ধিটিকে তির্যক্-সন্ধি (diagonal joints) বলা হয়।

বলির অক্ষতলের সমান্তরালে সন্ধি থাকলে সেগুলিকে অনুদৈর্ঘ্য সন্ধি (longitudinal joints) বলা হয় (চিত্র 85-ক)। বলি অক্ষের বা অন্য কোন রৈখিক গঠনের সমকোণে অবস্থিত সন্ধিকে প্রস্থসন্ধি বা ক্রস্ জয়েন্ট্
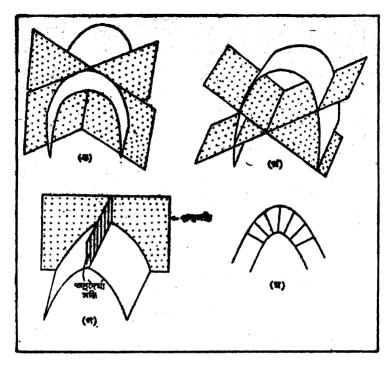
চিত্র - 85 : বলিত স্তরে যুগ্মসন্ধি, প্রস্থসন্ধি, অনুদৈর্ঘ্য সন্ধি এবং অরীয় সন্ধি। (ক) চিত্রে যুগ্মসন্ধির ছেদরেখা বলি-অক্ষের সমকোণে অবস্থিত এবং (খ) চিত্রে ছেদরেখাটি বলি-অক্ষের সমান্তরাল।

(cross joint) আখ্যা দেওয়া হয়। এ ধরনের সন্ধিকে *ac*-সন্ধি (ac-joint) আখ্যা দেওয়াও চলে (চিত্র 85-গ)। যখন একজোড়া সন্ধি বলি-অক্ষ বা অন্য রৈখিক গঠনের সাথে প্রতিসম ভঙ্গীতে থাকে তখন সেগুলিকে যুগ্ম সন্ধি (conjugate joint) বলা চলে। কোন কোন যুগ্ম সন্ধির ছেদরেখা বলি-অক্ষের সমান্তরাল হয় (চিত্র 85-খ), আবার কোন কোন যুগ্ম সন্ধির ছেদরেখা বলি-অক্ষের সমকোণে থাকে (চিত্র 85-ক)।

উৎপত্তির প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সন্ধির শ্রেণীবিভাগ

যে সন্ধিগুলি সম্প্রসারক পীড়নের (tensile stress) সমকোণে সৃষ্টি হয় সেগুলিকে সম্প্রসারণ-সন্ধি বলা হয়। আবার যে সন্ধিগুলির সৃষ্টির সময়ে সন্ধিতলের একপাশের শিলা অন্য পাশের শিলার ওপর দিয়ে ঘষে সরে যেতে চেষ্টা করে সেগুলিকে ছেদন-সন্ধি বলা হয়। অর্থাৎ এই দুই

ধরনের সন্ধির একটি সম্প্রসারক ফাটল (tension fracture) এবং অপরটি ছেদক ফাটল (shear fracture)। সম্প্রসারণ-সন্ধি ও ছেদন-সন্ধির পার্থক্য করা সহজ নয় (Bucher, 1920-21)। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের পার্থক্য করা অসম্ভব।

আয়তনের সঙ্কোচনের ফলে যে সম্প্রসারণ-সন্ধির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে চেনা সহজ। বেসল্ট্-শিলা ঠাণ্ডা হওয়ার সময় আয়তনে সঙ্কুচিত হয়। এর ফলে যে সম্প্রসারণ-সন্ধির সৃষ্টি হয় সেগুলি বেসল্ট্-এর অনুভূমিক স্তরটিকে কতকগুলি পল-কাটা-স্তম্ভে ভাগ করে দেয়। স্তম্ভগুলিকে প্রস্থচ্ছেদে ষড়ভুজের (hexagon) মত দেখায়। এ ধরনের সন্ধিকে স্তম্ভাকার সন্ধি (columnar joints) বলে।

অনেক সময়েই বলি-অক্ষ বা মণিকরেখার সমান্তরালে শিলার সম্প্রসারণ হয়। এক্ষেত্রে প্রস্থসন্ধিগুলিকে (cross joints) সম্প্রসারণ-সন্ধি হিসাবে সহজেই নির্দিষ্ট করা সম্ভব। যেহেতু পীড়নের অক্ষগুলির সাথে প্রতিসম ভঙ্গিতে ছেদক ফাটলের সৃষ্টি হয়, তাই অনুমান করা হয় যে যুগ্ম-সন্ধি-গুলি ছেদন-সন্ধি। বলিত দৃঢ়স্তরে (competent bed) অনেক সময়েই একধরনের সন্ধি দেখা যায়। এ সন্ধিগুলি বলির ক্রোড়ের দিকে অভিসারী (convergent) হয় বলে এদের অরীয় সন্ধি (radial joints) বলা হয় (চিত্র 85-ঘ)। এগুলিকে সম্প্রসারণ-সন্ধি হিসাবে নির্দিষ্ট করা যায়।

কেউ কেউ অনুমান করেন যে বলিত শিলার স্তরে সঙ্কোচনকারী পীড়ন অপসারিত হলে অক্ষতলের সমকোণে শিলাটি ঈষৎ সম্প্রসারিত হয়, এবং এর ফলেই অক্ষতলের সমান্তরালে অনুদৈর্ঘ্য সন্ধিগুলির সৃষ্টি হয় (Billings, 1954)। কোন কোন চ্যুতিতলের একপাশে চ্যুতিতলের সাথে সূক্ষ্মকোণে একধরনের সন্ধি দেখা যায়। এগুলিকে পক্ষ-সন্ধি (feather joint) বলা হয়। এগুলি সবই সম্প্রাসারণ-সন্ধি।

যে সন্ধিগুলিতে বলি বা মণিকরেখার সাথে নির্দিষ্ট কোন জ্যামিতিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলি সম্প্রসারণ-সন্ধি না ছেদন-সন্ধি বলা কঠিন। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ধিতলের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে এ পার্থক্য করার চেষ্টা হয়েছে। উদাহরণতঃ, ছেদন-সন্ধির তল সাধারণতঃ বেশ সমান ও মসৃণ হয় এবং ছেদন-সন্ধিগুলি সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের শিলাকে সোজাসুজি কেটে চলে যায়। পক্ষান্তরে, সম্প্রসারণ-সন্ধিতল সাধারণতঃ অসমান হয় এবং উপল বা বৃহদাকার কেলাস বা মণিকসমষ্টির পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে যায়।

কোন কোন সন্ধিতলে পাখীর পালকের মত দেখতে একধরনের সূক্ষ্ম

কারুকার্য দেখা যায়। এগুলিকে plumose structure বলা হয়। কেউ কেউ এই কারুকার্য থেকে সম্প্রসারণ-সন্ধি ও ছেদন-সন্ধির পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এ সম্পর্কে এখনও কোন তর্কাতীত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়নি (Parker, 1942; Hodgson, 1961a and b; Muehlberger, 1961, Badgley, 1965)।

সন্ধির ভঙ্গীর বর্ণনা

প্রত্যেক অঞ্চলেই বিভিন্ন ভঙ্গীর এবং বিভিন্ন ধরনের সন্ধি থাকে। এই বিভিন্ন ভঙ্গীর সন্ধিগুলিকে একসাথে উপস্থাপিত করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মানচিত্রে সন্ধির ভঙ্গীগুলিকে উপযুক্ত প্রতীকের সাহায্যে উপস্থাপিত করা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সন্ধিগুলির অভিলম্বের ভঙ্গী স্টিরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপে অথবা সমক্ষেত্র অভিক্ষেপে প্রদর্শিত হলে সন্ধির বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ধির স্ট্রাইক্‌গুলি স্তবক চিত্রে (rose diagram) প্রদর্শন করাই সুবিধাজনক হয় (চিত্র 86)। স্ট্রাইক্‌-এর স্তবক-চিত্র রচনার জন্যে
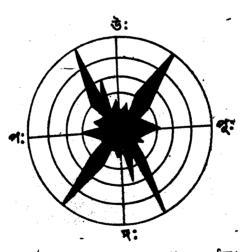
চিত্র - 86ঃ সন্ধির স্ট্রাইক্‌-এর একটি স্তবক-চিত্র।

কতকগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকা হয় এবং বৃত্তের কেন্দ্রগামী একটি সরলরেখাকে উত্তর দিক্‌ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। বৃত্তগুলিকে কতকগুলি

সমান কোণে (5° বা 10° ইত্যাদি) বিভক্ত করা হয়। এখন ধরা যাক্ দশটি সন্ধিতলের স্ট্রাইক্ 15° থেকে 20°-তে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুটি স্ট্রাইকের মাঝামাঝি ভঙ্গীতে (17·5°-এ) একটি বৃত্তের ব্যাস আঁকা হোল। ব্যাসটির দৈর্ঘ্য নির্ণীত হবে এই নির্দিষ্ট ভঙ্গীর (15°—20°) সন্ধির সংখ্যার দ্বারা। যেদিকে যত বেশী সন্ধি থাকবে সেদিকের রেখাটিও তত দীর্ঘ হবে। এইভাবে অনেকগুলি সন্ধির ভঙ্গীকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রেখার স্তবক-চিত্রে দেখানো গেলে সহজেই বোঝা যায় যে মূল সন্ধিগুলি কোন্ দিকে বা কোন্ কোন্ দিকে আছে (চিত্র 86)।

সন্ধি বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

কোন অঞ্চলের সন্ধির ভঙ্গীগুলিকে বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে কোন্ কোন্ ভঙ্গীর সন্ধিগুলি অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীর সন্ধির মধ্য থেকে কয়েকটি মূল সন্ধিকে আলাদা করে নিতে পারলে গাঠনিক বিশ্লেষণ অনেক সহজ হয়। সন্ধির জ্যামিতিক বিশ্লেষণ থেকে অনেক ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায় যে কোন্‌গুলি সম্প্রসারণ-সন্ধি এবং কোন্‌গুলি ছেদন-সন্ধি। এই বিশ্লেষণ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে পীড়নের অক্ষগুলি ভঙ্গী নির্ণয়ের চেষ্টাও হয়েছে।

সন্ধির জ্যামিতিক বিশ্লেষণের একটা ব্যবহারিক দিক্ও আছে। শিলার অভ্যন্তরের ফাটলগুলি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ সঞ্চারিত হতে পারে। তাই কোন কোন খনিজ বা আকর বিশেষভাবে শিলার ফাটলে বা সন্ধিতলে অথবা চ্যুতিতলে সঞ্চিত হয়। সন্ধির জ্যামিতিক বিশ্লেষণ থেকে এই আকর-সঞ্চয়ের অবস্থান সম্পর্কে কখনও কখনও একটা আন্দাজ করা যায়। আবার নদীর বিশাল বাঁধ তৈরীর সময়ে কিংবা পাহাড়ের টানেল্ ও ভূগর্ভের খনি খননের সময়ে সে অঞ্চলের শিলার গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে শিলার মূল সন্ধি বা অন্যান্য ফাটলের সমান্তরালে ধস্ নামার সম্ভাবনা থাকায়, মূল সন্ধিগুলির ভঙ্গী জানা থাকলে খননের সময়ে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা যায়।

পরিচ্ছেদ ১৭

আগ্নেয় শিলার গঠন

আগ্নেয় শিলায় দু'ধরনের গঠন দেখা যেতে পারে। চারিপাশের রূপান্তরিত বা পাললিক শিলার সাথে জমাট-বাঁধা আগ্নেয় শিলাও যদি বিরূপিত হয়, তাহলে আগ্নেয় শিলাস্তূপের অভ্যন্তরে ভূসংক্ষোভজাত গঠনের (diastrophic structures) সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রূপান্তরিত বা স্তরীভূত শিলায় যেভাবে গঠনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়, আগ্নেয় শিলাতেও সেই একই পদ্ধতিতে গাঠনিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আবার, পুরোপুরি জমাট বাঁধার আগে ম্যাগ্‌মার প্রবাহের ফলে আগ্নেয় শিলায় সমতলীয় ও রৈখিক গঠনের সৃষ্টি হতে পারে। জার্মান ভূবিজ্ঞানী হান্‌স্‌ ক্লুস্‌ সর্বপ্রথম এই আগ্নেয় গঠনগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন (Balk, 1937 দ্রষ্টব্য)।

পুরোপুরি তরল ম্যাগ্‌মার প্রবাহের ফলে অথবা ম্যাগ্‌মা ও কেলাসের সংমিশ্রণের প্রবাহের ফলে আগ্নেয় শিলায় যে গঠনগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে **প্রবাহকালীন গঠন** (structures of the flow stage) বলা চলে। আবার ম্যাগ্‌মার এক অংশ জমাট বেঁধে যাওয়ার পরেও ম্যাগ্‌মা স্তূপটির অন্য অংশের গতিশীলতার জন্য কতকগুলি গঠনের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে **কঠিন পর্যায়ের গঠন** (structures of the solid stage) বলা হয়।

ম্যাগ্‌মা ও কেলাসের সংমিশ্রণটি প্রবাহিত হওয়ার সময়ে মণিকের চ্যাপ্টা বা পট্টিত (tabular) কেলাসগুলি মোটামুটিভাবে সমান্তরাল হয়ে একটি সমতলীয় গঠনের সৃষ্টি করে। এটি **প্রবাহজাত সমতলীয় গঠন** (platy flow structure)। কোন কোন আগ্নেয় শিলায় আবার এ গঠনগুলির সমান্তরালে বিভিন্ন রঙের বা বিভিন্ন texture-এর আলাদা আলাদা পরত (প্রবাহ-পরত বা flow layers) দেখা যায়। অনুরূপভাবে আগ্নেয়শিলার দীর্ঘ মণিকগুলি যদি মোটামুটিভাবে সমান্তরালে থাকে তাহলে সেই গঠনটিকে **প্রবাহজাত রৈখিক গঠন** (linear flow structure অথবা flow lines) বলা হয়। সাধারণতঃ প্রবাহজাত রৈখিক গঠনগুলি ম্যাগ্‌মার প্রবাহের দিকের সমান্তরালে থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও

দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটি আগ্নেয় উদ্বেধের (intrusion) পার্শ্বদেশে প্রবাহজাত রৈখিক গঠনগুলি ম্যাগমার প্রবাহের সমান্তরাল, কিন্তু উদ্ভেদের শীর্ষদেশের রৈখিক গঠনগুলি মোটামুটিভাবে সমগ্র ম্যাগমো-স্তূপের প্রবাহের সমকোণে সৃষ্টি হয়েছে।

আগ্নেয়শিলায় কঠিন পর্যায়ের গঠনগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চ্যুতি ও সন্ধি (joints) দেখা যায়। প্রবাহজাত রৈখিক গঠনের সমকোণে যে সন্ধিগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে প্রস্থ-সন্ধি (cross joints) বলা হয়। এ সন্ধিগুলি মূলতঃ আগ্নেয়শিলাস্তূপটির সম্প্রসারণের সমকোণে সৃষ্টি হয়। আবার প্রবাহজাত সমতলীয় গঠনের সমান্তরালে অনুদৈর্ঘ্য সন্ধি-গুলির (longitudinal joints) সৃষ্টি হয়। অনুদৈর্ঘ্য সন্ধির সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। সাধারণতঃ আগ্নেয় উদ্বেধের শীর্ষদেশের কাছে প্রবাহজাত সমতলীয় গঠনগুলি প্রায় অনুভূমিক হয়। এই স্বল্পনত গঠনগুলির সমান্তরালে একধরনের সন্ধির সৃষ্টি হয়। এই সন্ধিগুলির ফাটলে এ্যাপ্লাইট্ (aplite) বা পেগ্মাটাইট্-এর শিরার সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের অনুভূমিক সন্ধিকে স্বল্পনত প্রাথমিক সন্ধি (flat lying primary joints) বলা হয়। আগ্নেয় উদ্বেধনের (intrusion) শেষের পর্যায়ে প্রায়-কঠিনীভূত ম্যাগমার ঊর্ধ্বগামী সরণের ফলে উদ্ভেদের খাড়াই পার্শ্বদেশে থ্রাস্ট্-ফল্ট্-এর সৃষ্টি হয়। এই চ্যুতিগুলি অনেক সময়ে প্রবাহজাত রৈখিক গঠনের সাথে তির্যক ভঙ্গীতে থাকে। এগুলিকে মার্জিনাল থ্রাস্ট্ (marginal thrust) বলা হয় (Balk, 1937)।

ম্যাগমার প্রবাহের ফলে আগ্নেয়শিলার অভ্যন্তরে অনেক ক্ষেত্রেই বলির সৃষ্টি হয় (চিত্র 87, 88)। বলা বাহুল্য, গাঠনিক বিশ্লেষণের জন্যে এ ধরনের বলির সাথে ভূসংক্ষোভজাত বলির প্রভেদ নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। উদাহরণতঃ রাজস্থানের সিওয়ানা অঞ্চলের প্রাক্-কেম্ব্রিয়ানকল্পের মালানি রায়োলাইট্-এর লাভার স্তরে বিভিন্ন ধরনের বলি দেখা যায়। সান্দ্র (viscous) ম্যাগমার প্রবাহের সময়ে এই বলিগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ স্বল্পায়তনের উদ্ভেদের বিভিন্ন অংশে ভূসংক্ষোভজাত বলির অক্ষের ভঙ্গীর বা অক্ষতলের ভঙ্গীর খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু স্বল্পদূরত্বের মধ্যেও (চিত্র 87, 88) এই লাভাপ্রবাহের প্রাথমিক (primary) বলিগুলির অক্ষতলের ভঙ্গীর অনেকটা বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার, বিভিন্ন ভঙ্গীর ছেদতলে বলিত প্রবাহ-পরতের (flow layers) জটিল আকৃতির বলি দেখা যায় (চিত্র 87)। কোন কোন ক্ষেত্রে, সূক্ষ্ম
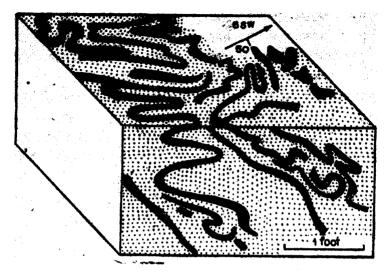
চিত্র-47 : রাজস্থানের সিওয়ানা অঞ্চলে রায়োলাইট্ লাভা-স্তরে জটিল আকৃতির বলি। (শ্রীঅমলবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

পরিমাপে, এই অঞ্চলের প্রবাহ-পরতে বুদিন্যাজ্-এরও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এই বলিত প্রবাহ-পরতগুলি মালানি রায়োলাইট্-এর লাভা প্রবাহের কাচিক (glassy) ঊর্ধ্বাংশেই পাওয়া যায় (Amal Bikash Mukhopadhyaya, 1973—personal communication)। আবার প্রায়ই দেখা যায় যে এই বলিগুলির শীর্ষদেশ ঊর্ধ্বতর লাভা প্রবাহের দ্বারা কর্তিত হয়েছে (চিত্র 48)।

আগ্নেয়শিলার প্রবাহজাত গঠনগুলির সাহায্যে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরের আগ্নেয় উদ্বেধনের সমগ্র আকৃতিটি নিরূপণ করা সম্ভব হয়। আবার প্রবাহকালীন এবং কঠিন পর্যায়ের গঠনগুলির সাহায্যে উদ্বেধনের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কিছু কিছু ধারণা করা সম্ভব হয়। উদাহরণতঃ পূর্ব মানভূমের প্রাক্-কেম্ব্রিয়ান্ শিলার অভ্যন্তরে পর্-ফিরিটিক্ গ্র্যানিট্-এর একটি দীর্ঘাকার উদ্বেধের গাঠনিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Sen,1956)। দেখা গিয়েছে যে এই উদ্বেধটির অভ্যন্তরের প্রবাহ-পরতগুলি উদ্বেধের সীমারেখার সমান্তরাল। প্রবাহ-পরতগুলির ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে এই উদ্বেধটি উত্তর দিকে নত একটি লেন্স-এর আকারের। উদ্বেধটির শীর্ষভাগ একটি দীর্ঘ ডোম্-এর আকারের এবং উদ্বেধের-মধ্য ভাগ থেকে এই ডোমটি পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবনত (plunging)। উপরন্তু উদ্বেধটির অভ্যন্তরে কোন কোন অংশে (যথা,
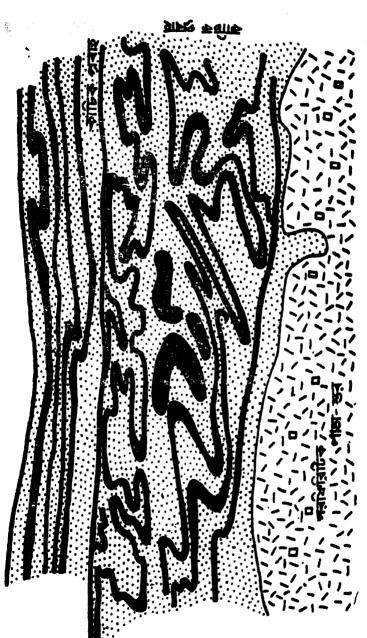
চিত্র-৪৪ঃ রাজস্থানের সিওয়ানা অঞ্চলে রায়োলাইট্ লাভার প্রবাহ-পরতে জটিল আকৃতির বলি। ওপরের লাভাস্তর নীচের স্তরের গঠনগুলিকে কেটে গিয়েছে। (শ্রীঅমলবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)
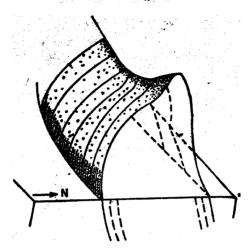
চিত্র-89: রঘুনাথপুরের গ্র্যানিট্‌ডোম্‌-এর ঘন-রূপ (Sen, 1956 অবলম্বনে)।

রঘুনাথপুর অথবা বেরো অঞ্চলে) একাধিক ক্ষুদ্রতর ডোম্‌-এর সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 89)। এই ক্ষুদ্রতর ডোমগুলির প্রবাহজাত রৈখিক গঠনগুলি উদ্বেধের প্রবাহের সমান্তরাল হলেও উদ্বেধের অন্যান্য অংশে প্রবাহের সমকোণেই রৈখিক গঠনগুলির সৃষ্টি হয়েছে (Sen, 1956)। এই পর্‌ফিরিটিক্‌ গ্র্যানিট্‌-এর উৎপত্তি যেভাবেই হোক্‌, গ্র্যানিট্‌-এর আভ্যন্তরীণ গঠনগুলির সাথে পারিপার্শ্বিক শিলার গঠনের বৈসাদৃশ্য (চিত্র 90) থেকে সহজেই বোঝা যায় যে উদ্বেধনের ফলেই এই গঠনগুলির সৃষ্টি হয়েছে।
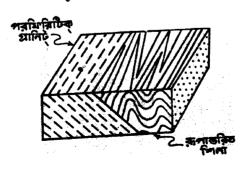
চিত্র-90: মানভূমের পর্‌ফিরিটিক গ্র্যানিট্‌ এবং সংলগ্ন রূপান্তরিত শিলার গঠনের বৈসাদৃশ্য (Sen, 1956 অবলম্বনে)।

পরিচ্ছেদ ১৮

ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা

পৃথিবীর কঠিন পাথুরে পিঠটা মোটেই মসৃণ নয়। ভূপৃষ্ঠ একদিকে যেমন সমুদ্রের নীচে নেমে গিয়েছে, অন্য একদিকে তেমনি মহাদেশের ওপরে উঁচু হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের তলে কোথাও আছে সুদীর্ঘ শৈলশিরা (ridges), কোথাও গভীর খাত; মহাদেশের ওপরে আছে ভঙ্গিল পর্বতমালা। গোটা পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় এ বন্ধুরতা অবশ্য খুবই অল্প; তবে পৃথিবীর পাতলা কঠিন ত্বকটির স্থূলতার তুলনায় ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা নেহাৎ কম নয়।

পৃথিবীর ওপর থেকে যদি সমুদ্রের জলরাশিকে সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে মহাসাগরের তল থেকে মহাদেশের ওপরটা গড়ে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার উঁচুতে উঠে আছে। সুতরাং গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে ভূপৃষ্ঠকে সহজেই দুটি বড় অঞ্চলে ভাগ করা যায়—**মহাদেশীয় অঞ্চল** এবং **মহাসাগরীয় অঞ্চল**। ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতার এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য ভূপৃষ্ঠের গঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে সমুদ্রের তটরেখাকে মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় অঞ্চলের সীমারেখা বলা চলে না। মহাদেশের কিনারাগুলি সমুদ্রের জলের তলায় ডুবে আছে। বস্তুতঃ মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সহজ নয়, কারণ এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের বা মহাদেশীয় প্রান্তের (continental margin) গঠন বেশ জটিল।

সাধারণতঃ সমুদ্র-প্লাবিত ভূপৃষ্ঠকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় (১) **মহীপ্রান্ত** (continental margin), (২) **মহাসাগরীয় পর্বণ্ডের তলদেশ** (oceanbasin floor) এবং (৩) **মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা** (midoceanic ridge)।

মহীপ্রান্তের বন্ধুরতা সব জায়গায় একরকম নয়। ভারত মহাসাগর এবং অতলান্তিক মহাসাগরের মহীপ্রান্তের মধ্যে তিনটি অঞ্চলকে পৃথক করা যায় (চিত্র 91)। (১) **মহীসোপান** (continental shelf), (২) **মহীঢাল** (continental slope) এবং (৩) **মহীস্ফীতি** (continental rise)। মহীসোপান অঞ্চলটি খুব ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। যেমন, উত্তর অতলান্তিকের ধারে এ-অঞ্চলটির ঢাল মোটামুটিভাবে
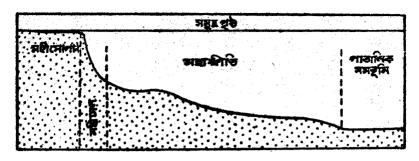
চিত্র - 91 : মহীপ্রান্তের (continental margin) বিভিন্ন অংশ :— মহীসোপান, মহীঢাল ও মহীস্ফীতি।

1 : 1000। মহীসোপানের তুলনায় মহীঢাল অঞ্চলটি অনেকটা খাড়াই। উদাহরণতঃ উত্তর অতলান্তিকের মহীঢালের ঢাল মোটামুটিভাবে 1 : 40 থেকে 1 : 6 অথবা আরো খাড়াই। মহীসোপান অঞ্চলটি ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় অনেকটা খাড়াই হয়ে যায় (চিত্র 91)। এই অঞ্চলটিকে **সোপান-ভঙ্গ** (shelf break) বলা হয়। মহীসোপান এবং মহীঢালের সীমারেখাকেই সোপান-ভঙ্গ বলা হয়।

ভারত মহাসাগর ও অতলান্তিক মহাসাগরের প্রান্তে মহীঢালের নীচে সমুদ্রতলের ঢাল আবার কমে আসে এবং সমুদ্রের তলদেশ ঈষৎ উত্তল (convex) বা ঈষৎ স্ফুরিত হয়। মহীপ্রান্তের এই অংশটিকে বলা হয় **মহীস্ফীতি** (continental rise)। প্রশান্ত মহাসাগরের মহীপ্রান্তে সাধারণতঃ এধরনের মহীস্ফীতি দেখা যায় না। এখানে মহীঢালের ঠিক নীচেই দেখা যায় গভীর সমুদ্রের খাত (trench)। অবশ্য অতলান্তিক মহাসাগরের মহীস্ফীতি অঞ্চলে গভীর খাত না থাকলেও সেখানে মহীস্ফীতি অঞ্চলের নীচে এক গভীর পলির স্তূপের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাই অনুমান করা হয় যে অতলান্তিকের বা ভারত মহাসাগরের উপকূলেও এককালে গভীর খাত ছিল। এগুলি এখন পলি পড়ে বুজে গিয়ে মহীপ্রান্তের ঈষৎ স্ফুরিত অঞ্চলগুলির সৃষ্টি করেছে (Heezen and Menard, 1963; পৃঃ 234)। সমুদ্রের তলদেশে বহু অঞ্চলেই নদীর উপত্যকার মতো **আন্তঃসাগরীয়** উপত্যকা প্রসারিত। বস্তুতঃ সমস্ত মহীঢাল অঞ্চলেই আন্তঃসাগরীয় উপত্যকা দেখা যায়। এই উপত্যকাগুলি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বেশ কয়েকশত কিলোমিটার প্রসারিত হতে পারে। উপত্যকাগুলির সবগুলি একরকম দেখতে নয়। মহীঢাল অঞ্চলের কোন কোন উপত্যকার পার্শ্বদেশ বেশ খাড়াই হয় এবং

উপত্যকাগুলি ইংরাজী V অক্ষরের মতো হয়। বিশেষ করে এই গভীর উপত্যকাগুলিকেই আন্তঃসাগরীয় ক্যানিয়ন্ (submarine canyon) বলে (Menard, 1955)। সিংহলের পূর্ব উপকূলে ত্রিঙ্কোমালী বন্দরের কাছে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত এই ধরনের একটি গভীর আন্তঃসাগরীয় ক্যানিয়ন্ দেখা যায়। এই ধরনের গভীর ক্যানিয়ন্ অবশ্য মহীঢাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে কারো কারো মতে সাধারণভাবে যে কোন রকম আন্তঃসাগরীয় উপত্যকাকেই আন্তঃসাগরীয় ক্যানিয়ন্ বলা চলে (Heezen et al, 1959)।

আবার, গঙ্গার মোহনা থেকে মহীঢাল ও মহীস্ফীতি অঞ্চলের ওপর দিয়ে একটি দীর্ঘ উপত্যকা বঙ্গোপসাগরের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে। এধরনের আন্তঃসাগরীয় উপত্যকাগুলির তলদেশ বেশ চওড়া ও সমান হয়।

আন্তঃসাগরীয় উপত্যকাগুলির সৃষ্টি হয় কি ভাবে? মহাদেশের কোন অঞ্চল যদি অবনমিত হয়ে সমুদ্রমগ্ন হয় তাহলে সেখানকার মগ্ন উপত্যকা-গুলি অবশ্যই আন্তঃসাগরীয় উপত্যকার সৃষ্টি করবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমুদ্রের তলদেশের উপত্যকাগুলির সৃষ্টি হয় আবিলতার স্রোতের (turbidity current) প্রভাবে। পলিযুক্ত ঘোলা জলের ভারী স্রোত সমুদ্রের তলদেশ ঘেঁষে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই উপত্যকাগুলির সৃষ্টি করে। আন্তঃসাগরীয় উপত্যকার আবিলতার স্রোতে প্রবাহিত হয়ে পলি-সমূহ যদি দীর্ঘকাল ধরে গভীর সমুদ্রে অবক্ষেপিত হয় তাহলে কোন কোন অঞ্চলে বিশাল পলিস্তূপ জমে ওঠে। এগুলিকে ডীপ্ সী ফ্যান্ (deep sea fan) বলা হয়। বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনার থেকে দক্ষিণ দিকে এইরকম একটি বিশাল পলিস্তূপ জমে উঠেছে।

মহাসমুদ্রের পাতালীয় প্রদেশের (abyssal region) তলদেশ বেশ বন্ধুর বা পাহাড়ী হতে পারে আবার কোন কোন অংশ একেবারে সমভূমির মতোও হতে পারে। ভারত মহাসাগর বা অতলান্তিক মহাসাগরের মহীস্ফীতি অঞ্চলের নীচে সাধারণতঃ বিশাল সমভূমি দেখা যায়। এত সমান ভূমি স্থলভূমিতেও সচরাচর দেখা যায় না। গভীর সমুদ্র-পর্যঙ্কের এই সমভূমিগুলিকে পাতালীয় সমভূমি (abyssal plains) বলা হয়। এখানকার ঢাল 1:1000 থেকেও কম হয়। ভারত মহাসাগরে সিংহলের দক্ষিণে এইরকম একটি পাতালীয় সমভূমি আছে। ভারত মহাসাগর এবং অতলান্তিক মহাসাগরের গভীর পর্যঙ্কে সমভূমি ছাড়াও কিছুটা অংশ বেশ পাহাড়ী হয়। পক্ষান্তরে, প্রশান্ত মহাসাগরে সমভূমি অনেক কম;

এখানে বেশীর ভাগ জায়গাই বেশ বন্ধুর। এই সব পাতালীয় পাহাড়ী অঞ্চলের কোথাও দেখা যায় হাওয়াই-এর মতো আগ্নেয়গিরির দ্বীপপুঞ্জ কোথাও আছে শৈলশিরা (ridge) অথবা কোথাও পাওয়া যায় মাথা-কাটা জলমগ্ন অগ্নেয়গিরি বা guyot মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরের guyot-গুলি অবশ্য একসময়ে সমুদ্রের ওপরে দ্বীপ বা এ্যাটলের সৃষ্টি করেছিল। ঢেউয়ের ঝাপ্টায় এই দ্বীপের চূড়াগুলি ক্ষয়ে-যায়। অবশেষে দ্বীপগুলি সমুদ্রের ভেতরে ব'সে যাওয়ার ফলে সমগ্র পাহাড়টি জলমগ্ন হয়। guyot-এর অবস্থান থেকে অনুমান করা হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তলদেশ একসময়ে অবনমিত হয়েছিল।

সমুদ্রের তলদেশের বন্ধুরতার সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা (midoceanic ridge)। মহাসাগরের মাঝখান দিয়ে প্রায় সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করে 50,000 কিলোমিটার দীর্ঘ এই সর্পিল জলমগ্ন শৈলমালা প্রসারিত। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে এই শৈলশিরাগুলি 1 থেকে 5 কিমি পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠতে পারে। এই শৈলশিরাগুলি সাধরণতঃ 1000 কিলোমিটারেরও বেশী চওড়া হয়। শৈলশিরার শীর্ষ-দেশে থাকে একটি চ্যুত উপত্যকা বা রিফ্‌ট্‌ ভ্যালি (rift valley), এবং শীর্ষ-অঞ্চলের দু'ধারে থাকে বিভিন্ন ফাটলে বিভক্ত উচ্চ মালভূমি। শৈল-শিরার মধ্যভাগে অথবা শীর্ষদেশে প্রায়ই ভূকম্পন হয়। ভারত মহাসাগরের অথবা অতলান্তিক মহাসাগরের তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের শৈলশিরার দীর্ঘকার শীর্ষদেশ অতটা স্পষ্ট নয়।

অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানীর মতে মহাসাগরীয় শিলামণ্ডলের (lithosphere) সম্প্রসারণের ফলেই মধ্যসাগরীয় শৈলশিরার সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রসারিত শিলামণ্ডলের ফাটল দিয়ে নিম্নস্থিত বেসল্ট্-এর লাভাস্তূপ উঠে এসে শৈলশিরার সৃষ্টি করেছে। মধ্যসাগরীয় শৈলশিরার উদ্ভবকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, মনে রাখা দরকার যে এই শৈলশিরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে দীর্ঘতম পর্বতমালার সৃষ্টি করেছে; সুতরাং ভূপৃষ্ঠের স্থাপত্যসৃষ্টিতে এই বিশালাকার গঠনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের যে অংশটুকু জলমগ্ন হয়ে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে, মূলতঃ সেই সমুদ্রপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠের বর্ণনাতেই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মহাদেশীয় ভূপৃষ্ঠের ওঠানামার ইতিহাস পাললিক শিলাস্তূপে অনেক পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে 'জিওসিন্‌ক্লাইন্' এবং 'ভূপৃষ্ঠের গতিশীলতা' শীর্ষক অধ্যায় দুটিতে।

পরিচ্ছেদ ১৯

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক গঠন

ভূপৃষ্ঠের বিশালাকার গাঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে দু'ধরনের শক্তির উৎস থেকে। একদিকে সূর্যকিরণের শক্তি-চালিত বায়ুমণ্ডল ও জলরাশি ভূপৃষ্ঠের আকৃতিকে পরিবর্তিত করে চলেছে, আবার অন্যদিকে ভূগর্ভের তাপশক্তিচালিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর পিঠ কোথাও উঁচু কোথাও নীচু হয়ে গিয়েছে। যেহেতু পৃথিবীর অন্তস্থ প্রক্রিয়াগুলি ভূপৃষ্ঠের বিশালাকার গঠনগুলিকে প্রভাবিত করে, তাই ভূপৃষ্ঠের স্থাপত্যের উদ্ভব সম্পর্কে যে কোন আলোচনার জন্যে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক গঠনটি কিরকম সেটাও জানা দরকার।

ভূপৃষ্ঠের নিরীক্ষা থেকে এবং গভীর খনি বা তৈলকূপ (oil wells) থেকে কয়েক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত ভূত্বকের গঠন সরাসরিভাবে জানা সম্ভব। আবার, আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণ বা উদ্বেধের গভীরোত্থিত আগ্নেয়শিলার স্তূপ থেকেও পরোক্ষভাবে ভূত্বক বা ভূত্বকের নিম্নস্থ শিলার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব। পৃথিবীর আরও গভীর অঞ্চলের গঠন নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভূকম্পন তরঙ্গের বেগের সাহায্যে (Gutenberg and Richter, 1954)।

ভূমিকম্পের সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভূকম্পনের যে তরঙ্গে শিলার কণাগুলি শব্দ-তরঙ্গের মতো তরঙ্গের যাত্রাপথের দিকে এগিয়ে পিছিয়ে কাঁপতে থাকে সে তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (longitudinal wave) বলা হয়। তরঙ্গের যাত্রাপথের সমকোণে অবস্থিত কোন তলে যদি শিলার কণাগুলি কাঁপতে থাকে তাহলে সেই তরঙ্গটিকে তির্যক্ তরঙ্গ (transverse wave) বলা হয়। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গকে P তরঙ্গ এবং তির্যক্ তরঙ্গকে S তরঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। P এবং S তরঙ্গদ্বয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হয়। ভূপৃষ্ঠের ওপরের ভূকম্পনের তরঙ্গগুলিকে পৃষ্ঠ তরঙ্গ (surface wave) বা L তরঙ্গ বলা হয়।

ভূকম্পনের তরঙ্গগুলি কত জোরে পৃথিবীর ভেতর দিয়ে ছুটে যাবে সেটা নির্ভর করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বস্তুর প্রকৃতির ওপর। আবার একই
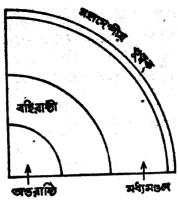
চিত্র - 92 : পৃথিবীর আভ্যন্তরীন গঠন।

বস্তুর ভেতর P এবং S তরঙ্গের বেগও আলাদা। পৃথিবীর একটা জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় ভূকম্পনের বিভিন্ন তরঙ্গগুলির আসতে কত সময় লাগছে সেটা জানা থাকলে তরঙ্গগুলির বেগের বিশ্লেষণ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুর ভৌত ধর্ম (physical property) সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব।

যদি পৃথিবীর ভেতরের সব জায়গায় বস্তুর ধর্ম একই রকম থাকত তাহলে ভূকম্পনের তরঙ্গের বেগের কোন পরিবর্তন হোত না। সেক্ষেত্রে ভূকম্পন তরঙ্গের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার দূরত্ব এবং সময় নিয়ে একটি লেখ (graph) রচনা করলে লেখটি একটি সরলরেখা হোত। ভূপৃষ্ঠের ওপরের L তরঙ্গের যাত্রার দূরত্ব ও সময়ের লেখগুলি এই রকম সরলরেখা হয়; কিন্তু P এবং S তরঙ্গের লেখগুলি বাঁকা হয়। যে P এবং S তরঙ্গগুলি পৃথিবীর যত বেশী গভীর অঞ্চলকে স্পর্শ করে যায় সেগুলির গড় বেগও তত বেশী হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে গভীরতাবৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীর ভৌত ধর্মেরও পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে P এবং S তরঙ্গের বেগের বৃদ্ধিও সমানভাবে হয় না। পৃথিবীর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে কোন কোন গভীরতায় তরঙ্গগুলির বেগের (চিত্র 93) বা বেগের হারের আকস্মিক পরিবর্তন হয়। যেমন, পৃথিবীর অগভীর অঞ্চলে P তরঙ্গের বেগ থাকে প্রতি সেকেণ্ডে 6·8 কিলোমিটার থেকে 7·2 কিলোমিটার। তারপর আরও গভীরে যাওয়ার সময় হঠাৎ P তরঙ্গগুলির বেগ বেড়ে গিয়ে হয়ে যায় প্রতি সেকেণ্ডে

চিত্র - ৪৫ : পৃথিবীর অভ্যন্তরে (ত্বকের নীচে) P-এবং S-তরঙ্গের বেগ। R = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ; r = পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব।
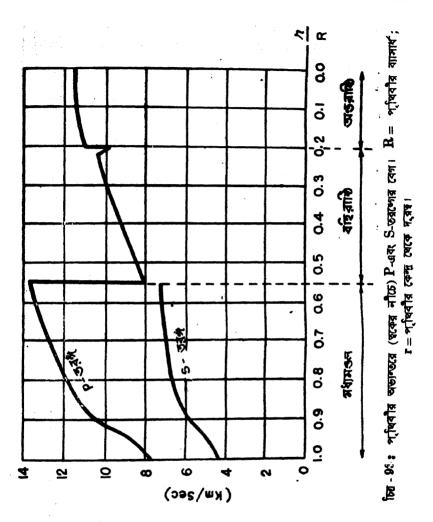
৪·0—৪·২ কিমি। যেখানে তরঙ্গের বেগের এই বিচ্ছেদটি দেখা যায় সেই গভীরতাকে বলা হয় মোহরোভিচিক্ বিচ্ছেদ (Mohorovicic discontinuity) বা M বিচ্ছেদ। সংক্ষেপে এই বিচ্ছেদটিকে মোহো (Moho) বলা চলে। মোহরোভিচিক বিচ্ছেদ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গভীরতায় পাওয়া যায়। মহাদেশীয় অঞ্চলে এ-বিচ্ছেদটি থাকে গড়ে 35 কিলোমিটার গভীরতায়। মহাসাগরীয় অঞ্চলে M বিচ্ছেদ সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে 11 কিলোমিটার নীচে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 2900 কিমি

গভীরে P তরঙ্গের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 13·6 কিমি থেকে হঠাৎ 8·1 কিমি হয়ে যায়। 2900 কিমি গভীরের এই বিচ্ছেদটির নীচে S তরঙ্গগুলি প্রবেশ করতে পারে না (চিত্র 93)।

M বিচ্ছেদ এবং 2900 কিলোমিটার গভীরের বিচ্ছেদের সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে তিনটি পৃথক মণ্ডলে ভাগ করা সম্ভব হয়। 2900 কিলোমিটারের নীচের কেন্দ্রীয় অংশটিকে বলা হয় পৃথিবীর অস্থি বা কোর্ (core)। M বিচ্ছেদের ওপরের অংশটিকে বলা হয় ভূত্বক (crust)। ভূত্বক ও কেন্দ্রীয় অংশটির মধ্যবর্তী মণ্ডলটিকে বলা হয় মধ্যমণ্ডল বা ম্যান্ট্ল্ (mantle)।

পৃথিবীর অস্থি বা কোর্-এর মধ্যে আবার ভূকম্পন-তরঙ্গের বেগের একটি বিচ্ছেদ পাওয়া যায়। এই বিচ্ছেদটি আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে 4980 কিমি থেকে 5120 কিমি গভীরে। এই গভীরতার ঊর্ধ্বের অংশটিকে বলা হয় বহিরাস্থি (outer core) এবং নীচের অংশটিকে বলা হয় অন্তরাস্থি (inner core)। বহিরাস্থির মধ্যে দিয়ে S তরঙ্গ যায়না (চিত্র 92, 93)। যেহেতু S তরঙ্গ কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়েই সঞ্চালিত হয়, তাই বহিরাস্থির মণ্ডলটিকে তরল মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। অন্তরাস্থি কঠিন না তরল সেটা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয়নি।

ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 থেকে 200 কিমি গভীরে ম্যান্ট্ল্-এর উপরিভাগে, ভূকম্পন-তরঙ্গের বেগ ঈষৎ হ্রাস পায় (Gutenberg, 1954)। এই অঞ্চলটিকে বলা হয় মন্থর-মণ্ডল বা 'লো ভেলোসিটি জোন্' (low velocity zone)। অনুমান করা হয় যে এই অঞ্চলে ম্যান্ট্ল্-এর শিলার সান্দ্রতা (viscosity) কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ম্যান্ট্ল্-এর ভেতর দিয়ে S তরঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারে। তাই পৃথিবীর এই মধ্যমণ্ডলটিতে কঠিন পদার্থের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অবশ্য, কেবলমাত্র ভূকম্পনের মতো ক্ষণস্থায়ী পীড়নের প্রতিক্রিয়াগুলিই কঠিন পদার্থের মতো হয়। দীর্ঘস্থায়ী পীড়নের ফলে ম্যান্ট্ল্-এর প্রতিক্রিয়া হয় সান্দ্র অথবা প্লাস্টিক্ পদার্থের মতো। স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ক্যানাডার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্লাইস্টোসিন কালে যে হিমবাহ ছিল, তার চাপে ভূত্বকের বিস্তীর্ণ অংশ নীচে নেমে গিয়েছিল। আবার বরফ গলে যাওয়ার পরে এই অঞ্চলগুলি ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। বলা বাহুল্য ভূত্বকের নীচে নেমে যাওয়া বা ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভূত্বকের নিম্নস্থ ম্যান্ট্ল্-এর বস্তুও ক্রমশঃ বিরূপিত হয়। স্থিতিস্থাপক পদার্থে পীড়নের ফলে যে বিরূপণ হয় সেটা খুব আকস্মিক হয়। সান্দ্র এবং প্লাস্টিক্ পদার্থে

পীড়নের ফলে ধীরে ধীরে বিরূপণের মান বেড়ে চলে। ভূত্বকের ধীরে ধীরে ওঠা বা নামার থেকে বোঝা যায় যে দীর্ঘস্থায়ী পীড়নে ম্যান্ট্‌ল্‌-এর প্রতিক্রিয়া সান্দ্র অথবা প্ল্যাস্‌টিক্‌ পদার্থের মতো।

আধুনিক সংজ্ঞায় মোহরোভিচিক বিচ্ছেদের ওপরের অংশটিকে ভূত্বক বলা হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটিভাবে 100 কিমি গভীরতা পর্যন্ত পৃথিবীর বহির্মণ্ডলটি শক্ত ও ভঙ্গুর একটি আবরণের সৃষ্টি করেছে। মোটামুটিভাবে মন্থর-মণ্ডলের (low velocity zone) ওপরে অবস্থিত এই কঠিন আবরণটিকে শিলামণ্ডল (lithosphere) বা কঠিনমণ্ডল (stereosphere) বলা হয়। ভূত্বক এবং ম্যান্ট্‌ল্‌-এর উপরিভাগ নিয়ে এই মণ্ডলটি গঠিত। শিলামণ্ডলের ঠিক নীচের অংশটি এতটা শক্ত নয়; অর্থাৎ এ অঞ্চলটির সান্দ্রতা কিছুটা কম। ম্যান্ট্‌ল্‌-এর এই অশক্ত মণ্ডলটিকে এস্‌থেনোস্ফিয়ার্‌ (astheenosphere) বলা হয়। মোটামুটি-ভাবে মন্থর-মণ্ডলেই এই অশক্ত অঞ্চলটি সীমাবদ্ধ।

মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূত্বকের প্রকৃতি আলাদা। মহা-দেশীয় ভূত্বকের গঠন মহাসাগরীয় ভূত্বকের চেয়ে কিছুটা জটিলতর। মহা-দেশীয় ভূত্বকের উপরিভাগে আছে বিভিন্ন ধরনের পাললিক, আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা। ভূত্বকের এই উপরিভাগের রাসায়নিক সংযুতি (chemical composition) মোটামুটিভাবে গ্রানিট্‌-জাতীয় শিলার মতো। মহাদেশীয় ভূত্বকের নিম্নাংশ বেসল্ট্‌ শিলায় গঠিত বলে অনেকে অনুমান করেন। অবশ্য এ বিষয়ে সবাই একমত নন। বিকল্প তত্ত্বগুলি অনুসারে মহাদেশীয় ভূত্বকের নিম্নভাগ বহুলাংশে গ্যাব্রো অথবা গ্র্যানুলাইট্‌ কিংবা এ্যাম্ফিবোলাইট্‌ শিলাতেও গঠিত হতে পারে। মহাদেশীয় ভূত্বকের উপরিভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যবর্তী বিচ্ছেদটিকে কন্‌রাড্‌ বিচ্ছেদ (conrad discontinuity) বলা হয়। কোন কোন অঞ্চলে এ বিচ্ছেদটি বেশ স্পষ্ট; আবার কোন কোন অঞ্চলে ভূত্বকের উপরিভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে স্পষ্টভাবে কোন বিচ্ছেদ পাওয়া যায় না।

মহাদেশীয় ভূত্বকের স্থূলতা সব জায়গায় সমান নয়। সমভূমির নীচে ভূত্বকের স্থূলতা 25 থেকে 35 কিমি থাকে। ভঙ্গিল পর্বতমালার নীচে ভূত্বক 50 থেকে 80 কিমি পর্যন্ত পুরু হতে পারে।

মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূত্বকের স্থূলতা অনেক কম। সমুদ্রের জলের তলায় ভূত্বকের ভেতরে সাধারণতঃ তিনটি স্তর থাকে। প্রথম স্তরটি গড়ে 0·3 কিমি পুরু হয়, এবং এটি পাললিক শিলায় গঠিত হয়। 1·4 কিমি পুরু দ্বিতীয় স্তরটি পাললিক শিলা এবং বেসল্ট্‌-এর স্তরে গঠিত।

4·7 কিম্ব তৃতীয় স্তরটি সম্ভবতঃ মহাসাগরীয় থোলিয়াইট্ বেসল্ট্-এ গঠিত। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে মহাসাগরীয় ভূত্বকের নিম্নভাগ (অর্থাৎ, তৃতীয় স্তরটি) বহুলাংশে সার্পেন্‌টিনাইট্-এ (serpentinite) অথবা গ্রীন্‌স্টোন্ অথবা এ্যাম্ফিবোলাইট্-এ গঠিত হতেও পারে।

মধ্যসাগরীয় শৈলশিরার (midoceanic ridge) নীচে কোথাও কোথাও ভূত্বক কিছুটা পাতলা হয়ে আসে। মহাসাগরীয় ভূত্বকের তৃতীয় স্তরটি এসব জায়গায় পাওয়া যায় না। উপরন্তু মহাসাগরীয় ভূত্বকের দ্বিতীয় স্তরের নীচে ম্যান্ট্‌ল্-এর প্রকৃতিও এ অঞ্চলে কিছুটা অন্যরকম হয়। ম্যান্ট্‌ল্-এ ভূকম্পন তরঙ্গের সাধারণতঃ যা বেগ থাকে, শৈলশিরার নীচের ম্যান্ট্‌লে ভূকম্পন-তরঙ্গের বেগ তার থেকে কোথাও কোথাও কিছুটা কম হতে পারে।

মহাদেশ ও মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ মহাদেশীয় প্রান্তে (continental margin) ভূত্বকের গঠন বেশ জটিল হয়। ভূপৃষ্ঠের স্থাপত্যের প্রকৃতিভেদে এ অঞ্চলে ভূত্বকের গঠনেরও তারতম্য দেখা যায়। অতলান্তিকের ধারের মহাদেশীয় প্রান্তে পাললিক শিলার স্তরটি খুব পুরু হয়। কোন কোন জায়গায় পাললিক শিলাস্তূপের নীচে থাকে ক্ষুদ্রায়তনের শৈলশিরা (ridges) যার গায়ে বাধা পেয়ে পলির স্তূপ জমতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রতলে আছে গভীর খাত ও তার সমান্তরালে আছে দ্বীপপুঞ্জের মালা। এখানকার ভূত্বকের গঠনও বেশ জটিল। সাধারণতঃ দ্বীপপুঞ্জমালা ও সামুদ্রিক খাতের তলায় ভূত্বকটি হয় বেশ খানিকটা স্থূল। জাপান ও কিউরাইল্ দ্বীপপুঞ্জের নীচে এই ধরনের স্থূল ভূত্বক পাওয়া যায়। আবার কারমাডেক্—টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের অঞ্চলে ভূত্বকের স্থূলতা অপেক্ষাকৃত কম।

পৃথিবীর ভেতরের গঠন সম্পর্কে আমাদের মোটামুটিভাবে একটা ধারনা থাকলেও, পৃথিবীর ম্যান্ট্‌ল্ এবং অষ্ঠিতে (core) কি ধরনের মণিক সমষ্টি আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বিশেষ কিছু বলা যায় না। এ সম্পর্কে প্রস্তরবিদ্যায় (petrology) একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। এ তত্ত্বগুলি বর্তমান পুস্তকের আলোচ্যবস্তু না হলেও মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপযুক্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে ভূস্থাপত্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যাও অসম্ভব।

পরিচ্ছেদ ২০

জিওসিন্‌ক্লাইন্‌

উত্তর আমেরিকার আপালাশিয়ান্‌ পর্বতমালার ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা থেকে জেম্‌স্‌ হল্‌ (Hall, 1859) দেখান যে এই পর্বতমালাটি প্রধানতঃ 30,000 থেকে 40,000 ফুট সামুদ্রিক পলির স্তরসমষ্টিতে গঠিত হয়েছে। হল্‌-এর নিরীক্ষা থেকে আরও জানা যায় যে এই বিশাল পলির স্তূপ প্রায় সবটাই অগভীর সমুদ্রে অবক্ষেপিত হয়েছে। এর থেকে বলা যায় যে পলির অবক্ষেপণের সময়ে সমুদ্রতল ক্রমশঃ অবনমিত হয়েছে। আপালাশিয়ান্‌ পর্বতমালার এই নিরীক্ষা থেকেই সর্বপ্রথম জানা যায় যে দীর্ঘ ও সংকীর্ণ অঞ্চলে গভীর পলির স্তূপে ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলি গঠিত হয়। যে দীর্ঘ, সংকীর্ণ এবং অবনমিত সমুদ্রপর্যঙ্কে এই পলির স্তূপ গড়ে ওঠে সেটিকে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ আখ্যা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে আপালাশিয়ান্‌-এর সাথে হিমালয় বা আল্প্‌স্‌ পর্বতমালার জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর বেশ কিছু প্রভেদ আছে।

বস্তুতঃ যে সব সমুদ্রপর্যঙ্কে পলির স্তূপ অবক্ষেপিত হয় সেগুলি সব এক ধরনের নয়। ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অঞ্চলের ওঠানামার হার খুব বেশী আবার কোন কোন অঞ্চল বেশ স্থিতিশীল। ভূপৃষ্ঠের যে-অঞ্চলগুলি মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল সেই অংশগুলিকে ক্রেটন্‌ (craton) বলা হয়। ক্রেটন্‌ দু'ধরনের হয়—মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয়। আবার ভূপৃষ্ঠের যে অংশগুলি সবচেয়ে গতিশীল সেই অংশগুলিকে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ (orthogeosyncline) বলা হয়। অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর পলির স্তূপ বিরূপিত হয়ে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ জিওসিন্‌-ক্লাইন্‌ শব্দটি বিভিন্ন ধরনের পাললিক পর্যঙ্কের (sedimentary trough) বর্ণনায় ব্যবহার করেন, আবার কারো মতে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ শব্দটি একমাত্র অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বর্তমান অধ্যায়ে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ এবং অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

জেমস্‌ হল্‌-এর নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে আপালাশিয়ান্‌ পর্বত-মালার বিশাল পলিস্তূপের অধিকাংশই অগভীর সমুদ্রে অবক্ষেপিত

হয়েছিল। তবে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর সমুদ্রতল মাত্রই যে অগভীর হবে এমন নয়। বস্তুতঃ ইউরোপের আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালার নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে সেখানকার জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর তল কোথাও ছিল গভীর এবং কোথাও ছিল অগভীর। সমুদ্রপর্যঙ্কে কোথাও ছিল দীর্ঘ খাত এবং কোথাও ছিল অগভীর শৈলশিরা (ridge)।

জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর তলদেশ কেন অবনমিত হয়? অবিসম্বাদিতভাবে এ প্রশ্নের এখনও কোন সমাধান হয়নি। আমেরিকার মিসিসিপি নদীর মোহানার মতো কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় যে নদীর মোহানায় দীর্ঘকাল ধরে নদীবাহিত পলির অবক্ষেপণের ফলে এক গভীর পলির স্তূপ সঞ্চিত হয়েছে। অবক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতল অবনমিত না হলে নিশ্চয় এত গভীর স্তূপ জমতে পারত না। সমুদ্রতল ক্রমশঃ অবনমিত না হলে অল্প সময়েই অগভীর সমুদ্র পলিতে ভরে যেত এবং তারপর পলির অবক্ষেপণ হোত আরও দূরের সমুদ্রে। সুতরাং নদীর মোহনায় পলির গভীর স্তূপ জমার থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে পলির চাপে সমুদ্রতল ক্রমশঃ অবনমিত হয়। পক্ষান্তরে, অনেকে মনে করেন যে ভূসংক্ষোভ (earth movement) না হলে সমুদ্রতলের অবনমন সম্ভব নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তদেশে এমন অনেক গভীর খাত আছে যেখানে পলির সঞ্চয় অল্প হলেও সমুদ্রতল অনেকখানি অবনমিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এখানে ভূসংক্ষোভের ফলেই মহাসাগরীয় খাতগুলির সৃষ্টি হয়েছে। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে Glaessner and Teichert, 1947 দ্রষ্টব্য)।

অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর ভেতরে দুধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌কে দুটি দীর্ঘ সমান্তরাল অংশে ভাগ করা সম্ভব। এদের মধ্যে মহাসাগরীয় ক্রেটনের দিকে যে অংশটি থাকে সেটিকে ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চল (eugeosynclinal realm; Aubouin, 1965) বলা হয়, এবং মহাদেশীয় ক্রেটনের দিকে যে অংশটি থাকে সেটিকে মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চল বলা হয় (চিত্র 94)। ইউজিওসিনক্লাইনীয় অঞ্চলের শিলাস্তূপে ওফিওলাইট্‌ আগ্নেয়শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়। মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলে ওফিওলাইট্‌ থাকে না অথবা খুব অল্প পরিমাণে থাকে। আল্‌প্‌স্‌-এর জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ সৃষ্টির সময়ে অথবা গ্রীস্‌-এর হেলেনাইডিস্‌-এর জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ সৃষ্টির সময়ে সারি সারি কতকগুলি খাত (furrow) এবং শৈলশিরার (ridge) অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলের মধ্যে

চিত্র - 94 : অর্থোজিওসিনক্লাইন-এর বিভিন্ন অংশ।
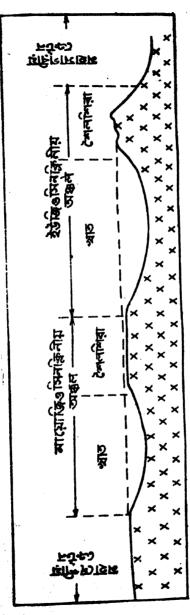
একটি শৈলশিরা এবং একটি খাতের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলিকে ইউ-জিওসিনক্লাইনীয় শৈলশিরা এবং ইউজিওসিনক্লাইনীয় খাত বলা হয়।

অনুরূপভাবে মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলে একটি মায়োজিওসিন্‌-ক্লাইনীয় শৈলশিরা এবং মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় খাতের সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে মহাদেশ থেকে মহাসাগরীয় ক্রেটনের দিকে গেলে পর্যায়ক্রমে পাওয়া যাবেঃ মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় খাত, মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় শৈলশিরা, ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় খাত এবং ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় শৈলশিরা (চিত্র 94)।

আল্‌প্‌স্‌ বা হেলেনাইডিস্‌-এর মতো জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর ইউজিও-সিন্‌ক্লাইনীয় শৈলশিরার ও খাতের সৃষ্টি হয় প্রথমে। মায়োজিও-সিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলের বিকাশ হয় তার পরে। আবার জিওসিন্‌ক্লাইনে পলির স্তূপ জমার পর ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলটি প্রথমে বিক্ষুব্ধ বা বিরূপিত হয়। মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলের বিরূপণ সুরু হয় অপেক্ষাকৃত পরে। ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় শিলাস্তূপেই সাধারণতঃ ভঙ্গিল পর্বতমালার গাঠনিক বিশেষত্বগুলির বিকাশ ভালভাবে হয়। এখানেই দেখা যায় বিশাল শায়িত বলির (recumbent fold) আবরণ এবং দূরগামী ওভারথ্রাস্ট্‌। এর তুলনায় মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলের গঠন বেশ সাদাসিধে—অনেকটা আন্তঃক্রেটনীয় পর্বতমালার (intracratonic chains; Aubouin, 1965) গঠনের মতো।

অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে একটি দীর্ঘ সমুদ্রপর্যঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই সমুদ্রপর্যঙ্কের খাতগুলিতে সমুদ্রতল ক্রমশঃ অবনমিত হয়। কোন কোন অঞ্চল ঈষৎ উন্নত হয়ে শৈলশিরার সৃষ্টি করে। সমুদ্রতলের অবনমনের সাথে সাথে পলির অব-ক্ষেপণও সুরু হয়। তারপরে ভূসংক্ষোভের ফলে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর শিলাস্তূপ বিরূপিত হয় এবং ক্রমশঃ শিলাস্তরগুলি বলিত হয় এবং শিলাস্তরে চ্যুতির সৃষ্টি হয়। জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর কোন কোন অঞ্চলের সমুদ্র থেকে ঈষৎ উত্থিত শৈলমালা ক্ষয়ে গিয়ে আবার সমুদ্রতলে পলির অবক্ষেপের সৃষ্টি করে। এই পর্যায়েই সৃষ্টি হয় ফ্লিশ্‌-জাতীয় পলির (flysch sediments)। এই ধরনের পলি বিশেষভাবে জিওসিন্‌ক্লাইনীয় পরিবেশের নির্দেশক। এই পর্যায়ের পরে, এবং জিওসিন্‌ক্লাইনের ক্রম-বিকাশের অন্তিম পর্যায়ে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনের সামনে (অর্থাৎ অর্থো-জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ এবং মহাদেশীয় ক্রেটনের মাঝে), পেছনে, অথবা অভ্যন্তরে আর এক ধরনের খাতের সৃষ্টি হয়। এই খাতে অবক্ষেপিত হয় মোলাস্‌-জাতীয় পলি (molassic sediments)। জিওসিন্‌ক্লাইনের সামনের মোলাস্‌-খাতগুলিকে সম্মুখবর্তী খাত (fore deep) বলে। অনুরূপ-

ভাবে পেছনের বা অভ্যন্তরের খাতকে যথাক্রমে পশ্চাদ্বর্তী খাত (back deep) বা মধ্যবর্তী খাত (intra deep) বলে। অবশেষে জিওসিন্‌-ক্লাইনের সমগ্র পলির স্তূপ উল্লম্ব সরণের (vertical movement) ফলে উত্থিত হয়ে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করে।

জিওসিন্‌ক্লাইনের সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে যেমন প্রচুর পরিমাণে ওফিওলাইট্‌ নির্গত হয়, তেমনি জিওসিন্‌ক্লাইনের ক্রমবিকাশের মধ্যভাগে বা শেষের দিকে পলিস্তূপের অভ্যন্তরে গ্রানিট্‌ বা গ্র্যানোডায়োরাইট্‌ জাতীয় শিলা উত্থিত হয়। উপরন্তু জিওসিন্‌ক্লাইনের ক্রমবিকাশের কোন এক পর্যায়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পাললিক ও আগ্নেয় শিলার রূপান্তরও (metamorphism) ঘটে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনের পলিস্তূপ শেষ পর্যন্ত বিরূপিত এবং উত্থিত হয়ে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করলেও বলিত পর্বতমালা মাত্রই যে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ থেকে সৃষ্ট এমন নয়। উদাহরণতঃ ইউরোপের জুরা পর্বতমালাতে (Jura Mountains) ইউ-জিওসিন্‌ক্লাইনের পাললিক এবং গাঠনিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এ ধরনের পর্বতমালাকে আন্তঃ ক্রেটনীয় পর্বতমালা (intracratonic chains; Aubouin, 1965) বলা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ বা অর্থোজিও-সিন্‌ক্লাইন্‌ সব সময়ে ক্রেটনের প্রান্তে বা দুটি ক্রেটনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হয়; কখনও ক্রেটনের অভ্যন্তরে এগুলির সৃষ্টি হয় না। এ অঞ্চলগুলির গতিশীলতা (mobility) খুব বেশী হয়। প্রচণ্ড বিরূপণের ফলে এগুলির শিলাস্তূপ বলিত হয় এবং কখনও কখনও শিলাস্তরে ওভারথ্রাস্ট্‌ এবং নাপ্‌-এর (nappe) সৃষ্টি হয়। জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে সিমা জাতীয় (simatic) আগ্নেয় শিলা উদ্গীর্ণ হয়, এবং মধ্যভাগে গ্রানিট্‌ বা গ্র্যানোডায়োরাইট্‌ জাতীয় শিলার উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে সেনোজোয়িক্‌ কালের ভঙ্গিল পর্বতমালার মতো আধুনিক কালেও কি ভঙ্গিল পর্বতমালার বিকাশ হচ্ছে? মহাদেশের কিনারায় এখনও কি জিওসিন্‌ক্লাইনের বিকাশ হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে দু'ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার কিনারায় যে দ্বীপপুঞ্জমালা এবং গভীর সামুদ্রিক খাত দেখা যায় সেগুলি নিঃসন্দেহে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনের সাথে তুলনীয়। এখানে দুটি সারিতে দ্বীপের মালা দেখা যায়। ভেতরের দিকের (অর্থাৎ মহাদেশের দিকের) সারির সুমাত্রা, জাভা, বালি, লম্বক ইত্যাদি দ্বীপগুলি প্রাচীন কেলাসিত

শিলাপীঠের (basement) ওপরে মেসোজোয়িক্ ও সেনোজোয়িক্ কালের পাললিক শিলায় গঠিত। এখানে এণ্ডেসাইট্ লাভার স্তর এবং গ্র্যানোডায়োরাইট্-এর উদ্বেধও পাওয়া যায়। এই দ্বীপপুঞ্জের সারিতে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরিও আছে। তাই এই সারিটিকে আগ্নেয়গিরির দ্বীপমালা (volcanic island arc) বলা হয়। পক্ষান্তরে, বাইরের দিকের (অর্থাৎ সমুদ্রের দিকের) তিমর, তানিম্বার ইত্যাদি দ্বীপের সারিতে কোন লাভার উদ্গীরণ দেখা যায় না। এই আগ্নেয়গিরিবর্জিত দ্বীপমালার দু'পাশে দু'টি সামুদ্রিক খাত দেখা যায়। এই দুই দ্বীপমালা এবং সামুদ্রিক খাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনের সাদৃশ্য আছে। ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি বর্জিত দ্বীপমালাটি মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলের সাদৃশ। অনুরূপভাবে আগ্নেয়গিরির দ্বীপমালাটিকে ইউজিও-সিন্‌ক্লাইনীয় অঞ্চলের অন্তর্গত বলা চলে। অনুমান করা হয় যে এই দুই দ্বীপমালার মধ্যবর্তী খাতটি জিওসিন্‌ক্লাইনের ক্রমবিকাশের শেষের দিকে সৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ এটিকে মধ্যবর্তী খাত (intra deep) অথবা আন্তঃপার্বতীয় খাত (intermontane trough) বলা চলে (Aubouin, 1965)। প্রশান্ত মহাসাগরের কিনারার অনেক জায়গাতেই এই ধরনের দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ সামুদ্রিক খাত এবং দ্বীপপুঞ্জমালা (island arcs) দেখা যায়। মোটামুটিভাবে এগুলির গঠন দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার দ্বীপমালার মতোই, তবে সবগুলি দ্বীপমালার গাঠনিক ইতিহাস পুরোপুরি একরকম নয়।

মহাদেশীয় ক্রেটনের বর্তমান উপকূলে জিওসিন্‌ক্লাইনের বিকাশের আর এক ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিম কিনারার মহীসোপান (continental shelf) অঞ্চলে পলির অবক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতল অবনমিত হয়েছে এবং তটভূমির সমান্তরালে এক গভীর পলিস্তূপ অবক্ষেপিত হয়েছে। এখানকার মহীঢালের পৃষ্ঠে পলির গভীরতা খুব অল্প। আবার মহীঢালের (continental slope) পাদদেশে দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রতলের অবনমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত অবনমিত অঞ্চলেও পাওয়া যায় এক গভীর পলির স্তূপ। এই দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ এবং অবনমিত অঞ্চল দু'টি মায়োজিওসিন্‌ক্লাইন্ এবং ইউজিওসিন্‌ক্লাইনের সাথে তুলনীয়। তবে আল্পসীয় জিওসিন্‌ক্লাইনের সাথে এদের কিছু পার্থক্যও আছে। তাই অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনের সাথে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও অতলান্তিক মহাসাগরের এই পলিস্তূপের প্রকৃত তাৎপর্য এখনও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি।

পরিচ্ছেদ ২১

ভূপৃষ্ঠের গতিশীলতা

জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর সৃষ্টি এবং সেখানকার পলিস্তূপ থেকে ভঙ্গিল পর্বতমালার উদ্ভব ভূত্বকের বিরূপণের এক চমকপ্রদ ঘটনা। এই দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গতিশীলতা সবচেয়ে বেশী। শিলাবিরূপণের এতটা আতিশয্যও অন্য কোথাও দেখা যায় না। তবে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর বাইরেও ভূপৃষ্ঠের গতিশীলতার (mobility) প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরন্তু কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের জিওসিন্‌ক্লাইনীয় গতিশীলতা চিরকাল বজায় থাকে না। গতিশীলতার এই বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ভূপৃষ্ঠকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর আলোচনার সূত্রে বলা হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠকে মোটামুটিভাবে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ **ক্রেটন্‌** এবং **জিওসিন্‌ক্লাইন্‌**। ভূপৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অংশগুলিকে বলা হয় ক্রেটন্‌। অর্থাৎ, অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ বাদে মহাদেশ ও মহাসাগরের সমস্ত অংশটিকে ক্রেটন্‌ বলা হয়।

মহাদেশীয় ক্রেটন্‌-এর কোন কোন অংশ কখনও অল্পবিস্তর অবনমিত হয়ে জলমগ্ন হয়েছে অথবা কখনও ঈষৎ উত্থিত হয়েছে। জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর তুলনায় এ অঞ্চলগুলির অবনমন বা উত্থানের হার খুব অল্প। অবনমিত অঞ্চলগুলিতে অবক্ষেপিত হয়েছে প্রাক্‌কেম্‌ব্রিয়ান্‌ কল্পের (precambrian era) পরবর্তী সময়ের পলিস্তূপ। এই পলিস্তূপ কোথাও মোটামুটিভাবে অবিরূপিত আছে অথবা কোথাও সামান্য কিছুটা বলিত হয়েছে। মহাদেশীয় ক্রেটন্‌-এর এই অংশগুলিকে সাধারণভাবে **প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌** বলা হয়। উদাহরণতঃ বলা যায় যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের কচ্ছ অঞ্চলের জুরাসিক্‌ পলির স্তূপ এই ধরনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌-এ অবক্ষেপিত হয়েছে। প্রাক্‌কেম্‌ব্রিয়ান্‌ কল্পের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত মহাদেশীয় ক্রেটন্‌-এর যে বিশাল অংশগুলি মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল আছে সে অঞ্চলগুলিকে **শিল্ড্‌** (shield) বলা হয়।

সাধারণতঃ যে প্রক্রিয়ায় ভূত্বকের গতিশীলতা খুব বেশী এবং যার ফলে ভঙ্গিল পর্বতমালার মত গতিশীল অঞ্চলগুলির সৃষ্টি হয় সেই প্রক্রিয়াকে **অরোজেনেসিস্‌** (orogenesis) বলা হয়। পক্ষান্তরে, ভূত্বকের যে প্রক্রিয়ার

ফলে ভূপৃষ্ঠের বিশাল অঞ্চল মন্থরগতিতে অবনমিত বা উত্থিত হয় সেই মন্থর প্রক্রিয়াকে এপিরোজেনেসিস্ (epeirogenesis) বলা হয়। একমাত্র অরোজেনেসিস্-এর ফলেই শিলার আভ্যন্তরীন গঠনগুলির সৃষ্টি হয়; এপিরোজেনেসিস্-এর ফলে উত্থিত বা অবনমিত অঞ্চলের শিলার অভ্যন্তরে কোন নতুন গঠনের সৃষ্টি হয় না। অবশ্য অরোজেনেসিস্ এবং এপিরোজেনেসিস্-এর এই প্রভেদীকরণ আধুনিককালে সর্বসম্মত নয় (Belonssov, 1962)। তবে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাথে যে প্ল্যাটফর্ম্ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার প্রভেদ আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মহাদেশের প্রাচীনতম স্থিতিশীল অংশগুলিতে—অর্থাৎ শিল্ড্গুলিতে—বিরূপণের চিহ্ন পাওয়া যায় না এমন নয়। বরঞ্চ এই অংশগুলিতে বিরূপণের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ জটিল গঠনের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই শিল্ড্গুলি প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান্ কল্পের পরবর্তী যুগেই স্থিতিশীল হয়েছে; প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান্ কল্পে শিল্ড্গুলি সর্বত্র স্থিতিশীল ছিল না। বস্তুতঃ প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান্ শিল্ড্-এর অনেক অঞ্চলের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ভঙ্গিল পর্বতমালার বৈশিষ্ট্যগুলির বেশ কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান্ শিলাস্তূপেও প্রাচীন অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্-এর অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে শিল্ড্ অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই শিলারূপান্তরের (metamorphism) আতিশয্যের ফলে এবং উপর্যুপরি বিরূপণের ফলে বিভিন্ন সময়ের জিওসিন্‌ক্লাইন্গুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে চেনা দুরূহ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এখনকার স্থিতিশীল শিল্ড্গুলির বিভিন্ন অংশে প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান্ যুগে বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা ছিল।

উদাহরণতঃ প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান্ কল্পের বিভিন্ন অরোজেনি মণ্ডলের (orogenic belt) সমষ্টিতে ভারতীয় শিল্ড্টি গঠিত (Krishnan, 1953; Holmes, 1955)। রাজস্থানের উত্তরভাগের এক দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে আরাবল্লী অরোজেনি-মণ্ডল এবং দিল্লী অরোজেনি-মণ্ডল মোটামুটিভাবে উত্তর-পূর্বদিকে প্রলম্বিত। আবার বিহার ও উড়িষ্যার সিংভূম ও গাংপুর অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত আর একটি আরোজেনি মণ্ডল দেখা যায়। মধ্যভারতে দেখা যায় পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব দিকে বিস্তৃত সাতপুরা অরোজেনি মণ্ডল। আবার, ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলের সমান্তরালে আছে পূর্বঘাট অরোজেনি মণ্ডল এবং দক্ষিণ ভারতের ধারওয়ার্ অরোজেনি মণ্ডল প্রলম্বিত হয়েছে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে। ভারতীয় শিল্ড্-এর অরোজেনি

মণ্ডলগুলির বিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত বেশ কিছুটা অসম্পূর্ণ আছে। বিশেষ করে এখানে প্রত্যেকটি অঞ্চলেই দেখা যায় যে বিভিন্ন কালের বিরূপণ একই শিলায় উপর্যুপরি আরোপিত হয়েছে এবং আগেকার বলির ভঙ্গী পরবর্তী বিরূপণে পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে অরোজেনি মণ্ডলগুলির বিশ্লেষণও অনেক দুরূহ হয়ে পড়ে। উদাহরণতঃ আরাবল্লী অরোজেনি মণ্ডলটি উত্তর-পূর্ব দিকে প্রলম্বিত বলা হলেও এখানকার প্রাচীনতর বলিসমূহ অনেক জায়গাতেই পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত (Naha and Majumdar, 1971)। বিহারের সিংভূম অঞ্চলেও এই ধরনের উপর্যুপরি বিরূপণের চিহ্ন পাওয়া যায় (Sarkar and Saha, 1963)।

প্রাক্‌কেম্‌ব্রিয়ান্‌ কল্পের পরবর্তী কালে মোটামুটভাবে তিনটি স্বতন্ত্র সময়ে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ থেকে ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্যালিওজোয়িক্‌-এর গোড়ার দিকের এবং মধ্যভাগের ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলির সৃষ্টির ধারাকে **ক্যালিডোনীয়** অরোজেনি (caledonian orogeny) আখ্যা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্যালিও-জোয়িক্‌-এর শেষের দিকের পর্বতমালাগুলির সৃষ্টি হয় **হার্‌সিনীয়** (Hercynian) অরোজেনির ফলে। সেনোজোয়িক্‌ কালের পর্বতমালা-গুলির সৃষ্টি হয় **আল্‌প্‌সীয়** অরোজেনির ফলে। উদাহরণতঃ ক্যালি-ডোনীয় অরোজেনির প্রমাণ পাওয়া যায় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পশ্চিম প্রান্তে এবং গ্রেট্‌ ব্রিটেনের উত্তর ভাগে। আবার ইউরাল্‌ পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে হার্‌সিনীয় অরোজেনিতে এবং আল্‌প্‌স্‌ বা হিমালয়ের সৃষ্টি হয়েছে আল্‌প্‌সীয় অরোজেনিতে। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে Bucher, 1933; Umbgrove, 1947 এবং 1950 দ্রষ্টব্য)।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে মহাদেশীয় অঞ্চলগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—শিল্ড্‌, প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ এবং ভঙ্গিল পর্বতমালা। প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতমালা বা অরোজেনি মণ্ডলগুলি তাদের গতিশীলতা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে শিল্ড্‌-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে মহাদেশীয় ভূত্বক অবনমিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের পাললিক পর্যঙ্কের (sedimentary trough) সৃষ্টি করেছে। শুধু অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ এবং প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌-এর স্থূল শ্রেণীবিভাগে পাললিক পর্যঙ্কের এই বৈচিত্র্য ধরা পড়ে না। সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগে পাললিক পর্যঙ্কগুলির বিভিন্নরকম নামকরণ করা হয়েছে এবং এ-সম্পর্কে একাধিক শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত হয়েছে। কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের পাললিক পর্যঙ্ককে বিভিন্ন ধরনের জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (Kay,

1945)। আবার ফরাসী ভূতাত্ত্বিক ওবয়াঁ-এর মতে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ ছাড়া অন্য কোন পাললিক পর্যঙ্ককে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ আখ্যা দেওয়া চলেনা। নামকরণের এই বিতর্কিত বিষয়টি বাদ দিয়ে বলা চলে যে মোটামুটিভাবে তিন ধরনের পর্যঙ্কে পাললিক শিলাস্তূপ অবক্ষেপিত হয়ঃ

(১) অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌, (২) অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর অন্তিম পর্যায়ে বা অব্যবহিত পরে যে পর্যঙ্কগুলির সৃষ্টি হয়, এবং (৩) ক্রেটনের অভ্যন্তরে যে পর্যঙ্কগুলির সৃষ্টি হয়।

এই তিন শ্রেণীর পর্যঙ্ককে আবার বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌

এগুলি ক্রেটন্‌-এর প্রান্তে বা দুটি ক্রেটন্‌-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকে; কখনও ক্রেটন্‌-এর অভ্যন্তরে এগুলির সৃষ্টি হয় না। রুশ ভূবিজ্ঞানীরা এধরনের পর্যঙ্ককে প্রাথমিক জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ (primary geosyncline) আখ্যা দিয়েছেন। অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত বিভাগগুলিকে আলাদা করা যায়ঃ

(*i*) **মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় খাত**
(*ii*) **ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় খাত**
(*iii*) **মায়োজিওসিন্‌ক্লাইনীয় শৈলশিরা**
(*iv*) **ইউজিওসিন্‌ক্লাইনীয় শৈলশিরা**

(২) অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইনীয় পর্বতমালার সৃষ্টি চরম পর্যায়ে বা অন্তিম পর্যায়ে যে পর্যঙ্কগুলির সৃষ্টি হয়েছে

রুশ ভূবিজ্ঞানীরা এগুলিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ বলেন।

(*i*) **সম্মুখবর্তী খাত** (fore-deep)।

পর্বতমালা এবং মহাদেশীয় ক্রেটন্‌-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এগুলির সৃষ্টি হয়। মার্কিন ভূবিজ্ঞানী মার্শাল্‌ কে (Marshall kay, 1951) এগুলিকে এক্সোজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ আখ্যা দিয়েছেন।

(*ii*) **মধ্যবর্তী খাত** (intra-deep) এবং **পশ্চাদ্বর্তী খাত** (back-deep)।

ঈষৎ উত্থিত পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অথবা পশ্চাতে (অর্থাৎ, মহাসাগরীয় ক্রেটন্‌-এর দিকে) এগুলির সৃষ্টি হয়। মার্শাল্‌ 'কে' এগুলিকে এপিইউজিওসিন্‌ক্লাইন্‌ (epieugeosyncline) আখ্যা দিয়েছেন।

(৩) ক্রেটন্-এর অভ্যন্তরে যে পর্যঙ্কগুলির সৃষ্টি হয়

রুশ ভূবিজ্ঞানীরা এগুলিকে অবশিষ্ট জিওসিনক্লাইন্ (residual geo-syncline) আখ্যা দিয়েছেন।

(*i*) **আন্তঃ ক্রেটনীয় খাত** (intracratonic furrow)।

এগুলি আকারে দীর্ঘ হয় এবং অনেক সময়ে পর্বতমালার সৃষ্টি করে। তবে অর্থোজিওসিন্‌ক্লাইন্-এর মতো এগুলিতে ওফিওলাইট্-এর উদ্গীরণ হয় না। মার্শাল্ কে-এর শ্রেণীবিভাগে এগুলিকে জিউগো-জিওসিন্‌ক্লাইন্ (zeugogeosyncline) বলা হয়েছে।

(*ii*) **যে পর্যঙ্কগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মোটামুটি সমান**

সাধারণতঃ এ ধরনের পর্যঙ্ককে বেসিন্ (basin) বলা হয়। কে-এর শ্রেণীবিভাগে এগুলিকে অটোজিওসিন্‌ক্লাইন্ (autogeosyncline) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২২

ভঙ্গিল পর্বতমালার কয়েকটি গাঠনিক বৈশিষ্ট্য

মানচিত্রে ভঙ্গিল পর্বতমালার বিন্যাসঃ ভির্‌গেশন্, সিনট্যাক্‌সিস্, ডিফ্লেক্‌শন্ এবং লিংকেজ্।

অরোজেনি-অঞ্চলে কোন কোন সময়ে দেখা যায় অনেকগুলি বলির একটি গুচ্ছ এক জায়গা থেকে বিভিন্ন দিকে প্রলম্বিত হচ্ছে। বিভিন্ন শাখায় প্রলম্বিত এই ধরনের বলিগুচ্ছকে (চিত্র 95) সুয়েস্ আখ্যা দিয়েছেন **ভির্‌গেশন** (virgation)। আবার কতকগুলি বলি যদি বিভিন্ন দিক্ থেকে এসে একদিকে অভিসারী (convergent) হয়, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বলিগুচ্ছটি হঠাৎ বেঁকে যায়, তাহলে সেই বক্র বলিগুচ্ছটিকে (চিত্র 95) **সিন্‌ট্যাক্‌সিস্** (syntaxis) বলে। হিমালয়ের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে এই ধরনের সিন্‌ট্যাক্‌সিস্ দেখা যায়। বলিগুলি অভিসারী হোক্ বা না হোক্, পর্বতশ্রেণীর বিশালাকার বলিগুলি যদি হঠাৎ দিক্ পরিবর্তন ক'রে একটি বাঁকের সৃষ্টি করে, তাহলে সেই বাঁকটিকে (চিত্র 95) **ডিফ্লেক্‌শন্** (deflection) বলে। এই সংজ্ঞা অনুসারে হিমালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের বাঁক দুটিকে ডিফ্লেক্‌শন্ বলা যায়। পর্বতশ্রেণীর বিশালায়তন বলিগুলির ট্রেন্ড্ যদি ঈষৎ বক্র হয় তাহলে সেই গঠনটিকে **আর্কুয়েশন্** (arcuation) বলা হয়। পর্বতশ্রেণীর বা অরোজেনি—অঞ্চলের বক্ররেখার চাপগুলি (arcs) অবিচ্ছিন্ন না হতেও পারে। এক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় যে বক্র শ্রেণীর চাপগুলি একটি আর একটির গায়ে তির্যক্‌ভাবে এসে শেষ হচ্ছে। এ ধরনের গঠনকে **লিংকেজ্** (linkage) বলা হয় (চিত্র 95)। ডিফ্লেক্‌শন, ভিরগেশন্, সিন্‌ট্যাক্‌সিস্ এবং লিংকেজ—এগুলির প্রত্যেকটিই অরোজেনি অঞ্চলের এক একটি বৈশিষ্ট্যময় গঠন। (এ সম্পর্কে দীর্ঘতর আলোচনার জন্যে Bucher, 1933 দ্রষ্টব্য)।

অরোজেনিজাত ভূসংকোচে শিলাপীঠের প্রতিক্রিয়া

ভঙ্গিল পর্বতমালার বিভিন্ন অঞ্চলে পলিস্তূপের নীচে শিলাপীঠের (basement) বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ভঙ্গিল পর্বতমালার সম্মুখবর্তী অঞ্চলে সাধারণতঃ একমাত্র পলিস্তূপটিই বলিত হয়; তল-

চিত্র - 95: মানচিত্রে অরোজেনি মণ্ডলের বিভিন্ন আকার।
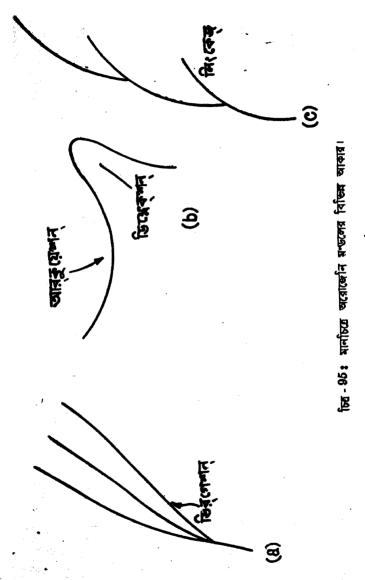
দেশের শিলাপীঠ এ-বিরূপণে অংশগ্রহণ করে না। উদাহরণতঃ ইউরোপের জুরা পর্বতমালার গাঠনিক নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে এখানকার শিলা-পীঠের পৃষ্ঠটি মোটামুটিভাবে অনুভূমিক থেকে গিয়েছে (চিত্র 96)।

ওপরের পলির স্তর শিলাপীঠের থেকে খুলে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বলিত হয়েছে। এ ধরনের গঠনকে দেকোল্‌ম' (décollement) বলে। এ ধরনের গঠন অবশ্য পলিস্তূপের অভ্যন্তরেও সৃষ্ট হতে পারে। নীচের স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওপরের স্তর যদি স্বতন্ত্রভাবে বলির সৃষ্টি করে তাহলে সেই গঠনটিকে দেকোল্‌ম' বলা হয়। ওপরের বলিত স্তর এবং
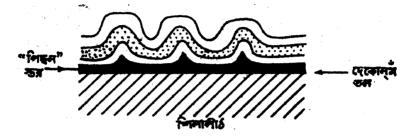
চিত্র - 96 : দেকোল্‌ম' (décollement)

নীচের অবিরূপিত স্তরের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠটিকে দেকোল্‌ম' তল (surface of décollement) বলা হয় (চিত্র 96)। দেকোল্‌ম' সৃষ্টির জন্যে ওপরের ও নীচের শিলাস্তূপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অত্যন্ত অদৃঢ় (incompetent) কোন স্তর থাকার প্রয়োজন। এই অদৃঢ় স্তরের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে ওপরের স্তরটি স্বতন্ত্রভাবে বলির সৃষ্টি করতে পারে। জুরা পর্বতমালায় ট্রায়াসিক্‌-কালের এ্যান্‌হাইড্রাইট্‌-এর স্তর এই ধরনের একটি "পিছল" পৃষ্ঠ সৃষ্টি করার ফলেই সেখানকার দেকোল্‌ম' সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে (চিত্র 96)।

ভঙ্গিল পর্বতমালার অভ্যন্তরের শিলাপীঠ (basement) অবশ্য এভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে না। সেখানে অরোজেনি-জাত বিরূপণের সময়ে শিলাপীঠেও বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা দেখা যায়। কোথাও শিলাপীঠে ছোট থ্রাস্ট্‌-ফল্টের সৃষ্টি হয়, কোথাও শিলাপীঠের একটি সঙ্কীর্ণ অংশ চ্যুতির ফলে ওপরে উঠে এসে নবীনতর পলিস্তূপের ওপর দিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়, আবার আল্‌প্‌স্‌-এর পেনাইন্‌-অঞ্চলের মতো কোথাও দেখা যায় পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন শিলাপীঠের বিশালাকার শায়িত বলির ক্রোড়।

অধিরোপণ চ্যুতি এবং ন্যাপ্‌

ভঙ্গিল পর্বতমালার অভ্যন্তরে বিভিন্ন পরিমাপের এবং বিভিন্ন দূরত্বগামী থ্রাস্ট্‌ ফল্ট্‌-এর সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে স্বল্পনত দূরগামী থ্রাস্ট্‌

ফল্টগুলিকে **অধিরোপণ চ্যুতি** (overthrust) বলা হয়। অধিরোপণ চ্যুতির ওপরের দূরগামী শিলাস্তূপটিকে অধিরোপিত আবরণ (overthrust sheet) বলা হয়।

আল্প্সীয় গঠনের বর্ণনার জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ফরাসী নাপ্ (nappe) শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চ্যুতির ফলে অথবা বিশালাকার শায়িত বলির (recumbent fold) সৃষ্টির ফলে একটি শিলাস্তূপ অন্য শিলাস্তূপের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে যে আবরণটির সৃষ্টি করে তা'কে **নাপ্** বলা হয়। উদাহরণতঃ, আল্প্স্ পর্বতমালার আভ্যন্তরীন অঞ্চলের মন্টি রোসা নাপ্ (Monte Rosa nappe) একটি বিশালাকার শায়িত বলির আকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সম্মুখবর্তী শিলাস্তূপকে আবৃত করে রেখেছে আল্প্সীয় জিওসিনক্লাইন্-এর শিলাপীঠের কেলাসিত (crystalline) মেসোজোয়িক্ শিলাস্তূপে এই নাপ্-এর ক্রোড়টি গঠিত। তবে এ ধরনের শায়িত বলির নাপ্ অপেক্ষাকৃত বিরল (Bailey, 19[illegible] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি চ্যুতিতলের ওপর দিয়ে নাপ্টি সম্মুখে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে নাপ্ শব্দটি মোটামুটিভাবে অধিরোপিত আবরণের (overthrust sheet) সাদৃশ। তবে চ্যুত শিলাস্তূপটি বহুদূর অগ্রসর হলেই সাধারণতঃ নাপ্ শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত (Aubouin, 1965, পৃঃ 185)। অর্থাৎ, সাধারণত অধিরোপিত আবরণটির অগ্রগমনের মান খুব বেশী না হলে সেটিকে নাপ্ আখ্যা দেওয়া হয় না।

অধিরোপিত আবরণটিকে বা নাপ্কে **স্থানচ্যুত** (allochthonous) শিলাস্তূপ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আবার অপর পক্ষে যে শিলাস্তূপ স্থানচ্যুত হয়নি সেটিকে **স্বস্থানীয়** (autochthonous) বলা হয়। আবার যে শিলাস্তূপ বলিত হওয়ার ফলে অথবা চ্যুতির ফলে সরে এসেছে, অথচ যার অগ্রগমনের মান (আল্প্সীয় পরিমাপে) খুব বেশী নয় সেই শিলাস্তূপকে **উপস্থানীয়** (parautochthonous) বলা হয় (Bailey, 1935 দ্রষ্টব্য)।

অধিরোপিত আবরণ বা নাপ্-এর 'মূল'

ভঙ্গিল পর্বতমালার স্থানচ্যুত শিলাস্তূপগুলির বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে যে এ গঠনগুলির মূলে (root) কোথায়? ভঙ্গিল পর্বতমালার গাঠনিক বর্ণনায় 'মূল' কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটি শায়িত এন্টিক্লাইন্-এর ক্ষেত্রে এন্টিক্লাইন্-এর ক্রোড়ের (core) অংশটি বলির পশ্চাৎভাগের যে অঞ্চলে প্রোথিত হচ্ছে দেখা যায়

সেই অঞ্চলটিকে বলিটির মূল বলা হয়। কার্যক্ষেত্রে যখন একটি শায়িত বলির বা নাপ্-এর মূল খোঁজা হয়, তখন গঠনটির পশ্চাৎভাগের যে অঞ্চলে গঠনটি অবশেষে ভূমিতে প্রবেশ করছে দেখা যায় সেই অঞ্চলটিকে গঠনটির মূল বলা হয়।

ক্লিপে এবং গাঠনিক বাতায়ন

ভঙ্গিল পর্বতমালার ক্ষয়ের ফলে একটি নাপ্-এর উদ্বেধগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, অথবা নাপ্-এর নিম্নস্থ স্বস্থানীয় শিলাস্তর উদ্বেধে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মানচিত্রে একটি অধিরোপিত আবরণের উদ্বেধ যখন নিম্নস্থ শিলার উদ্বেধ দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত হয়ে প্রধান আবরণটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন
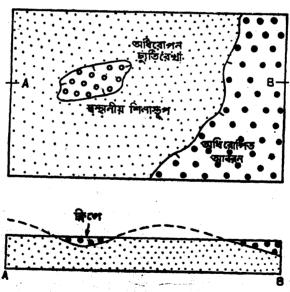
চিত্র - 97 : মানচিত্র এবং উল্লম্ব ছেদতলে ক্লিপে (klippé)।

সেই অধিরোপিত আবরণের বিচ্ছিন্ন অংশটিকে ক্লিপে (klippé) বলা হয় (চিত্র 97)। আবার, মানচিত্রে একটি অধিরোপিত আবরণের নিম্নস্থ শিলাস্তূপের উদ্বেধ যখন চতুর্দিকে অধিরোপিত আবরণটির উদ্বেধ

দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত হয়, তখন নিম্নস্থ শিলাস্তূপের উন্মেষটিকে গাঠনিক বাতায়ন (tectonic window) বলা হয় (চিত্র 98)।
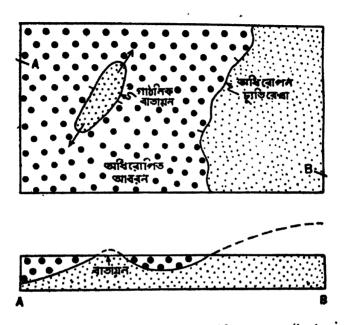
চিত্র - 98 : মানচিত্র এবং উল্লম্ব ছেদতলে গাঠনিক বাতায়ন (tectonic window)

পরিচ্ছেদ ২৩

হিমালয়ের গঠন

হিমালয়ের আর্কুয়েশন্ এবং সিন্ট্যাক্সিস্

ভারতীয় শিল্ড্-এর উত্তর প্রান্তে কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত এক দীর্ঘ এবং ঈষৎ বক্র অঞ্চলে হিমালয় পর্বতমালা প্রসারিত। ইয়োরোপের আল্প্স্ পর্বতমালার আর্কুয়েশন্ উত্তরদিকে উত্তল, কিন্তু হিমালয়ের আর্কুয়েশন্ দক্ষিণদিকে উত্তল। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পর্বত-শ্রেণীটি হঠাৎ একটি মোড় ঘুরে একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকে গিয়েছে। ওয়াদিয়া'র মতে এই অঞ্চলের বলি-অক্ষগুলিও শৈলশ্রেণীর সাথে একই ভাবে মোড় ঘুরেছে। হিমালয়ের এই বাঁকটিকে পশ্চিম হিমালয়ের সিন্ট্যাক্সিস্ (Northwest Himalayan syntaxis) বলা হয় (Wadia, 1931)। অনুমান করা হয় যে হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তেও এই রকম একটি সিন্ট্যাক্সিস্ রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হিমালয়ের শ্রেণী আসামের কাছে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে।

হিমালয়ের বিভিন্ন ভৌগোলিক বিভাগ

হিমালয় পর্বতমালাকে মোটামুটিভাবে চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ—(১) পাদদেশ, (২) নিম্ন হিমালয়, (৩) উচ্চ হিমালয় এবং (৪) টেথিস্ হিমালয় বা তিব্বতী অঞ্চল (চিত্র 99)। 5 থেকে 10 কিমি চওড়া পাদদেশের অঞ্চলটি সেনোজোয়িক কালের শিবালিক, মারী এবং ইওসিন্-এর পাললিক শিলায় গঠিত। 70 থেকে 120 কিমি চওড়া নিম্ন হিমালয়ের অঞ্চলটি প্রাক্কেম্ব্রীয় থেকে সেনোজোয়িক্ কালের জীবাশ্ম-বর্জিত শিলায় গঠিত। 60 থেকে 95 কিমি চওড়া উচ্চ হিমালয়ের অঞ্চলটি হিমালয়ের উচ্চতম অংশ এবং এখানেই হিমালয়ের অধিকাংশ তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি অবস্থিত। উচ্চ হিমালয়ে নিম্ন হিমালয়ের শিলাস্তর সমূহ ছাড়াও বেশ কিছু গ্রানিট্ এবং নাইস্ জাতীয় শিলা পাওয়া যায়। 70 কিলোমিটারের চেয়েও চওড়া টেথিস্ হিমালয়ে কেম্ব্রিয়ান্ থেকে সুরু করে ইওসিন্ কালের জীবাশ্মসম্বলিত স্তরপরম্পরা পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে এই চারটি অঞ্চলের গঠনেরও বেশ কিছুটা প্রভেদ দেখা যায় (চিত্র 99 দ্রষ্টব্য)।

চিত্র - 99 : হিমালয়ের প্রধান গাঠনিক বিভাগসমূহ।
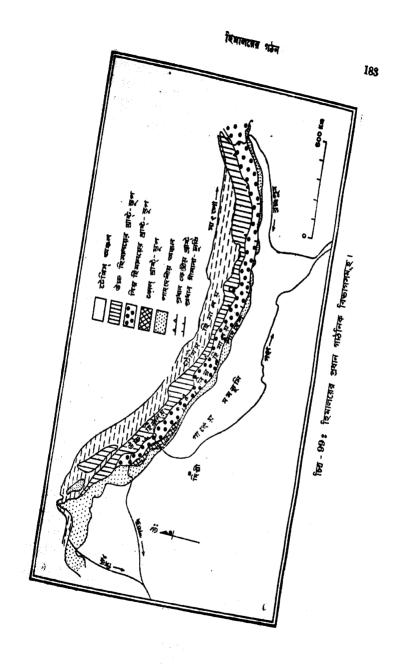
হিমালয় পর্বতমালার গঠন বহুলাংশেই আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। কুমায়ুন্-এর মতো কোন কোন অঞ্চল ছাড়া হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চলেই বিশদভাবে কোন গাঠনিক বিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত হয়নি। উপরন্তু নিম্ন হিমালয়ের শিলাস্তূপে জীবাশ্ম না থাকায় শিলাস্তরের কালপরম্পরা নিরূপণে বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে গিয়েছে। হিমালয়ের গাঠনিক বিশ্লেষণেও এই অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত হয়েছে।

পাদদেশ অঞ্চলের গঠন

হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলের অধিকাংশটাই শিবালিক্ শিলায় গঠিত। এই পাদদেশ অঞ্চলের দক্ষিণে আছে গঙ্গা-সিন্ধুর পলিগঠিত সমভূমি এবং এই পাদদেশ অঞ্চলের উত্তর সীমা নির্দেশ করছে একটি চ্যুতিরেখা। এই চ্যুতিটিকে প্রধান সীমানা-চ্যুতি (Main Boundary Fault) বলা হয়। শিবালিক শিলাস্তর অবশ্য কেবল সানুদেশের পার্বত্য অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। গাঙ্গেয় সমভূমির আধুনিক পলির নীচ দিয়ে শিবালিক এবং প্রাচীনতর শিলাস্তর বিস্তৃত হয়েছে। এই অঞ্চলটিকে ধরলে, গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিবালিক শিলাস্তূপটিকে মোটামুটিভাবে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়।

(১) সবচেয়ে উত্তরে, প্রধান সীমানা-চ্যুতির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটি বেশ কিছুটা বলিত হয়েছে এবং ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলি খাড়াই ভঙ্গীর চ্যুতির দ্বারা বিভক্ত হয়েছে (চিত্র 100)। খাড়াই হলেও এই চ্যুতিগুলিকে সাধারণতঃ থ্রাস্ট্ ফল্ট্ বলা হয়। থ্রাস্ট্ ফল্ট্-এর ঊর্ধ্বগামী সরণের ফলে কোন কোন অঞ্চলে প্রাচীনতর (নিম্ন মায়োসিন্ কালের) ধরমশালা শিলাস্তর ওপরে উঠে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই খাড়াই চ্যুতিগুলি উত্তর দিকে নত। পাদদেশ অঞ্চলের বলির অক্ষতলগুলিও বেশ খাড়াই হয়। এখানে কোন শায়িত বলি বা প্রণত বলির (recumbent fold or reclined fold) সৃষ্টি হয়নি। পূর্ব পাঞ্জাবের পাদদেশ অঞ্চলে প্রধান সীমানা-চ্যুতির গায়েই মৃদুভাবে বলিত শিবালিক শিলাস্তর পাওয়া যায়। এখানে চ্যুতির সংখ্যাও অনেক কম। অনুমান করা হয় যে এখানকার চ্যুতিযুক্ত শিবালিক অঞ্চলটি প্রাচীনতর শিলার অধিরোপিত আবরণে আবৃত হয়ে আছে।

(২) হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণভাগে (অর্থাৎ, প্রথম অঞ্চলটির ঠিক দক্ষিণে) শিবালিক শিলাস্তর মৃদুভাবে বলিত হয়েছে (চিত্র 101)। এখানে চ্যুতির সংখ্যাও কম এবং চ্যুতিগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। এখানেও

চিত্র - 100 : উত্তর প্রদেশের রামগঙ্গা নদীর কাছে হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলের প্রস্থচ্ছেদ (Mathur and Evans, 1964 অবলম্বনে)।
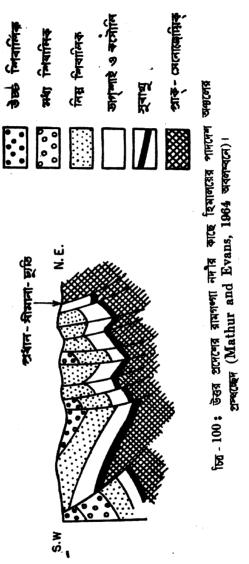
খাড়াই এবং উত্তরদিকে নত চ্যুতিগুলিকে সাধারণতঃ থ্রাস্ট্ ফল্ট্ হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

(৩) গঙ্গা-সিন্ধুর পলিগঠিত সমভূমির নিম্নস্থিত শিবালিক শিলাস্তর আবরূপিত আছে বা খুব মৃদুভাবে বলিত হয়েছে (চিত্র 101)।
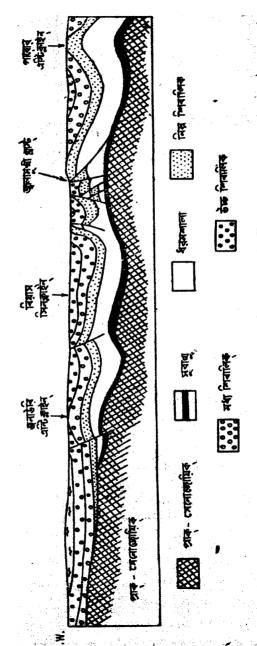
চিত্র - 101 : পাঞ্জাবের পাদদেশ অঞ্চলের প্রস্থচ্ছেদ (Mathur and Evans, 1964 অবলম্বনে)।

চ্যুতির উৎপত্তির আলোচনা সূত্রে আগেই বলা হয়েছে যে সাধারণতঃ থ্রাস্ট্ ফল্ট্গুলির নতির মান অল্প হয় এবং গ্র্যাভিটি ফল্ট্গুলির নতির মান বেশী হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে হিমালয়ের সানুদেশের খাড়াই থ্রাস্ট্ ফল্ট্গুলির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। মাথুর এবং ইভান্স্-এর (Mathur and Evans, 1964) মতে শিবালিক পলিস্তর অবক্ষেপিত হওয়ার সময়ে কতকগুলি খাড়াই গ্র্যাভিটি ফল্ট্-এর সৃষ্টি হয়। পরে শিলাস্তূপ বিরূপিত বা বলিত হওয়ার সময়ে এই প্রাচীনতর চ্যুতিতলগুলি থ্রাস্ট্ ফল্ট্ হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়। অপর পক্ষে গ্যান্সার্-এর মতে শিবালিকের খাড়াই চ্যুতিগুলি থ্রাস্ট্ ফল্ট্ হিসেবেই সৃষ্ট হয়েছে এবং এগুলির নতি গভীরাঞ্চলে গিয়ে অনেকটা কমে এসেছে।

ক্রমবর্ধমান হিমালয়শ্রেণীর সম্মুখবর্তী খাতে (fore deep) ভারতীয় শিল্ড্-এর উত্তরে শিবালিক পলিস্তূপ অবক্ষেপিত হয়েছে। এই পলিস্তূপ আল্প্স্ পর্বতমালার সম্মুখবর্তী মোলাস্ পলিস্তূপের সদৃশ। হিমালয়ের শিলাস্তূপ কিছুটা বিরূপিত হওয়ার পর শিবালিকের পলির অবক্ষেপণ সুরু হয়। অনুমান করা হয় যে প্লাইস্টোসিন্ কালের গোড়ার দিকে এবং মধ্যভাগে শিবালিকের বলি এবং চ্যুতিগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধান সীমানা-চ্যুতি (Main Boundary Fault)

শিবালিক শিলাস্তূপের উদ্বেধের উত্তর সীমানায় প্রধান সীমানা-চ্যুতিটি অবস্থিত (চিত্র 100)। এক সময়ে মনে করা হয়েছিল যে এই চ্যুতিরেখাটি শিবালিক্-পলির অবক্ষেপণের উত্তরসীমা নির্দেশ করছে। সেইজন্যে এটিকে সীমানা-চ্যুতি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী নিরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে এই চ্যুতিরেখাটির উত্তরেও শিবালিক-পলি অবক্ষেপিত হয়েছিল, তবে প্রাচীনতর শিলার থ্রাস্ট্-এর আবরণে সেগুলি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। প্রধান সীমানা-চ্যুতির উত্তরে নিম্ন হিমালয়ের শিলাস্তূপ অবস্থিত। চ্যুতিরেখার গায়ে বিভিন্ন জায়গায় নিম্ন হিমালয়ের বিভিন্ন শিলাস্তূপ বা বিভিন্ন গাঠনিক অংশগুলি শিবালিকের সংস্পর্শে এসেছে।

প্রধান সীমানা-চ্যুতিটি বেশ খাড়াই এবং সব ক্ষেত্রেই উত্তর দিকে নত। এই চ্যুতিটিকে নিঃসন্দেহে একটি থ্রাস্ট্ ফল্ট্ বলা যায়। গ্যান্সার্-এর মতে এই চ্যুতিটির নতি গভীরতর অঞ্চলে ক্রমশঃ কমে এসেছে, এবং এই চ্যুতিটি প্রকৃতপক্ষে একটি দূরগামী অধিরোপণ চ্যুতি। গ্যান্সার্-এর মতে কোন কোন অঞ্চলে প্রধান সীমানা-চ্যুতিটিকে রিলিফ্ থ্রাস্ট্ (relief

thrust) বলা চলে। কোন একটি থ্রাস্ট্ ফল্ট্-এর ঊর্ধ্বভাগের শিলাস্তূপ যখন ভূমিপৃষ্ঠে উঠে এসে সামনের ক্ষয়ে যাওয়া জমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হয় তখন সেটিকে রিলিফ্ থ্রাস্ট্ বলে। হাইম্ এবং গ্যান্সার্ (Heim and Gansser, 1939) অনুমান করেন যে তিস্তা নদীর পূর্ব তীরে ক্ষয়-প্রাপ্ত শিবালিক শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে নিম্ন হিমালয়ের শিলাস্তূপ দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে একটি রিলিফ্ থ্রাস্ট্-এর সৃষ্টি করেছে। অপরপক্ষে, অনেকের মতে প্রধান সীমানা-চ্যুতির ভঙ্গী গভীরাঞ্চলেও খাড়াই রয়েছে।

নিম্ন হিমালয়ের গঠন

নিম্ন হিমালয়ের বিশদ গাঠনিক নিরীক্ষা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলির গঠনের সমন্বয় থেকে নিম্ন হিমালয়ের সমগ্র গঠনটির রূপ এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হয়নি।

গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখতে গেলে মোটামুটিভাবে নিম্ন হিমালয়ে দু'ধরনের শিলাস্তূপ দেখা যায়। অধিকাংশ অঞ্চলেই শিলা-স্তূপগুলি অধিরোপণ চ্যুতির (overthrust) ফলে অবক্ষেপণের আদি অঞ্চল থেকে দূরে সরে এসেছে। এই স্থানচ্যুত শিলার আবরণ ছাড়াও নিম্ন হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে স্বস্থানীয় (autochthonous) বা উপস্থানীয় (parautochthonous) শিলাস্তূপও দেখা যায়। আবার স্থানচ্যুত আবরণগুলির গঠন দু'ধরনের হতে পারে। কোন কোন অঞ্চলের স্থানচ্যুত আবরণটি বিশালাকার শায়িত বলিসমূহে গঠিত হয়। আবার কোন কোন অধিরোপিত শিলাস্তূপে বিশালাকার শায়িত বলি অথবা স্তরের বিপর্যয় (inversion) দেখা যায় না; সমগ্র অধিরোপিত আবরণটিতে দেখা যায় স্তরগুলির স্বাভাবিক পরম্পরা বজায় আছে।

উদাহরণতঃ নিম্ন হিমালয়ের দক্ষিণভাগে দেখা যায় কুমায়ূন অঞ্চলের ক্রোল্ থ্রাস্ট্-এর আবরণ অথবা পূর্ব হিমালয়ের বক্সা শ্রেণীর বা গণ্ডো-য়ানার চ্যুত শিলাস্তূপ। আরও উত্তরে পূর্ব হিমালয়ে দেখা যায় ডালিং-শিস্ট্-এর এবং দার্জিলিং নাইস্-এর কেলাসিত শিলার বিশাল নাপ্। সিকিমের রঙ্গিত নদীর উপত্যকার মতো কোন কোন অঞ্চলের গাঠনিক বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখা যায় নিম্নস্থ গণ্ডোয়ানার বা বক্সা শ্রেণীর শিলাস্তূপ (Ghosh, 1952; Sinha Roy, 1972)। অনুরূপভাবে কুমায়ূনের তেহ্রী অঞ্চলে ক্রোল্ নাপ্-এর ওপরে গাড়োয়াল নাপ্ অধিষ্ঠিত। এখানে ক্রোল্ নাপ্-এর ক্ষয়ে যাওয়া অংশের বাতায়ন দিয়ে দেখা যায় নিম্নস্থ সিমলা স্লেট্-এর স্বস্থানীয় শিলাস্তূপ, অথবা ল্যান্স্-

ভাউন্‌-এর মতো কোন অঞ্চলে দেখা যায় ক্রোল্‌ নাপ্‌-এর ওপর অধিষ্ঠিত গাড়োয়াল নাপ্‌-এর বিচ্ছিন্ন উদ্বেধ বা ক্লিপে। নিম্ন হিমালয়ের সিমলা অঞ্চলেও ক্রোল্‌ থ্রাস্ট্‌, চাইল্‌ থ্রাস্ট্‌ এবং জুটোঘ্‌ থ্রাস্ট্‌-এর চ্যুতিতলগুলি সমগ্র অঞ্চলটিকে কতকগুলি নাপ্‌ বা অধিরোপিত আবরণে বিভক্ত করছে (Pilgrim and West, 1928; Auden, 1934)। সিমলার চারিপাশে জুটোঘ্‌ থ্রাস্ট্‌-এর ওপরের রূপান্তরিত এবং কেলাসিত স্থানচ্যুত শিলাস্তূপটির বিচ্ছিন্ন উদ্বেধ সিমলা ক্লিপে-এর সৃষ্টি করেছে। আবার নিকটবর্তী অঞ্চলে চাইল্‌ শ্রেণীর নীচের নবীনতর শিলাস্তর শালি বাতায়ন (Shali Window) নামে একটি গাঠনিক বাতায়নে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বাতায়নটির পরিধির অধিরোপণ চ্যুতিটিকে শালি থ্রাস্ট্‌ বলা হয় (West, 1939)।

ক্রোল্‌ আবরণের মতো নিম্ন হিমালয়ের কোন কোন অধিরোপিত আবরণে দেখা যায় স্তরের নবীনত্বের দিক্‌ (direction of younging) সর্বত্রই ঊর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমগ্র আবরণটিতে স্তরের স্বাভাবিক পরম্পরা বজায় রয়েছে, এবং সমগ্রভাবে কোন শায়িত বলির সৃষ্টির চিহ্ন নেই। পক্ষান্তরে সিমলা ক্লিপে দেখা যায় যে জুটোঘ্‌ থ্রাস্ট্‌-এর উপরের নাপ্‌টি একটি বিশালায়তন শায়িত বলির আকারে গঠিত (Pilgrim and West, 1928; Ray and Naha, 1971)।

অধুনা নিম্ন হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে গঠনের বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে (চিত্র 102, 103) যে নিম্ন হিমালয়ে উপর্যুপরি বিরূপণের (superposed deformation) চিহ্ন আছে। উদাহরণতঃ সিমলা ক্লিপে (চিত্র 102) দেখা যায় যে এ-অঞ্চলে প্রথমে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত একটি সমনত বলির ধারার সৃষ্টি হয় (Naha and Ray, 1972)। এগুলি কোথাও শায়িত বলি এবং কোথাও প্রণত বলির (reclined fold) সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিরূপণে প্রথমোক্ত বলিগুলির অক্ষতল বলিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বলিগুলির গ্রন্থিরেখা প্রথম বলির গ্রন্থিগুলির সাথে মোটামুটিভাবে সমান্তরাল। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বলিগুলি একমাত্র জুটোঘ্‌ শ্রেণীর শিলাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। নীচের চাইল্‌ শ্রেণীর শিলায় এগুলিকে পাওয়া যায় না। তৃতীয় পর্যায়ের বিরূপণে বিশালায়তনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বলিগুলি মৃদুভাবে পুনর্বলিত হয়েছে। এই বলিগুলির অক্ষতলের স্ট্রাইক্‌ মোটামুটিভাবে উত্তর-দক্ষিণে এবং বলির অক্ষগুলিও মোটামুটিভাবে অনুভূমিক। এই তৃতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রায়তনে তীক্ষ্ণ এবং যুগ্ম বলির (chevron fold and

চিত্র - 102 : সিমলা ক্লিপের গাঠনিক মানচিত্র (Naha and Ray, 1972 অবলম্বনে)।

conjugate fold) সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষুদ্রায়তন গঠনগুলির জ্যামিতি থেকে বোঝা যায় যে এই শেষ পর্যায়ের বিরূপণে পূর্ব-পশ্চিমে শিলাস্তূপের সঙ্কোচন হয়েছে (Ray and Naha, 1971)। সমগ্রভাবে সিমলা ক্লিপে অঞ্চলটির গঠনটিকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত একটি শায়িত সিন্-

শয়নীয় সিনক্লাইন্ (recumbent synformal syncline) বলা চলে (চিত্র 103)। এই শায়িত বলির বিপর্যস্ত বাহুটিকে এই অঞ্চলের কয়েকটি পর্বতশীর্ষের উদ্বেধে দেখা যায়। কুমায়ুন অঞ্চলের অন্যত্রও উপর্যুপরি বিরূপণের স্বাক্ষর রয়েছে (Bhattacharya and Niyogi, 1971 দ্রষ্টব্য)। আবার পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায় উত্তর-পূর্বে প্রলম্বিত

চিত্র - 103 : সিমলা ক্লিপের প্রস্থচ্ছেদ (Naha and Ray, 1972 অবলম্বনে)।
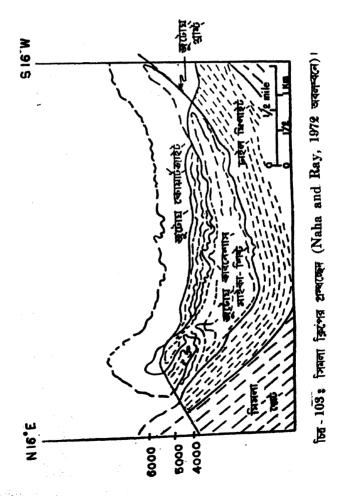
প্রথম পর্যায়ের বলিধারা এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রলম্বিত দ্বিতীয় পর্যায়ের বলিধারা (Mukhopadhyaya and Gangopadhyaya, 1971)।

নিম্ন হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখা যায় যে শিলার আঞ্চলিক রূপান্তরের (regional metamorphism) আতিশয্য নীচের দিকে কম এবং উচ্চতর শিলাস্তূপে বেশী। সাধারণতঃ নিম্ন হিমালয়ের নীচের নাপ্‌গুলি পালালিক শিলাস্তরে গঠিত অথবা স্লেট্ বা ফিলাইট্-এ গঠিত। পক্ষান্তরে জুটোঘ্ বা গাড়োয়াল নাপ্-এর মতো উচ্চতর নাপ্-সমূহ শিস্ট্ বা নাইস্ দ্বারা গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং অঞ্চলে সহজেই দেখা যায় যে পাদদেশ অঞ্চল থেকে উত্তর দিকের উচ্চতর শিলাস্তরে যাওয়ার সময়ে ক্রমশঃ শিলারূপান্তরের আতিশয্য বৃদ্ধি পাচ্ছে (Ray, 1947)। হিমালয়ের শিলারূপান্তরের এই বিপর্যস্ত বিন্যাস কি শিলাস্তূপের গাঠনিক বিপর্যয়ের (structural inversion) ফলে সৃষ্টি হয়েছে? এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখনও কিছু বলা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সিমলা অঞ্চলের নিরীক্ষাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সিমলা অঞ্চলের শিলাস্তরে শায়িত বলির অবস্থিতির জন্যে সেখানকার শিলারূপান্তরের "বিপর্যস্ত" বিন্যাসকে গাঠনিক বিপর্যয়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা একসময়ে যুক্তিসংগতই মনে হয়েছিল (Pilgrim and West, 1928)। অধুনা এই অঞ্চলের গাঠনিক ইতিহাস এবং শিলারূপান্তরের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিলাস্তূপের রূপান্তরের (metamorphism) পূর্বেই এখানকার শায়িত বলির সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং শায়িত বলির সৃষ্টির জন্যে এখানকার শিলারূপান্তরের বিন্যাসকে ব্যাখ্যা করা চলে না (Ray and Naha, 1971, পৃঃ 23)।

উচ্চ হিমালয়ের গঠন

উচ্চ হিমালয় অঞ্চলের মূল গাঠনিক বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে গ্রানিট্, নাইস্ এবং বিভিন্ন কেলাসিত শিলায় গঠিত একটি বিশালাকার নাপ্ অবস্থিত। এটিকে প্রধান কেন্দ্রীয় থ্রাস্ট্-স্তূপ (Main central thrust mass; Heim and Gansser, 1939) বলা হয়েছে। হাইম্ এবং গ্যান্সার্-এর মতে এই সমগ্র নাপ্‌টি 10 থেকে 20 কিমি পুরু এবং এটি দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। নিম্ন হিমালয়ের রূপান্তরিত শিলাগঠিত নাপ্‌গুলির সাথে উচ্চ হিমালয়ের নাপ্-এর কি ধরনের সম্পর্ক? অনেকে মনে করেন যে নিম্ন হিমালয়ের এই নাপ্‌গুলি উচ্চ হিমালয় থেকে আগত নাপ্-এরই অগ্রবর্তী অংশমাত্র। তবে গ্যান্সার্-এর মতে নিম্ন হিমালয়ে যেমন শিলারূপান্তরের "বিপর্যস্ত" বিন্যাস দেখা যায়, উচ্চ হিমালয়ে সেরকম দেখা যায় না। উচ্চ হিমালয়ে শিলারূপান্তরের

আতিশয্য গভীরতর অঞ্চলের দিকে বৃদ্ধি পায়। এই বৈপরীত্য থেকে গ্যান্‌সার (1964) অনুমান করেন যে নিম্ন ও উচ্চ হিমালয়ের থ্রাস্ট্‌-স্তূপগুলি এক নয়।

উচ্চ এবং নিম্ন হিমালয়ের শিস্ট্‌ এবং নাইস্‌গুলির বয়স সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকায় এখানকার গাঠনিক ব্যাখ্যাতেও বেশ খানিকটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্ন এবং উচ্চ হিমালয়ের রূপান্তরিত পালল শিলাগুলিকে প্রাক্‌কেম্‌ব্রীয় হিসেবে অনুমান করা হয়। অধুনা হিমাচল প্রদেশের চন্দ্রা উপত্যকার ক্যাল্ক্‌ শিস্ট্‌-এ জুরাসিক্‌ কালের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে উচ্চ হিমালয়ের সমস্ত রূপান্তরিত শিলাই প্রাক্‌কেম্‌ব্রীয় নয় (Powell and Conaghan, 1973)।

উচ্চ হিমালয়েরও কোন কোন অঞ্চলে উপর্যুপরি বিরূপণের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণতঃ হিমাচল প্রদেশের চন্দ্রা উপত্যকার শিলাস্তূপে তিনটি পর্যায়ের বলি-সৃষ্টির স্বাক্ষর রয়েছে। সিমলা অঞ্চলের মতো এখানেও প্রথম পর্যায়ের বলিগুলি সমনত এবং শেষ পর্যায়ে ক্ষুদ্রায়তনে তীক্ষ্ণ বলির সৃষ্টি হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২৪

ভূস্থাপত্যের প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ভূমিকা

ভূপৃষ্ঠের বিশালাকার গঠনগুলির বর্ণনা এবং তাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়াকে জিওটেক্‌টনিক্‌স্‌ (geotectonics) অথবা ভূস্থাপত্য বলা হয়। এই বিশালাকার গঠনগুলির উদ্ভবের প্রক্রিয়া বহুলাংশেই আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। এর কারণ, পৃথিবীর গভীরাঞ্চলের যে-বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে এই গঠনগুলি যুক্ত সেই রাসায়নিক ও ভৌত (physical) প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও খুব অসম্পূর্ণ। অবশ্য ভূবিদ্যার ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই এই গঠনগুলিকে ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে। নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো প্রকল্পগুলি (hypotheses) পরিবর্তিত হয়েছে অথবা নতুন প্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। ভূবিদ্যার একাধিক শাখার নানারকম তথ্যের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে এ প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

উদাহরণতঃ, কোন কোন প্রকল্পে অনুমান করতে হয় যে পৃথিবীর মধ্যমণ্ডলের (mantle) অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোত (convection current) সঞ্চালিত। এ সম্পর্কে অন্যান্য বিতর্কিত বিষয় ছাড়াও মধ্যমণ্ডলের সান্দ্রতা (viscosity) সম্পর্কে একটা মোটামুটি অনুমান করারও প্রয়োজন আছে। ফেনোস্ক্যাণ্ডিয়ার ভূপৃষ্ঠের ধীরে ধীরে ওপরে ওঠার হার থেকে মধ্যমণ্ডলের সান্দ্রতাঙ্ক (coefficient of viscosity) 10^{21} থেকে 10^{22} পয়েজ্‌ (poise) অনুমান করা হয়। এ ধরনের সান্দ্রতা থাকলে ধীরগতিতে হলেও পরিচলন স্রোতের সঞ্চালন সম্ভব। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বর্তমান আকার থেকে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ সিদ্ধান্ত করেছেন যে মধ্যমণ্ডলের গড় সান্দ্রতাঙ্ক 10^{26} পয়েজ্‌। ম্যান্ট্‌ল্‌-এর সান্দ্রতা এত বেশী হলে সেখানে গভীর পরিচলন স্রোত সক্রিয় হতে পারে না। ভূস্থাপত্যের বিভিন্ন তত্ত্বে এই ধরনের অনেক বিতর্কিত বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলির সত্যাসত্য বিচার সহজ নয়, এবং পৃথিবীর এই সব অনুমিত রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন না ক'রে ভূস্থাপত্যের কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব বা প্রকল্পকে সমর্থন বা অসমর্থন করার সার্থকতা নেই। তাই প্রাথমিক পর্যায়ের এই আলোচনা ভূস্থাপত্যের মূল প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেই

সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এ তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব অভ্রান্ত কিনা সে বিচার প্রাথমিক পর্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রকল্পগুলির শ্রেণীবিভাগ

ভূস্থাপত্যের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে মোটামুটিভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর প্রকল্পে মূলতঃ উল্লম্ব সরণের (vertical movement) সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের স্থাপত্যের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এ প্রকল্পগুলিতে অনুমান করা হয় যে পৃথিবীর গভীরাঞ্চলে অভিকর্ষের প্রভাবে কিছু কিছু লঘু বস্তু ওপরে ওঠে এবং গুরুভার বস্তুসমূহ নীচে নামে, এবং এই উল্লম্ব সরণের ফলেই ভূত্বকের যা কিছু বিরূপণ হয়। অপর শ্রেণীর প্রকল্প অনুসারে ভূত্বকের মূল সরণ হয় ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে, এবং এই স্পর্শিনী সরণের (tangential movement) ফলেই ভূত্বকের যা কিছু বিরূপণ হয়।

উল্লম্ব সরণের সাহায্যে ভূস্থাপত্যের ব্যাখ্যা

মহাদেশীয় বা মহাসাগরীয় ভূত্বকের কোন কোন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে ভূপৃষ্ঠের মন্থর অবনমন বা উত্তোলন দেখা যায়। আবার, একই অঞ্চল অবনমিত হওয়ার পর উত্তোলিত হতে দেখা যায়। ভঙ্গিল পর্বতমালা বিকাশের সময়েও ভূত্বক প্রথমে অবনমিত হয়ে জিওসিনক্লাইন্-এর সৃষ্টি করে এবং পরে শিলাস্তর উত্তোলিত হয়। বিশেষ ক'রে ভঙ্গিল পর্বতমালাতে গ্রানিট্‌জাতীয় শিলার যে বিশালাকার ব্যাথোলিথ্ (batholith) দেখা যায় সেগুলি অবশ্যই গভীরাঞ্চল থেকে ওপরে উত্থিত হয়েছে। ভূত্বকের এই ধরনের আচরণ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে মূলতঃ অভিকর্ষের প্রভাবেই ভূত্বকের উত্থান ও অবনমন হয়। অভিকর্ষজনিত এই ভূসংক্ষোভ বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

উদাহরণতঃ, একটি তত্ত্ব অনুসারে ভূত্বকের নিম্নভাগ বেসল্ট্ বা গ্যাব্রোতে গঠিত এবং ম্যান্ট্‌ল্-এর উপরিভাগ এক্‌লোগাইট্-এ গঠিত। বেসল্ট্ এবং এক্‌লোগাইট্-এর রাসায়নিক সংযুতি মোটামুটি একই রকম, তবে এক্‌লোগাইট্-এর ঘনাঙ্ক (density) বেসল্ট্-এর চেয়ে বেশী। একটি বিশেষ তাপমাত্রায়, অবরোধী চাপ (confining pressure) বাড়লে বেসল্ট্ থেকে এক্‌লোগাইট্-এর সৃষ্টি হতে পারে; আবার অবরোধী চাপ কমলে এক্‌লোগাইট্ থেকে বেসল্ট্-এর সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র 104 দ্রষ্টব্য)। এখন একটি অগভীর সমুদ্রে কিছুটা পলির স্তর জমা হলে ভূত্বকের নিম্ন-

চিত্র - 104 : বিভিন্ন তাপমাত্রা ও অবরোধী চাপে বেসল্ট্-এক্লোগাইট্ পরিবর্তনের লেখচিত্র।
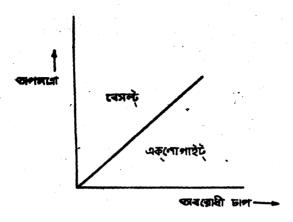
ভাগে চাপবৃদ্ধির ফলে বেসল্ট্ থেকে এক্লোগাইট্-এর সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র 105)। এক্লোগাইট্-এর ঘনাঙ্ক বেশী বলে শিলার আয়তনও হ্রাস পায়, এবং সেই অঞ্চলের ওপরের ভূপৃষ্ঠ আরও বেশী অবনমিত হয়। এর ফলে সমুদ্র পর্যঙ্কে আরও বেশী পরিমাণে পলি জমতে পারে। এই পুরু পলির আবরণের মাঝ দিয়ে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই ক্রমে ক্রমে পলির আবরণের নীচে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এর ফলে আবার মোহরোভিচিক্ বিচ্ছেদের নীচে এক্লোগাইট্ থেকে
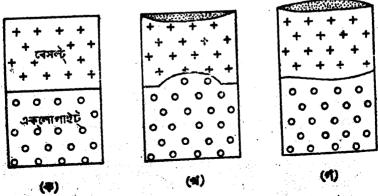
চিত্র - 105 : বেসল্ট্-এক্লোগাইট্ পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠের ওঠানামা।

কিছুটা বেসল্ট্-এর সৃষ্টি হতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পলিস্তূপ সমন্বিত সমুদ্র-পর্যঙ্ক উত্তোলিত হয় (McDonald and Ness, 1960; Kennedy, 1959)।

আবার অভিকর্ষের প্রভাবে অন্য প্রক্রিয়াতেও ভূসংক্ষোভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন, মহাদেশীয় ভূত্বকের বিস্তীর্ণ অংশ বেসল্ট্-এর পুরু লাভা প্রবাহে আবৃত হতে পারে। বেসল্ট্-এর ঘনাঙ্ক গ্রানিট্-এর চেয়ে বেশী। তাই ক্রমশ লাভা-প্লাবিত অঞ্চলটি অবনমিত হওয়া সম্ভব। এই অবনমিত অঞ্চলে কালক্রমে পাললিক শিলাস্তর অবক্ষেপিত হবে। দীর্ঘস্থায়ী অবনমনের ফলে অবশেষে গুরুভার বেসল্ট্-এর স্তর নিম্নস্থ গ্রানিট্-এর স্তরকে পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ক্রমশ নীচে ডুবে যাবে (চিত্র 106) এবং ঊর্ধ্বগামী গ্রানিট্-এর লঘু স্তূপ ভূপৃষ্ঠের পলির আবরণকে বিরূপিত করে ওপরে ঠেলে তুলবে। এইভাবে অভিকর্ষের প্রভাবে জিওসিনক্লাইন্ ও ভঙ্গিল পর্বতমালার বিকাশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব (Ramberg, 1964, 1967, 1972)। আবার কোন লঘু শিলাস্তূপ অভিকর্ষের প্রভাবে ম্যান্ট্ল্ এর মধ্য দিয়ে ওপরে ওঠার ফলে মধ্যসাগরীয় শৈলশিরার (midoceanic ridge) সৃষ্টিও হতে পারে (Ramberg, 1972)।

বিকল্প তত্ত্বে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রভেদীকরণের (differen-tiation) প্রক্রিয়ায় ম্যাগ্মার সৃষ্টি হলে, লঘু ম্যাগ্মা সমূহ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়ে ভূপৃষ্ঠকে ঠেলে ওপরে তুলতে পারে। অভিকর্ষের প্রভাবে ভূত্বকের উত্তোলিত অংশ পাশের ও নীচের দিকে স্খলিত হয়ে বলিত পর্বতমালার সৃষ্টি করতে পারে (Van Bemmelen, 1935)। উঁচু জায়গা থেকে স্খলিত হওয়ার ফলে বা ধস্ নামার ফলে পর্বতমালার শায়িত বলি ও অধিরোপণ চ্যুতির সৃষ্টি হয়।

ওপরে বর্ণিত তত্ত্বগুলিতে ভূসংক্ষোভের মূল কারণ শিলাসমূহের উল্লম্ব সরণ (vertical movement)। পরীক্ষাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনে হয় এই প্রকল্পিত (hypothetical) প্রক্রিয়াগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়া। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের সত্যিকারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতই কম যে এই বিকল্প তত্ত্বগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ বর্তমানে অসম্ভব।

স্পর্শিনী সরণের সাহায্যে ভূস্থাপত্যের ব্যাখ্যা

অন্য এক শ্রেণীর তত্ত্বে ভূত্বকের স্পর্শিনী সরণকেই (tangential movement) ভূসংক্ষোভের মুখ্য কারণ হিসেবে ধরা হয়। এই শ্রেণীর
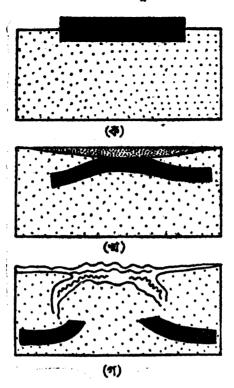
চিত্র - 106 : র‍্যাম্‌বার্গ্‌-এর তত্ত্ব অনুসারে অভিকর্ষের প্রভাবে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌ এবং ভঙ্গিল পর্বতমালা সৃষ্টির মডেল্‌। (ক) মহাদেশের ওপরে বেসল্ট্‌-এর পুরু আবরণের সৃষ্টি; (খ) অভিকর্ষের প্রভাবে ভারী বেসল্ট্‌-এর স্তূপ নিমজ্জিত হচ্ছে এবং তার ফলে ভূপৃষ্ঠে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর সৃষ্টি হচ্ছে; (গ) বেসল্ট্‌-এর ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে অপেক্ষাকৃত হাল্কা গ্র্যানিট্‌-এর স্তূপ ওপরে উঠছে এবং তার ফলে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর শিলাসমূহ বিরূপিত হচ্ছে। (Ramberg, 1967 দ্রষ্টব্য)।

কোন কোন প্রকল্পে ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে মধ্যমণ্ডল বা ম্যান্ট্‌ল্‌-এর মধ্যে তাপমাত্রার তারতম্যের জন্যে পরিচলন স্রোত (convection current) প্রবাহিত হয়। ভেনিং মাইনেজ্‌-এর ভূম্বকবক্রণের প্রকল্পে

(crustal buckling hypothesis; vening Meinesz, 1952, 1955) অনুমান করা হয় যে দুটি নিম্নগামী পরিচলন স্রোত যখন ভূত্বকের নীচে মুখোমুখি ভাবে পরস্পরের সংগে মিলিত হয় তখন ভূত্বক সংকুচিত হয়ে একটি বিশালাকার বাক্‌লিং ফোল্ড্‌-এর সৃষ্টি করে। এই বক্রণের ফলে ভূত্বক অবনমিত হয় এবং অবনমিত সমুদ্র-পর্যঙ্কে পাললিক স্তর জমার সুযোগ হয়। ক্রমে বক্রণের আতিশয্য বাড়লে অন্তঃস্থ স্তরসমূহ সংকুচিত ও বলিত হয়ে ওপরে উঠে আসে (চিত্র 107)। এই উত্তোলিত স্তরসমূহ দ্বীপপুঞ্জমালা অথবা ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে, প্লেট্‌ টেক্‌টনিক্‌স্‌-এর (plate tectonics) তত্ত্ব অনুসারে মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা এবং দ্বীপপুঞ্জমালা অথবা ভঙ্গিল পর্বতমালার উদ্ভবকে এক সংগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওয়েগেনার্‌ রচিত মহীসঞ্চরণের (continental drift) তত্ত্বকে পরিবর্তিত করে, এবং বিশেষ করে আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান (oceanography) এবং ভূ-পদার্থবিদ্যার (geophysics) নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করে প্লেট্‌ টেকটনিক্‌স্‌-এর তত্ত্বটি রচিত হয়েছে। মহীসঞ্চরণের তত্ত্ব অনুসারে একটি বা দুটি আদিম মহাদেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বর্তমানের মহাদেশগুলির সৃষ্টি হয়েছে (Wegener, 1929; Du Toit, 1937)। ওয়েগেনার্‌-এর তত্ত্ব অনুসারে গ্রানিট্‌ পাথরে গঠিত মহাদেশগুলি মহাসাগরীয় ভূত্বকের বেসল্ট্‌-এর ওপরে ভেসে ভেসে চলেছে,—যে ভাবে সমুদ্রের জল ঠেলে জাহাজ ভেসে চলে। কিন্তু মহাসাগরীয় ভূত্বকের সান্দ্রতা (viscosity) এত বেশী যে মহী-সঞ্চরণের এই কল্পিত প্রক্রিয়াটি সম্ভব নয়। প্লেট্‌ টেক্‌টনিক্‌স্‌-এর তত্ত্ব অনুসারে ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবীর মধ্যমণ্ডলে (mantle) পরিচলন স্রোত প্রবাহিত হয়। কন্‌ভেয়ার্‌ বেল্ট্‌-এর মতো মধ্যমণ্ডলের পরিচলন স্রোতের ওপরে মহাদেশ সমেত সমগ্র শিলামণ্ডলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে পরিবাহিত হয়। মহীসঞ্চরণের প্রাথমিক তত্ত্বের মতো এক্ষেত্রেও ধরে নেওয়া হয় যে প্রথমে প্যান্‌জিয়া (Pangaea) নামে একটি অথবা গণ্ডোয়ানা (Gondwana) এবং লরেশিয়া (Lauresia) নামে দুটি আদিম মহাদেশ ছিল। মধ্যমণ্ডলের পরস্পর-বিমুখী ঊর্ধ্বগামী পরিচলন স্রোতের প্রভাবে ঊর্ধ্বস্থিত মহাদেশগুলি সম্প্রসারিত হয় এবং ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিপরীতমুখী পরিচলন স্রোতে ফাটলের দুপাশের মহাদেশীয় শিলামণ্ডল (lithosphere) পরস্পরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়, এবং অন্তর্বর্তী অঞ্চলে নতুন করে মহাসাগরীয় ভূত্বকের সৃষ্টি হয় (চিত্র 108 খ)। উদাহরণতঃ, প্লেট্‌ টেক্‌টনিক্‌স্‌-এর তত্ত্ব অনুসারে অতলান্তিক

চিত্র - 107 : ভেনিং মাইনেজ্-এর ভূত্বক-বক্রণের তত্ত্ব অনুসারে ভঙ্গিল পর্বতমালা ও দ্বীপপুঞ্জমালার উদ্ভব। (ক) এবং (খ)-চিত্রে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর সৃষ্টি হচ্ছে এবং আগ্নেয়গিরির দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে দেখানো হয়েছে। (গ)-চিত্রে দেখা যাচ্ছে কি ভাবে ভূত্বকের বক্রণের শেষ পর্যায়ে জিওসিন্‌ক্লাইন্‌-এর পলির স্তূপ বিরূপিত হয়ে ওপরে উঠছে।
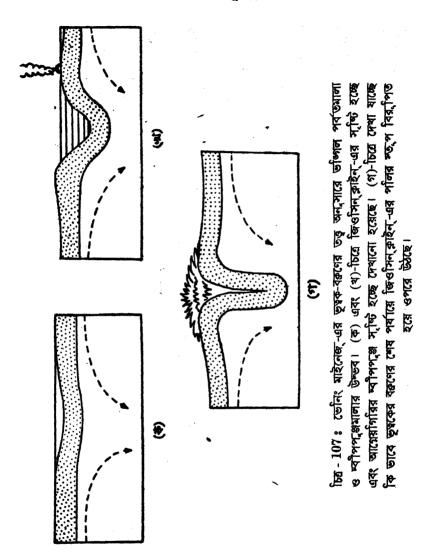
মহাসাগরের দু'ধারের মহাদেশগুলি একসময়ে পরস্পরের সংলগ্ন ছিল। মধ্য-অতলান্তিক শৈলশিরার (mid-Atlantic ridge) সৃষ্টির আরম্ভের সময় থেকে আফ্রিকা-ইয়োরোপ্ মহাদেশ আমেরিকা ভূখণ্ডের থেকে ক্রমশ দূরে সরে এসেছে। মধ্যবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট হয়েছে অতলান্তিক মহাসাগর। অতলান্তিক মহাসাগরের মাঝখানের শৈলশিরা ভূত্বকের ফাটলের অবস্থান

চিত্র - 104 : প্লেট-টেকটনিক্স্-এর তত্ত্ব অনুসারে মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা এবং সামুদ্রিক খাতের সৃষ্টি। (ক)-চিত্রে আদিম মহাদেশে ফাটলের সৃষ্টি হচ্ছে দেখানো হয়েছে। (খ)-চিত্রে ফাটলের দুপাশ থেকে মহাদেশগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে সরে এসেছে, এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলে নতুন সামুদ্রিক ত্বকের সৃষ্টি হয়েছে। চিত্রের বাঁদিকে শিলামন্ডল নীচে নেমে গিয়েছে এবং সেখানে সামুদ্রিক খাতের সৃষ্টি হচ্ছে।
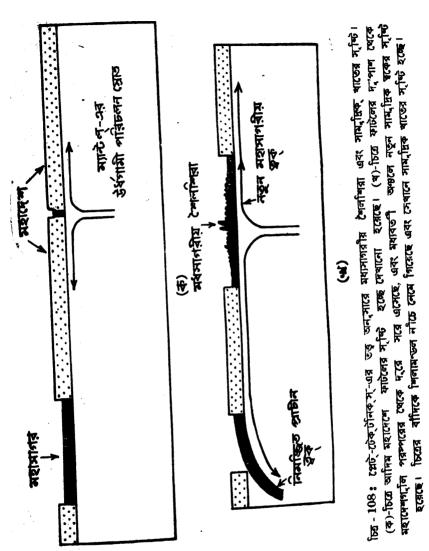
নির্দেশ করছে। আবার, এই তত্ত্ব অনুসারে নিম্নগামী পরিচলন স্রোত মহাসাগরীয় ভূত্বক্‌কে নীচে ম্যান্টল্-এর ভেতরে টেনে নামিয়ে আনে। ভূপৃষ্ঠের সেই অবনমিত অঞ্চলে গভীর সমুদ্রের খাত (deep sea trenches) অথবা জিওসিনক্লাইন্-এর সৃষ্টি হয়। পরিচলন স্রোতে সঞ্চালিত মহাদেশীয় শিলামন্ডলের দুটি টুকরো মুখোমুখি এসে পরস্পরকে ধাক্কা

মারতে পারে। এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূভাগে পর্বতমালার সৃষ্টি হতে পারে। প্লেট্-টেক্‌টনিক্‌স্ তত্ত্বের সমর্থকদের মতে ভারতীয় ভূখন্ড ও এসিয়ার সংঘর্ষের ফলে হিমালয় পর্বতমালার উদ্ভব হয়েছে। লক্ষণীয় যে এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় ভূখন্ড এককালে আন্টার্‌টিকা অথবা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দক্ষিণ গোলার্ধের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে প্রায় ২০ কোটী বছর ধরে প্রায় ন' হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম ক.. ভারতীয় ভূখন্ড তার বর্তমান স্থানে এসেছে।

পরিচলন স্রোত ছাড়াও ভূত্বকের স্পর্শিনী সরণ সম্ভব হতে পারে। পদার্থবিদ্ হ্যারল্ড্ জেফ্রিস্ দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ক্রমশ শীতল হয়ে থাকলে এই শীতলতা বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান হয়নি, এবং তার ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে আয়তনের সঙ্কোচনও সর্বত্র সমান হয়নি। পৃথিবী পৃষ্ঠে তাপমাত্রা মোটামুটি অপরিবর্তিতই আছে। সুতরাং সঙ্কুচিত অভ্যন্তরের সাথে খাপ্ খাওয়ার জন্যে পৃথিবীর বহিপৃষ্ঠকে সঙ্কুচিত হতে হয়েছে। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর আরও কিছুটা গভীরের একটি অঞ্চলে শীতলতা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশী হয়। এ অঞ্চলটি কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে সঙ্কুচিত হতে পারে না, কারণ গভীরতর মন্ডলের আয়তন উপযুক্ত পরিমানে হ্রাস পায়নি। সুতরাং যে অঞ্চলটির শীতলতা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী সেই অঞ্চলটি নীচের মন্ডলের আয়তনের সাথে খাপ্ খাওয়ার জন্যে সঙ্কুচিত না হয়ে বরং পাশের দিকে ঈষৎ সম্প্রসারিত হয় (Jeffreys, 1970)। আবার, প্ল্যাস্‌টিকের গোলকের সঙ্কোচনের পরীক্ষা থেকে বুখার্ দেখিয়েছেন যে সঙ্কুচিত গোলকের পৃষ্ঠে যে আঁকাবাঁকা ফাটলের সৃষ্টি হয় সেগুলির আকার মোটামুটিভাবে ভূপৃষ্ঠের মানচিত্রের ভঙ্গিল পর্বতমালা ও দ্বীপপুঞ্জমালার আকারের সদৃশ। অধুনা জেফ্রিস্ ও বুখার-এর এই তত্ত্বটিকে সমর্থন করে এবং তত্ত্বটিকে কিছুটা পরিবর্ধিত করে মেয়ারহফ্ মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা এবং মহাদেশের ভঙ্গিল পর্বতমালার উদ্ভবের ব্যাখ্যা করেছেন (Meyerhoff, 1970; Meyerhoff and Meyerhoff, 1972)। এই তত্ত্ব অনুসারে ভূত্বকের সঙ্কোচনের ফলেই ভূপৃষ্ঠের প্রধান স্থাপত্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ভূস্থাপত্যের তত্ত্বসমূহের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই তত্ত্ব-গুলির সপক্ষে যে তথ্য ও যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আরো জানবার জন্যে Belonssor (1962), Bucher (1955, 1956), Dietz (1961), Dietz

et al (1970), Du Toit (1937), Isacks et al (1968), Jeffreys (1970), Kennedy (1959), Le Pichon (1968), McDonald (1960, 1964), Meyerhoff (1970), Meyerhoff and Meyerhoff (1972), Ramberg (1967, 1972), Van Bemmelan (1972, 1973), Vening Meinsz (1952, 1955), Vine and Mathews (1963), Wegener (1929), Wilson (1963), Wyllie (1971) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রকৃত নতি এবং উপনতির সম্পর্ক

19-ক চিত্রের *abcd* একটি অনুভূমিক সমতল। *gb* রেখাটি সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্ *ad* রেখাটি নতির দিক্‌নির্দেশের সমান্তরাল এবং *abfe* একটি সমতলীয় গঠন। স্ট্রাইক্-এর সমকোণে অবস্থিত *ade* একটি উল্লম্ব সমতল। এই উল্লম্ব সমতলে ϕ কোণটি, অর্থাৎ *dae* কোণটি সমতলীয় গঠনের নতি। সমভূমি *abcd* এর ওপর *gc* রেখা উপনতির দিক্ নির্দেশ করছে। এখন *gc* রেখার সমান্তরালে একটি উল্লম্ব সমতল নেওয়া হল। 19-খ চিত্রে এই ছেদতলটি দেখানো হয়েছে। এই চিত্রের *gc* রেখাটি উপনতির দিক্ নির্দেশ করছে। স্ট্রাইক্-রেখা *gb* এবং *gc* রেখার মধ্যবর্তী কোণটিকে β আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং উপনতি *cgf* কোণটিকে ψ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। *bgc* সমকোণী ত্রিভুজ থেকে

$$\text{Sin } \beta = \frac{cb}{cg} \qquad (1)$$

আবার *cbf* সমকোণী ত্রিভুজ থেকে

$$cf = bc \tan \phi. \qquad (2)$$

একই ভাবে CHK সমকোণী ত্রিভুজ থেকে

$$cf = gc \tan \psi \qquad (3)$$

(2) এবং (3) নম্বর সমীকরণ থেকে

$$\tan \psi = \frac{bc}{gc} \tan \phi \qquad (4)$$

সুতরাং (1) এবং (4) নম্বর সমীকরণ থেকে নিম্নলিখিত সূত্রটি পাওয়া যায়

$$\tan \psi = \sin \beta \tan \phi. \qquad (5)$$

এই সূত্রটিতে

ϕ = প্রকৃত নতির মান,

β = স্ট্রাইক্ এবং উপনতির দিক্‌নির্দেশের মধ্যবর্তী কোণ, এবং

ψ = উপনতি।

(খ) পিচ্-এর সাথে ট্রেন্ড্ বা প্লাঞ্জ্-এর সম্পর্ক

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট সমতলের ওপর একটি রৈখিক গঠনের পিচ্ দেওয়া থাকলে স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের সাহায্যে অথবা জ্যামিতিক অংকনের সাহায্যে গঠনটির ট্রেন্ড্ এবং প্লাঞ্জ্ নির্ণয় করা যায়। নিম্নলিখিত সূত্র দুটি থেকেও এ-সমস্যার সমাধান সম্ভব

$$\tan p = \frac{\tan \beta}{\cos \phi} \qquad (6)$$

$$\tan p = \frac{\sin \psi}{\sqrt{\sin^2 \phi - \sin^2 \psi}} \qquad (7)$$

এখানে,

p = রৈখিক গঠনের পিচ্,

ϕ = সমতলীয় গঠনের নতি,

β = সমতলীয় গঠনের স্ট্রাইক্ এবং রৈখিক গঠনের ট্রেন্ড্-এর মধ্যবর্তী কোণ,

ψ = রৈখিক গঠনের প্লাঞ্জ্।

ওপরের সূত্রদুটি থেকে দেখা যায় যে পিচ্-এর মান 90° হলে, β-এর মান 90° হবে। আবার, পিচ্ (p) 90° হলে, প্লাঞ্জ্ এর মান (ψ) নতির (ϕ) সমান হবে। উপরন্তু, (7)-নং সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে সমতলীয় গঠনটি উল্লম্ব হলে (অর্থাৎ, $\phi = 90°$), পিচ্ (p) এবং প্লাঞ্জ্ (ψ) সমান হবে। (6) এবং (7) নম্বর সূত্রদুটি থেকে পিচ্-এর সাথে প্লাঞ্জ্-এর সম্পর্ক তত্ত্বের দিক্ থেকে বুঝতে সুবিধে হলেও, মনে রাখা দরকার যে কার্যক্ষেত্রে একমাত্র স্টিরিওগ্রাফিক্ অভিক্ষেপের সাহায্যেই এ ধরনের কোন একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান করা সবচেয়ে সুবিধাজনক।

(গ) বলিত পৃষ্ঠের আকার

অষ্টম অধ্যায়ে বলির যে গাঠনিক উপাদানগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলির কোন কোনটির সংজ্ঞা আরও নির্দিষ্টভাবে দেওয়া সম্ভব। প্রস্থচ্ছেদে বলির যে তরঙ্গিত রূপ দেখা যায় সেটিকে একটি লেখ-চিত্র হিসেবে আঁকা সম্ভব। ধরা যাক তরঙ্গটি যে দিকে বর্ধিত করা হয়েছে সেই দিকে x অক্ষ অবস্থিত, এবং তার সমকোণে y অক্ষ অবস্থিত। এই লেখ-চিত্রের x এবং y স্থানাঙ্কের সম্পর্ক দিয়ে তরঙ্গটিকে বর্ণনা করা যায়। ধরা যাক্ $y = f(x)$ এই ধরনের একটি তরঙ্গ। এই তরঙ্গাকার বলির যে বিন্দুগুলিতে $d^2y/dx^2 = 0$, সেই বিন্দুগুলিকে ইন্‌ফ্লেক্‌শন্-বিন্দু বলা হয়। যে বিন্দুগুলিতে $dy/dx = 0$, এবং d^2y/dx^2 ধনাত্মক, সেই বিন্দুগুলিকে শীর্ষবিন্দু বলা হয়। যে বিন্দুতে $dy/dx = 0$, এবং d^2y/dx^2 ঋণাত্মক সেই বিন্দুগুলিকে পাদবিন্দু বলা হয়। আবার, যে বিন্দুগুলিতে d^2y/dx^2 এর মান বৃহত্তম (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) সেই বিন্দু-গুলিকে গ্রন্থিবিন্দু বলা হয়।

গাঠনিক ভূবিদ্যার পরিভাষা

Abyssal পাতালিক
Alkaline ক্ষারীয়
Allochthonous স্থানচ্যুত
Alpine আল্প্সীয়
Attitude ভঙ্গী
Alternate একান্তর
Amplitude বিস্তার
Anisotropy এ্যানাইসোট্রপি, বিষমসারকতা
Anticline এ্যান্টিক্লাইন্
Antiform এ্যান্টিফর্ম্
Antiformal syncline এ্যান্টিফর্মীয় সিন্‌ক্লাইন্
Apparent dip উপনতি
Arenaceous বালুকাময়
Argillaceous মৃন্ময়
Asthenosphere অশক্তমণ্ডল
Axial plane অক্ষতল
Axial plane cleavage অক্ষতলীয় সম্ভেদ
Axial plane thickness অক্ষতলীয় বেধ
Axial trace অক্ষতলীয় ছেদরেখা
Autochthonous স্বস্থানীয়

Back deep পশ্চাৎবর্তী খাত
Band পরত
Basement শিলাপীঠ
Bed বেড্, স্তর
Behaviour of rock শিলার আচরণ
Bending fold বেনডিং ফোল্ড্
Boudin axis বুদিন্-অক্ষ
Boudinage বুদিনাজ্
Brittle ভঙ্গুর
Buckling fold বাক্লিং ফোল্ড্

Cleavage সম্ভেদ, শিলাসম্ভেদ
Closure of fold বলির বাঁক
Close fold বদ্ধ বলি
Compression সঙ্কোচন
Coefficient of viscosity সান্দ্রতাঙ্ক
Compressive সংকোচনকারী
Competence দার্ঢ্য
Competent rock দৃঢ় শিলা
Concentric fold এককেন্দ্রীয় বলি
Conical fold শঙ্কু-আকার বলি
Conjugate fold যুগ্ম-বলি
Confining pressure অবরোধী চাপ
Conrad discontinuity কন্‌রাড্ বিচ্ছেদ
Consolidation দৃঢ়ীভবন
Continental crust মহাদেশীয় ত্বক্
Continental margin মহীপ্রান্ত
Continental shelf মহীসোপান
Continental rise মহীস্ফীতি
Continental slope মহীঢাল
Convergent অভিসারী
Core অস্থি
Core, inner অন্তরাস্থি
Craton ক্রেটন
Cratonic ক্রেটনীয়
Creep ক্রীপ্
Crest point শীর্ষ বিন্দু
Crest line শীর্ষ রেখা
Crestal surface শীর্ষ তল
Cross joint প্রস্থ সন্ধি
Cross lamination তির্যক্ ল্যামিনেশন্
Cross section প্রস্থচ্ছেদ্
Cross stratification তির্যক্ স্তরায়ণ
Crust of the earth ভূত্বক্
Crystalline কেলাসিত
Culmination কাল্মিনেশন্

Current crescent স্রোতজাত অর্ধচন্দ্র, কারেন্ট্ ক্রেসেন্ট্
Current ripple mark স্রোতজাত লহরীচিহ্ন
Current bedding কারেন্ট্ বেডিং
Cylindrical fold স্তম্ভাকার বলি

Décollement দেকোল্‌ম
Deformation বিরূপণ, বিকৃতি
Deformation ellipse বিরূপণ উপবৃত্ত
Deposit অবক্ষেপ
Deposited অবক্ষিপ্ত
Deposition অবক্ষেপণ
Depression, axial অক্ষীয় ডিপ্রেশন্
Diagonal fault তির্যক্ চ্যুতি
Diagonal joint তির্যক্ সন্ধি
Diastrophic structures ভূসংক্ষোভজাত গঠন
Diastrophism ভূসংক্ষোভ
Dip নতি
Dip fault নতিচ্যুতি
Dip isogon সমনতি রেখা
Dip-slip fault নতিস্খলিত চ্যুতি
Discontinuity বিচ্ছেদ
Disharmonic fold বিসদৃশ বলি
Ductile সম্প্রসার্য, নম্য

Elastic স্থিতিস্থাপক
Ellipse উপবৃত্ত
Ellipsoid উপগোলক
Enveloping surface আচ্ছাদন তল
Equal area projection সমক্ষেত্র অভিক্ষেপ
Extension fracture সম্প্রসারক ফাটল

Fault চ্যুতি
Fault, rotational ঘূর্ণনজনিত চ্যুতি
Fault, translational চলনজনিত চ্যুতি
Fault, overthrust অধিরোপণ চ্যুতি
Fault line চ্যুতিরেখা
Faulted চ্যুত
Feather joint পক্ষ সন্ধি
Flexural fold বক্রণজনিত বলি
Flow layers প্রবাহ পরত
Flow line প্রবাহ রেখা
Fold বলি
Fold, asymmetrical অপ্রতিসম বলি
 Chevron তীক্ষ্ণ বলি
 close বদ্ধ বলি
 concentric এককেন্দ্রীয় বলি
 conical শঙ্কু-আকার বলি
 conjugate যুগ্ম বলি
 cylindrical স্তম্ভাকার বলি
 disharmonic বিসদৃশ বলি
 fan ছত্রাকার বলি
 gentle মৃদু বলি
Fold, horizontal অনুভূমিক বলি
 inclined আনত বলি
 isoclinal সমনত বলি
 non-cylindrical অস্তম্ভাকার বলি
 non-periodic অপর্য্যাবৃত্ত
 open মুক্ত বলি
 overturned বিপর্যস্ত বলি
 periodic পর্য্যাবৃত্ত বলি
 plunging অবনত বলি
 polyclinal বহুমুখী বলি
 reclined প্রণত বলি
 recumbent শায়িত বলি
 similar সমরূপী বলি
 supratenuous ক্ষীনশীর্ষ বলি
 symmetrical প্রতিসম বলি
 upright খাড়াই বলি

Fold vertical উল্লম্ব বলি
Fold limb বলি বাহু
Folded বলিত
Fold axis বলি অক্ষ
Force বল
Fore deep সম্মুখবর্তী খাত
Furrow খাত

Gentle fold—Fold দেখ
Graded bedding অবক্রান্ত বেডিং, গ্রেডেড্ বেডিং
Gravity অভিকর্ষ
Great circle মহাবৃত্ত

Hinge line গ্রন্থিরেখা
Hinge point গ্রন্থিবিন্দু
Hinge zone গ্রন্থি অঞ্চল
Homogeneous deformation সমমাত্র বিরূপণ
Horizontal অনুভূমিক
Hydrostatic pressure উদস্থিতি চাপ

Inclined fold—Fold দেখ
Incompetent rock অদৃঢ় শিলা
Inflection surface ইন্ফ্লেক্শন্ তল
Interlimb angle আন্তর্বাহু কোণ
Intermediate scale মধ্যমায়তন
Intermontane trough আন্তঃ পার্বতীয় খাত
Intersection ছেদ, প্রতিচ্ছেদ
Intracratonic furrow আন্তঃ ক্রেটনীয় খাত
Intra-deep মধ্যবর্তী খাত
Intrusion উদ্বেধ
Island arc দ্বীপপুঞ্জমালা
Isoclinal fold সমনত বলি

int সন্ধি

K ক্লিপে

Layer পরত
Length of arc চাপ-দৈর্ঘ্য
Line of inflection ইন্ফ্লেক্শন্ রেখা
Linear structure রৈখিক গঠন
Lineation গঠনরেখা
Lithosphere শিলামণ্ডল
Longitudinal joint অনুদৈর্ঘ্য সন্ধি
Longitudinal section দীর্ঘচ্ছেদ
Longitudinal strain অনুদৈর্ঘ্য টান
Longitudinal wave অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
Low Velocity Zone মন্থর-মণ্ডল

Mantle মধ্যমণ্ডল, ম্যান্ট্ল্
Median surface মধ্যতল
Mid-oceanic ridge মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা
Mineral lineation মণিকরেখা
Mohorovicic discontinuity মোহরোভিচিক বিচ্ছেদ
Movement সরণ, সৃতি
Mullion মালিয়ন্

Nappe নাপ্
Neutral fold নিউট্রাল্ বলি
Non-cylindrical fold অস্তম্ভাকার বলি
Non-periodic fold—Fold দেখ
Normal অভিলম্ব
Normal component আভিলম্বিক উপাদান
Normal limb স্বাভাবিক বাহু
Nose of a fold বলির মোড়

Open fold—Fold দেখ
Orientation ভঙ্গী
Orogenic belt অরোজেনি-মণ্ডল
Outcrop উদ্ভেদ
Overthrust অধিরোপণ চ্যুতি
Overturned fold বিপর্যস্ত বলি

Overturned limb বিপর্যস্ত বাহু

Parallel fold সমান্তরাল বলি
Parautochthonous উপস্থানীয়
Penecontemporaneous deformation সমসাময়িক বিরূপণ
Penecontemporaneous structure সমসাময়িক গঠন
Periodic fold—Fold দেখ
Permanent deformation চিরস্থায়ী বিরূপণ
Physical property ভৌত ধর্ম
Pitch পিচ্
Planar structure সমতলীয় গঠন
Plunge প্লাঞ্জ্, অবনমন
Plunging fold অবনত বলি
Point of inflection ইন্‌ফ্লেক্‌শন্ বিন্দু
Pore pressure রন্ধ্র চাপ
Primitive circle আদিবৃত্ত
Principal stress প্রধান পীড়ন
Projection অভিক্ষেপ
Proportional আনুপাতিক
Pseudonodule সিউডোনডিউল্

Radial joint অরীয় সন্ধি
Reclined fold প্রণত বলি
Recumbent fold শায়িত বলি
Refraction of cleavage সম্ভেদের প্রতিসরণ
Rodding রডিং
Root of a nappe নাপ্-এর মূল
Rotation ঘূর্ণন
Rotational fault ঘূর্ণনজনিত চ্যুতি

Scale পরিমাপ
Scale, intermediate মধ্যমায়তন
large বৃহদায়তন
mesoscopic মেসোস্কোপিক পরিমাপ
small ক্ষুদ্রায়তন
submicroscopic উপঅণুবীক্ষণিক পরিমাপ
Scale model, theory of পরিমাপগত প্রতিকৃতির তত্ত্ব
Sedimentary structures পাললিক গঠন
Sedimentary trough পাললিক পর্যঙ্ক
Shear joint ছেদন-সন্ধি
Shear fracture ছেদক ফাটল
Shearing stress ছেদক পীড়ন
Slip fold স্খলনজনিত বলি
Slip direction স্খলনের দিক্
Small circle ক্ষুদ্রবৃত্ত
Stereosphere কঠিনমণ্ডল
Strain টান
Stratification স্তরায়ণ
Strength সহনীয়তা
Stress পীড়ন
Strike স্ট্রাইক্
Strike-slip fault স্ট্রাইক্-স্খলিত চ্যুতি
Structural analysis গাঠনিক বিশ্লেষণ
Structural homogeneity গাঠনিক সমরূপতা
Superposed deformation উপর্যপরি বিরূপণ
Symmetrical প্রতিসম
Synformal anticline সিন্‌ফর্মীয় এ্যান্টিক্লাইন্

Tabular পট্টিত
Tangential স্পর্শিত, স্পর্শীয়
Tensile সম্প্রসারক
Thickness স্থূলতা, বেধ
Thickness, orthogonal সমকোণীয় বেধ
axial plane অক্ষতলীয় বেধ

Tight fold সংকীর্ণ বলি
Topography ভূসংস্থান, ভূমিরূপ
Trace ছেদরেখা, প্রতিচ্ছেদ
Translational fault চলনজনিত চ্যুতি
Transverse wave তির্যক্ তরঙ্গ
Trench, deep sea গভীর সমুদ্রের খাত
Trend ট্রেন্ড্
Trough surface পাদতল
Turbidity current আবিলতার স্রোত

Unconformity ক্রমবিচ্ছেদ, ব্যুৎক্রমী
Undeformed অবিরূপিত
Uniform flow সুসম প্রবাহ
Upright fold খাড়াই বলি

Vertical উল্লম্ব
Vertical movement উল্লম্ব সরণ
Vertical fold উল্লম্ব বলি
Viscosity সান্দ্রতা
Viscous সান্দ্র

Wavelength তরঙ্গদৈর্ঘ্য
Window, tectonic গাঠনিক বাতায়ন

গ্রন্থপঞ্জী

Adams, F.D., and Nicholson, J. T. (1901): An experimental investigation into the flow of marble. Roy. Soc. Lond. Phil. Trans., Ser. A, vol. 195, p. 363-401.

Anderson, E.M. (1951): Dynamics of faulting and dyke formation. 2nd ed. Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh, 206 pp.

Aubouin, J. (1965): Geosynclines. Elsevier Publishing Co., Amsterdam, 335 p.

Auden, J. B. (1934): The geology of the Krol belt. Rec. Geol. Surv. India, vol. 67, p. 357-454.

Badgley, P.C. (1965): Structural and tectonic principles. Harper and Row, New York, 521 pp.

Bailey, E.B. (1935): Tectonic essays, mainly alpine. Oxford, The Clarendon Press. 200 pp.

Balk, R. (1937): Structural behaviour of igneous rocks. Geol. Soc. America, Mem. 5.

Becker, G. (1907): Current theories of slaty cleavage. Am. Jour. Sci., vol. 24, p. 1-17.

Beloussov, V.V. (1962): Basic problems in geotectonics. McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 816 pp.

Bhattacharya, S.C. and Niyogi, D. (1971): Sedimentary and tectonic evolution of the rocks around Solan and Kandaghat, Simla Hills, H.P.—a resume. Q.J.G.M.M.S.I., vol. 43, p. 105-107.

Billings, M.P. (1954): Structural Geology. Prentice Hall, Englewood Cliff, 514 pp.

Brace, R.F. (1955): Quartzite pebble deformation in Central Vermont. Am. Jour. Sci., vol. 253, p. 129-145.

Bucher, W.H. (1920-21): The mechanical interpretation of joints. Jour. Geol. vol. 28, p. 707-730, vol. 29, p. 1-28.

Bucher, W.H. (1933): The deformation of the earth's crust. Princeton Univ. Press, 518 pp.

Bucher, W.H. (1944): The stereographic projection, a handy tool for the practical geologist. Jour. Geol., vol. 63, p. 191-212.

Bucher, W.H. (1955): Deformation in orogenic belts. Geol. Soc. America, Sp. Pap., 62, p. 343-368.

Bucher, W.H. (1956): Role of gravity in orogenesis. Bull. Geol. Soc. America, vol. 67, p. 1295-1318.

Cloos, E. (1946): Lineation, a critical review and annotated bibliography. Geol. Soc. America, Mem. 18.

Cloos, E. (1947): Boudinage. Trans. Am. Geophys. Union, vol. 28, p. 626-632.

Cloos, E. (1947): Oolite deformation in South Mountain fold. Bull. Geol. Soc. America, vol. 58, p. 843-918.

Dietrich, J.H. (1969): Origin of cleavage in folded rocks. Am. Jour. Sci., vol. 267, p. 155-165.

Dietz, R.S. (1961): Continent and ocean basin evolution by spreading of the sea-floor. Nature, 190, p. 854-857.

Dietz, R.S. and Holden, J.C. (1970): The break up of Pangaea. Scientific American, vol. 223, no. 4, p. 30-41.

Donath, F.A. (1961): Experimental study of shear failure in anisotropic rocks. Bull. Geol. Soc. America, vol. 72, p. 985-990.

Donath, F.A., Faill, R.T. and Tobin, D.G. (1971): Deformational mode fields in experimentally deformed rocks. Bull. Geol. Soc. America, vol. 82, p, 1442-1462.

Dunn, J.A. and Dey, A.K. (1942): The geology and petrology of eastern Singhbhum and surrounding areas. Geol. Surv. India, Mem. 69, pt. 2.

Du Toit, A. (1937): Our wandering continents. Oliver and Boyd. Edinburgh.

Elliott. D. (1965): The quantitative mapping of directional minor structures. Jour. Geol., vol. 73, p. 865-880.

Elliott, D. (1968): Interpretation of fold geometry from isogonic maps. Jour. Geol., vol. 76, p. 171-190.

Fairbairn, H.W. (1949): Structural petrology of deformed rocks. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading.

Fleuty, M.J. (1964): The description of folds. Proc. Geol. Assoc. Eng., vol. 75, p. 461-492.

Flinn, D. (1956): On the deformation of Funzie conglomerate, Fetlar, Shetland. Jour. Geol., vol. 64, p. 480-505.

Gansser, A. (1964): Geology of the Himalayas. Interscience. New York.

Gay, N.C. (1969): The analysis of strain in the Berberton Mountain Land, Eastern Transvaal, using deformed pebbles, Jour. Geol. vol. 77, p. 377-396.

Ghosh, A.M.N. (1952): A new coalfield in Sikkim Himalaya. Curr. Sci., vol. 21., p. 170-180.

Ghosh, S.K. (1966): Experimental tests on buckling folds in relation to strain ellipsoid in simple shear deformation. Tectonophysics, vol. 3, p. 169-185.

Ghosh, S.K. (1968): Experiments of buckling of multilayers which permit inter-layer gliding. Tectonophysics, vol. 6, p. 207-249.

Ghosh, S.K. (1969): Shapes of folds. Basudha, vol. 5, p. 14-21.

Ghosh, S.K. and Sengupta, S. (1973): Compression and simple shear of test models with rigid and deformable inclusions. Tectonophysics, vol. 17, p. 133-175.

Glaessner, M.F. and Teichert, C. (1947): Geosynclines: a fundamental concept in geology. Amer. Jour. Sci., vol. 245, p. 465-482, 517-591.

Griggs, D.T. (1936): Deformation of rocks under high confining pressure. Jour. Geol., vol. 44, p. 545-550.

Griggs, D.T. (1939): Creep in rocks. Jour. Geol. vol. 47, p. 225-251.

Griggs, D.T. (1940): Experimental flow of rocks under conditions favouring recrystallization. Bull. Geol. Soc. Americs, vol. 51, p. 1001-1022.

Griggs, D. and Handin, J. (1960): Observations on fracture and a hypothesis of earthquakes. Geol. Soc. Amer. Mem. 79, p. 347-364.

Gutenburg, B. (1954): Low velocity layers in the earth's mantle. Bull. Geol. Soc. Americs, vol. 65, p. 337-348

Gutenburg, B. and Richter, C.F. (1954): Seismicity of the earth. Princeton Univ. Press, 310 pp.

Hafner, W. (1951): Stress distribution and faulting. Bull. Geol. Soc. Americs, vol. 62, p. 373-398.

Hall, J. (1859): Natural history of New York, vol. 3, Palaeontology, Appleton and Co. Inc. New York.

Handin, J. and Hager. R.V. Jr. (1957): Experimental deformation of rocks under confining pressures: Tests at room

temperature on dry samples. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull., vol. 41, p. 1-50.

Heard, H.C. (1960): Transition from brittle to ductile flow in Solenhofen limestone as a function of temperature, confining pressure and interstitial fluid pressure. Geol. Soc. Americs, Mem. 79, p. 193-226.

Heezen, B.C. and Menard, W.H. (1963): Topography of the deep sea floor. In The Sea, Ed. Hill, M.N. vol. 3, Interscience Publishers. p. 233-277.

Heezen, B.C. Tharp, M. and Ewing, M. (1959): The floors of the oceans, I: The North Atlantic. Geol. Soc. America, Sp. Pap. 65, 122 pp.

Heim, Arn. and Gansser, A. (1939): Central Himalaya, geological observations of the Swiss expedition 1936. Mem. Soc. Helv. Sci. nat., vol. 73, p. 1-245.

Hills, E.S. (1963): Elements of structural geology. Mathuen and Co. Ltd. 483 pp.

Hodgson, R.A. (1961, a): Regional study of jointing in Comb Ridge-Navajo Mountain area, Arizona and Utah. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., vol. 45, p. 1-38.

Hodgson, R.A. (1961, b): Classification on structures on joint surfaces. Am. Jour. Sci., vol. 259.

Holmes, A. (1955): Dating the Precambrians of Peninsular India and Ceylon. Proc. Geol. Assoc. Canada, vol. 7, pt. 2, p. 81-106.

Hossack, J.R. (1968): Pebble deformation and thrusting in Bygdin area (Southern Norway). Tectonophysics, vol. 5, p. 315-339).

Hubbert, M.K. (1937): Theory of scale models as applied to the study of geologic structures. Bull. Geol. Soc. America vol. 48, p. 1459-1520.

Hubbert, M.K. (1951): Mechanical basis for certain familiar geologic structures. Bull. Geol. Soc. America, vol. 62, p. 355-372.

Hudleston, P.J. (1973): Fold geometry and some geometrical implications of theories of fold development. Tectonophysics, vol. 16, p. 1-46.

Isacks, B., Oliver, J. and Sykes, L.R. (1968): Seismology and the new global tectonics. Jour. Geophys. Res. vol. 73,

p. 5855-5900.

Jaeger, J.C. (1956): Elasticity, fracture and flow. Methuen and Co., London, 152 pp.

Jaeger, J.C. (1960): Shear failure of anisotropic rocks. Geol. Mag., vol. 97, p. 65-72.

Jeffreys, H. (1970): The earth. 5th end. Cambridge Univ. Press, London, 525 pp.

Kay, M. (1951): North American geosynclines. Geol. Soc. America, Mem. 48, 143 pp.

Kennedy, G.C. (1959): The origin of continents, mountain ranges and ocean basins. Am. Eci., vol. 47, p. 491-504.

Krishnan, M.S., (1953): Structural and tectonic history of India. Mem. Geol. Surv. India, vol. 81.

Leith, C.K. (1905): Rock cleavage. U.S. Geol. Surv. Bull. 239.

Leith, C.K. (1913): Structural geology. Henry Holt, 192 pp.

Le Pichon, X. (1968): Sea-floor spreading and the continental drift. Jour. Geophys. Res., vol. 73, p. 3611-3697.

Le Roy, L.W. (1950): Subsurface geologic methods, 2nd. ed. Golden, Colorado, Colorado School of Mines, 1156 pp.

MacDonald, G.J.F. (1960): Stability of phase transitions within the earth. Jour. Geophys. Res. vol. 65, p. 2173-2190.

MacDonald, G.J.F. (1964): The deep structure of continents. Science, vol. 143, p. 921-929.

Mathur, L.P. and Evans, P. (1964)): Oil in India, 22nd Intern. Geol. Cong., vol. 87.

Maxwell, J.C. (1962): Origin of slaty and fracture cleavage in the Delaware gap area, New Jersey and Pennsylvania. Geol. Soc. Am., Buddington Volume, p. 283-311.

Menard, H.W. (1955): Deep sea channels, topography and sedimentation. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol. vol. 39, p. 236-255.

McKee, E.D. and Weir, G.W. (1953): Terninology for stratification and cross-stratification in sedimentary rocks. Bull. Geol. Soc. America, vol. 64, p. 381-389.

Meyerhoff, A.A. (1970): Continental drift: implications of palaeomagnetic studies, meteorology, physical oceanography and climatology. Jour. Geol., vol. 78, p. 1-51.

Meyerhoff, A.A. and Meyerhoff, H.A. (1972): "The new global tectonics": major inconsistencies. Bull. Amer. Assoc.

Petrol. Geol., vol. 56, p. 269-336.

Muehlberger, W.R. (1961): Conjugate joint sets of small dihedral angle. Jour. Jour. Geol., vol. 69, p. 211-219.

Mukhopadhyay, M.K. and Gangopadhyay, P.K. (1971): Structural characteristic of rocks around Kalimpong, W. Bengal. Himalayan Geology, vol. 1, p. 213-230.

Mukhopadhyay, D. (1972): A note on the mullion structures from the Ardennes and North Eifel. Geol. Rundschau, Bd. 61, p. 1037-1049.

Mukhopadhyay, D. and Sengupta, S. (1971): Structural geometry and the time-relation of metamorphic recrystalization in the Precambrian rocks near Simulpal, Eastern India. Geol. Soc. America Bull., vol. 82, p. 2251-2260.

Naha, K. (1961): Precambrian sedimentation around Ghatshila in East Singhbhum, Eastern India. Proc. Nat. Inst. Sci. India, vol. 27 A, no. 5, p. 361-372.

Naha, K. and Majumdar, A. (1971): Structure of the Rajnagar marble band and its bearing on the early precambrian stratigraphy of Central Rajasthan, Western India. Geol. Rundshau, Bd. 60, p. 1150-1171.

Naha, K. and Ray, S.K. (1972): Structural evolution of the Simla Klippe in the lower Himalayas. Geol. Rundschay, Bd. 61, p. 1050-1086.

Odé, H. (1960): Faulting as a velocity discontinuity in plastic deformation. Geol. Soc. Amer. Mem. 79, p. 293-321.

Oertel, G. (1970): Deformation of slaty lapillar tuff in the Lake district, England. Bull. Geol. Soc. Amer. vol. 91, p. 1173-1188.

Parker, J.M. (1942): Regional systematic jointing in slightly deformed sedimentary rocks. Geol. Soc. America, Bull. vol. 53, p. 381.

Paterson, M.S. (1958): Experimental deformation and faulting in Wombeyan marble. Geol. Soc. America, Bull. vol. 69, p. 465-476.

Phillips, F.C. (1954): Stereographic projection in structural geology. E. Arnold, London.

Pilgrim, G.E., and West W.D. (1928): The structure and correlation of the Simla rocks. Mem. Geol. Surv. India, 53, 140 pp.

Powell, C. Mc. A. and Conaghan, P.J. (1973): Polyphase deformation in phanerozoic rocks of the Central Himalayan gneiss, Northwest India. Jour. Geol., vol. 81, p. 127-143.

Ramberg, H. (1955): Natural and experimental boundinage and pinch-and-swell structure. Jour. Geol., vol. 63, p. 512-526.

Ramberg, H. (1963): Strain distribution and geometry of folds. Bull. Geol. Inst. Univ. Uppsala, vol. 42, p. 1-20.

Ramberg, H. (1964): Selective buckling of composite layers with contrasted rheological properties, a theory for the formation of several orders of folds. Tectonophysics, vol. 1, p. 307-341.

Ramberg, H. (1967): Gravity, deformation and the earth's crust. Academic Press, London.

Ramberg, H. (1972): Mantle diapirism and its tectonic and magmagenetic consequences. Phys. Earth Planet. Interiors, vol. 5, p. 45-60.

Ramberg, H. and Ghosh, S.K. (1968): Deformation structures in the Hovin Group schists in the Hommelvik-Hell region (Norway). Tectonophysics, vol. 6, p. 311-330.

Ramsay, J. (1967): Folding and fracturing of rocks. McGraw-Hill, New York, 568 pp.

Rast, N. (1956): The origin and significance of boudinage. Geol. Mag., vol. 93, p. 401-408.

Rast, N. (1964): Morphology and interpretation of folds—a critical essay. Liverp. Manch. Geol. J., vol. 4, p. 177-188.

Ray, S. (1947): Zonal metamorphism in eastern Himalaya and some aspects of local geology. Q.J.G.M.M.S.I., vol. 19, p. 117-140.

Ray, S.K. and Naha, K. (1971): Structural and metamorphic history of the "Simla Klippe"—a summary. Himalayan Geology, vol. 1, p. 1-24.

Robertson, E.C. (1960): Creep of Solenhofen limestone under moderate hydrostatic pressure. Geol. Soc. America, Mem. 79, p. 229-230.

Sarkar, S.N. and Saha, A.K. (1963): On the occurrence of two intersecting Precambrian orogenic belts in Singhbhum

and adjacent areas, India. Geol. Mag., vol. 100, p. 69-92.

Sen, S. (1956): Structure of porphyritic granite and associated metamorphic rocks of east Manbhum, Bihar, India. Bull. Geol. Soc. America, vol. 67, p. 647-670.

Sinha, Roy, S. (1972): Stratigraphy and age of the Buxa Series in Rangit Window, Darjeeling Himalaya. Q.J.G.M.M. S.I., vol. 44, p. 97-99.

Shrock, R.R. (1948):) Sequence in layered rocks, New York.

Stabler, C.L. (1968): A simplified Fourier analysis of fold shapes. Tectonophysics, vol. 6, p. 343-350.

Strömgárd, K.E. (1973): Stress distribution during formation of boudinage and pressure shadows. Tectonophysics, vol. 16, p. 215-248.

Turner, F.J. and Weiss, L.E. (1963): Structural analysis of metamorphic tectonites. McGraw-Hill, New York, 545 pp.

Umbgrove, J.H.F. (1947): The pulse of the earth. Martinus Nijhoff Press, The Hague, 358 pp.

Umbgrove, J.H.F. (1950): Symphony of the earth. Martinus Nijhoff Press, The Hague, 220 pp.

Van Bemmelen, R.W. (1972): Driving forces of Mediterranean orogeny (Tyrrhenian test-case). Geol. Mijnbouw, vol. 51, p. 548-573.

Van Bemmelen, R.W. (1973): Geodynamic models for the Alpine type of orogeny (Test-case II—the Alps in Central Europe). Tectonophysics, vol. 18, p. 33-79.

Vening Meinesz, F.A. (1952): Convection currents in the earth and origin of the continents. Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Verh., Ser. B., vol. 55, p. 527-553.

Vening Meinesz, F.A. (1955): Plastic buckling of the earth's crust: the origin of geosynclines. Geol. Soc. Am. Spec. Pap., vol. 62, p. 319-330.

Vine, F.J. and Mathews, H.D. (1963): Magnetic anomalies over oceanic ridges, Nature, vol. 199, p. 947-949.

Von Karman, T. (1911): Festigkeitsversuche unter allseitigem Druck. Zeitschr. Ver. Deutsche Ingenieure, vol. 55, p. 1749-1757.

Wadia, D.N. (1931): Syntaxis of the North-West Himalaya. Rec. Geol. Surv., 65, pt. 2.

Wegener, A. (1929): The origin of continents and oceans. (Translated from German edition in 1966). Dover, New York.

Weiss, L.E. (1959): Structural analysis of the basement system of Turoka, Kenya. Overseas Geology and Mineral Resources, vol. 7, no. 1.

West, W.D. (1939): Structure of the Shali window near Simla. Rec. Geol. Surv. India, vol. 74, p. 133-163.

Whitten, E.T. (1966): Structural geology of folded rocks. Rand McNally, Chicago, III, 663 pp.

Wilson, J.T. (1965): Transform faults, oceanic ridges and magnetic anomalies southwest of Vancouver Island. Science, 150, p. 482-485.

Wilson, G. (1946): The relationship of slaty cleavage and kindered structures to tectonics. Proc. Geol. Assoc., vol. 62, p. 263-302.

Wilson, G. (1953): Mullion and rodding structures in the Moine Series of Scotland. Proc. Geol. Assoc., vol. 64, p. 118-151.

Wilson, G. (1961): The tectonic significance of small scale structures and their importance to geologist in the field. Soc. Geol. Belgique, Ann., vol. 84, p. 496-503.

Wilson, G. (1967): The geometry of cylindrical and conical folds. Proc. Geol. Assoc. Engl., vol. 78, p. 179-210.

Wilson, J.T. (1963): Continental drift. Scientific American, vol. 208, no. 4, p. 86-100.

Wyllie, P.J. (1971): The dynamic earth: Textbook in Geosciences, Wiley, New York, 416 pp.

নির্দেশিকা